স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পত্র-পত্রিকা

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রজ্ঞাভারতী

প্রকাশক
সুশান্ত দে
প্রজ্ঞাভারতী
১, ন্যায়রত্ন লেন
কলিকাতা ৭০০০০৪

প্রথম মুদ্রণঃ শ্রাবণ, ১৩৯৪

প্রচ্ছদ
কৃষ্ণেন্দু চাকী

মুদ্রক
মিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়
টেম্পল প্রেস
২, ন্যায়রত্ন লেন
কলিকাতা ৭০০০০৪

উৎসর্গ

মাতৃদেবী সুশীলা বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতৃদেব ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর স্মৃতির উদ্দেশে গ্রন্থখানি উৎসর্গ করলাম। দু-জনে স্বাধীনতার সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধায় অবিচল ছিলেন।

সূচীপত্র

ভূমিকা

স্বাধীনতা আন্দোলন সম্বন্ধে দেশের বিভিন্ন ভাষায় ছোট বড় অনেক বই লেখা হয়েছে ও হচ্ছে। এ বিষয়ে এক প্রকারের সামগ্রী তেমন অপ্রতুল নয়। ইতিহাস—স্থানীয় ও জাতীয় থেকে, রাজনীতিক নেতৃবৃন্দের স্মৃতিকথা ও জীবনচরিত, মজদুর, কৃষক, ছাত্র, যুব, মহিলাদের আন্দোলন থেকে, জাতীয় আন্দোলনে তাদের ভূমিকা থেকে, আমরা অনেক তথ্যের সন্ধান পাই। জাতীয় মুক্তির আন্দোলনের ইতিহাসকে এই মূল্যবান সামগ্রী সমৃদ্ধ করে তোলে। পণ্ডিতী ইতিহাস লেখার সময় গবেষকরা প্রামাণ্য বইপত্র ছাড়া অভিলেখাগারের দ্বারস্থ হয়ে থাকেন। কেউ কেউ সহজ লভ্য দৈনিক ও অন্য পত্র-পত্রিকার সাহায্য গ্রহণ করেন।

পাদ্রী লঙের পরামর্শে ব্রিটিশ সরকার Book Registration Act 1867 পাশ করে। এই আইনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল এদেশে যে সব বই ছাপা হচ্ছে তাতে বিদেশী শাসক ও প্রশাসন সম্বন্ধে কি লেখা হচ্ছে তার সম্বন্ধে সরকারকে ওয়াকিফহাল রাখা। এ ছাড়া দেশীয় ভাষার পত্র-পত্রিকায় কি লেখা হচ্ছে তার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য সরকার নিযুক্ত অনুবাদকরা নানা পত্র-পত্রিকার নানা প্রকারের সমাচার ও মন্তব্য ইংরাজিতে অনুবাদ করাতেন। যে সব পত্রিকার ফাইল সহজে পাওয়া যায় না তার কিছু কিছু রাজনীতিক, সামাজিক সংবাদাদি এই অনুবাদগুলি থেকে পাওয়া যায়। গবেষকরা এরও সাহায্য নিয়ে থাকেন।

প্রাচীনকাল থেকেই গ্রীস, রোম, আরব, চীন ইত্যাদির মত আমরা ইতিহাস সম্বন্ধে সচেতন ছিলুম না, এটা শ্রুতিকটু হলেও সত্য। এ যুগে অর্থাৎ ইউরোপীয়দের ভারতে আগমনের পর যখন থেকে এ দেশে মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, যে সব বই ও পরবর্তীকালে পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে তার সবগুলি কোথাও পাওয়া যায় না।

'স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পত্র-পত্রিকা' পুস্তকে নিরলস গবেষক শ্রীবীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে চার দশকে প্রকাশিত নানান পত্র-পত্রিকা থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন সংক্রান্ত অতি

মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য সংবাদ ও তথ্য আহরণ করে দিয়েছেন। এ কাজের জন্য তাঁকে এই রাজ্যের বিভিন্ন জেলার শহরেই নয়, দূর-দূরান্তের গ্রামের গ্রন্থাগারে যেতে হয়েছে। বহু কষ্ট ও ব্যয় করেছেন। তা' ছাড়া তিনি যখনই খবর পেয়েছেন যে কোন ব্যক্তি বিশেষের কাছে কোন পত্রিকার পুরানো দিনের ফাইল বা খুচরো কপি আছে তিনি সেখানেই গিয়ে উপস্থিত হয়ে তাঁর প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে এনেছেন।

'স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পত্র-পত্রিকা' বইখানি বিপ্লবীদের পত্র-পত্রিকা, সে দিনের পত্র-পত্রিকা, পত্র-পত্রিকা স্বাধীনতার ইতিহাস রচনার দলিল, বাংলা পত্র-পত্রিকার টুকিটাকি ইত্যাদি বড় বড় কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত।

এই গ্রন্থে শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের (দাদাঠাকুর) বিদূষক, কাজী নজরুল ইসলামের—ধূমকেতু, বাংলার বাণী, বরিশাল পত্রিকা, জাগরণ, দীপিকা, বেণু, লালপল্টন, আজাদ, বাংলার কথা, চট্টগ্রামের—জ্যোতি ও পাঞ্চজন্য, বর্ধমানের—দামোদর, পুরুলিয়ার—মুক্তি, কলকাতার—আত্মশক্তি, বিজলী, অরণি প্রভৃতির বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলা পত্র-পত্রিকা পরিচালনায় বঙ্গনারী অধ্যায়ে মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত বন্দেমাতরম, বঙ্গনারী, বাঙ্গলার কথা, জয়শ্রী, মন্দিরা সম্বন্ধে লেখা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত ছাত্র-যুবকদের দ্বারা প্রকাশিত পত্রিকাগুলি বাদ পড়েনি। এর সঙ্গে স্বদেশী পত্রিকা যে সব ছাপাখানায় মুদ্রিত হত তার মধ্যে বিখ্যাত কয়েকটি প্রেসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও দেওয়া হয়েছে।

একথা সকলের জানা যে এই পত্রিকাগুলির মধ্যে কয়েকটি ব্যক্তি বিশেষের চেষ্টায় প্রকাশিত হত। কিন্তু বেশীর ভাগই ছিল বিভিন্ন রাজনীতিক গোষ্ঠী ও দলের। এ বিষয়েও কিছু কিছু তথ্য লেখক উদ্ধার করে দিয়েছেন। তিরিশের ও চল্লিশের যুগের কমিউনিস্ট পত্রিকা সম্বন্ধেও অনেক তথ্য পুস্তকে দেওয়া হয়েছে। মার্কসপন্থী, গণশক্তিও বাদ যায়নি। যেমন বাদ যায়নি এই তিরিশ দশকের সময়ের গণবাণী।

১৯২০ যুগের ও তার পরের নবযুগ (দৈনিক), দেশের বাণী, সারথি,

নায়ক, লাঙল, বাঙ্গলার কথা, আনন্দবাজার পত্রিকা, স্বাধীনতা (দৈনিক) সংবাদপত্রের কথা লেখা হয়েছে।

জরিমানা, কারাদণ্ড অবধারিত জেনেই রাজনীতিক পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হত। এ শতাব্দীর গোড়ার সন্ধ্যা, যুগান্তর থেকে আরম্ভ করে আনন্দবাজার পত্রিকা পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে পত্রিকাগুলির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হয়েছে ও দণ্ড দেওয়া হয়েছে। তার ইতিহাসও আছে এই বইতে। লেখক নানা দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রিকা থেকে যেমন তথ্য সংগ্রহ করেছেন সেভাবে প্রামাণ্য পুস্তক ও প্রশাসনের রিপোর্টের সাহায্য নিয়েছেন। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে প্রসঙ্গপঞ্জী দিয়েছেন। শ্রীবীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রামাণ্য ও উপযোগী পুস্তক সংকলন করে মহৎ কাজ করেছেন। পুস্তকখানি প্রত্যেক পত্রিকা অফিসে, গ্রন্থাগারে স্থান পাবার যোগ্য। বলা বাহুল্য বইটি এ যুগের রাজনীতি ও সমাজ নিয়ে গবেষণাকারীদের পক্ষে অপরিহার্য।

গবেষক, প্রবন্ধ ও পুস্তক লেখক হিসাবে গ্রন্থকার কুড়ি বছর ধরে পরিচিত। তাঁর 'বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে' বৃহৎ বইখানি জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা-সহ ১৯৭২ এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হবার কিছুদিনের মধ্যেই চারিদিকে প্রশংসা লাভ করে। এই বিষয়ে এটা প্রামাণ্য ও একমাত্র গ্রন্থ হয়ে রয়েছে। এর জন্যও তাঁকে প্রায় পুরো পশ্চিমবঙ্গ ঘুরতে হয়েছিল। এই বই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. পরীক্ষা (বাংলা) পাঠ্যপুস্তক তালিকাভুক্ত হয়েছে। এরপর লেখক ১৯৭৭ সালে তাঁর 'যাত্রাগানের ইতিবৃত্ত' প্রকাশ করেন। এতে তিনি যাত্রাগানের গোড়ার কথা, থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা, শেখের যাত্রা, রামলীলা, স্বদেশী যাত্রার একটি অপ্রকাশিত কথা এবং মুর্শিদাবাদ জেলার আলকাপ প্রভৃতির প্রামাণ্য বিবরণ দিয়েছেন। এই গবেষকের তৃতীয় উল্লেখযোগ্য পুস্তক হল 'হেটো বই-হেটো ছড়া' (১৯৮৪)। গ্রামের হাটে অল্প শিক্ষিতদের জন্য সমসাময়িক বিষয়গুলি নিয়ে বই ছাপা হচ্ছে শতাধিক বর্ষ ধরে। এ জাতীয় বইকে বটতলার বইও বলা হয়। জেমস্ লঙ শতাধিক বছর পূর্বে এই সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু লিখে গিয়েছেন। ১৮৬৭ সালে বই মেলাতে ভারতের অন্য বইয়ের সঙ্গে এই সাহিত্যও প্রদর্শিত হয়েছিল। প্রদর্শিত বইয়ের যে তালিকা লঙ প্রকাশ করেন তাতে কয়েক কুড়ি হেটো বই-হেটো ছড়ার বইও

আছে। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বইতে এই সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও সংকলন দিয়েছেন। তাঁর অন্য বইগুলির মতই এটাও এ বিষয়ের প্রথম বই। এই সাহিত্য কোন গ্রন্থাগারে স্থান পায় না। তাঁর নিজ ব্যয়ে নানান জায়গায় ঘুরে ঘুরে এই কাজ শেষ করতে হয়েছে। সর্বান্তঃকরণে এই কামনা করি যেন 'স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পত্র-পত্রিকা' গ্রন্থখানি সুধীজনের নিকট আদৃত হয় এবং যাঁরা একদিন স্বদেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন ও বিপ্লবী আয়োজনের কল্পনায় পত্র-পত্রিকা বের করেছিলেন, তাঁদের কথা আবার দেশবাসীর মনে অভিনব দীপ্তিতে প্রকাশ পায়।

মহাদেবপ্রসাদ সাহা

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ভবন
আলিমুদ্দিন স্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০ ০১৬

গ্রন্থকারের নিবেদন

'স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পত্র-পত্রিকা' গ্রন্থের কয়েকটি লেখা বিভিন্ন সময়ে দৈনিক বসুমতী, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, জনসেবক, কলকাতা পুরশ্রী, কথাবার্তা, বসুধারা, চট্টগ্রাম বিদ্রোহের সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ, যুগের ডাক (শারদীয়া সংখ্যা) প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। অধ্যাপক নিশীথরঞ্জন রায় মহাশয় ১৯৭৮ সালে 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল'-এর সেক্রেটারি এবং কিউরেটার। অধ্যাপক রায় মহাশয় আমাকে এই বিষয়ে একটি লেখা বক্তৃতা কক্ষে পাঠ করতে দিয়েছিলেন। কাজ শুরু করার সময় অনেকে উৎসাহিত করেন। প্রথমে মনে পড়ছে, বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী, সাংবাদিক প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, সাংবাদিক জগদানন্দ বাজপেয়ী, বিপ্লবী অমর বসু, রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, 'টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট'-এর অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বসুর কথা। অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বসুর আকস্মিক অকাল মৃত্যু আমার কাছে প্রিয়জন বিয়োগের বেদনা দিয়েছে। পত্র-পত্রিকা সংগ্রহের কাজ শুরু করেছিলাম অনেকদিন আগে। অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বসুর উৎসাহে আমি এই গ্রন্থ লেখার কাজ শুরু করেছিলাম। এক সময় কয়েকদিন তাঁর বাড়িতে বসেও লেখার কাজ করেছি।

ছেড়ে আসা দিনের কথা, তখন দেশের সাধারণ মানুষের মনে অত্যাচারী ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে একটা চাপা ক্ষোভ ও আক্রোশ পুঞ্জীভূত। ওই সময় যাঁরা ভারতের মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের কয়েক জনের সান্নিধ্য আমার ভালো লাগতো। কয়েকজন স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং সাংবাদিকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। দেশপ্রেমিকদের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে তাঁদের কথা আমার মনে দাগ কেটেছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পত্র-পত্রিকা নিয়ে লেখার কথা অনেকদিন আগে ভেবেছিলাম। দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রহ করেছিলাম অনেক পত্র-পত্রিকা। তথ্য যখন সংগ্রহ করতে শুরু করেছিলাম, সেই সময়ের অনেকে আজ নেই। অনেক উজ্জ্বল নামের হৃদয়বান মানুষ একে একে চিরদিনের মতো চলে গেলেন। অনেকে আমাকে এই কাজে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছিলেন। বিশেষ করে অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য,

কবি অরুণ ভট্টাচার্য, দাশরথি তা (বর্ধমান), প্রভাস রায় (শান্তিপুর), শৈলেন গুহরায় (শ্রীসরস্বতী প্রেস), পার্লামেন্টের সদস্য অরুণ গুহ মহাশয়ের কথা আজ মনে পড়ছে। তা' ছাড়া অরুণ ঘোষ (পুরুলিয়া), চিত্তভূষণ দাশগুপ্ত (পুরুলিয়া), বলাইলাল মুখোপাধ্যায় (শান্তিপুর), সৌম্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় (সিঁথি), ভারতে কৃষক সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল, ডক্টর মহাদেবপ্রসাদ সাহা, গবেষক অনিলকুমার কাঞ্জিলাল, গবেষক চিন্মোহন সেহানবীশ, গবেষক অনাথ মিত্র, ডক্টর সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, লেখিকা কমলা মুখোপাধ্যায়, সাংবাদিক নিখিল সরকার, সাংবাদিক নিরঞ্জন হালদার, ডক্টর অতুল সুর, জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংবাদিক সুহাস তালুকদার, লেখক সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সাংবাদিক সমরেশ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহীরেন্দ্রকুমার সাহা (জঙ্গিপুর), সাংবাদিক অনুত্তম পণ্ডিত (জঙ্গিপুর), গবেষক সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়, সাংবাদিক চিত্তরঞ্জন কুণ্ডু (তমলুক), ডক্টর শিশির মজুমদার, ডক্টর সজল বসু, সাংবাদিক দিলীপ চট্টোপাধ্যায়, গান্ধী মেমোরিয়াল কমিটির পাঠাগার কর্মী—শিবসুন্দর চৌধুরী, গবেষক সঞ্জীব সরকার, সাংবাদিক অরুণ দাশগুপ্ত এবং আরও অন্যান্য বন্ধুর কথা বিনম্র চিত্তে স্মরণ করছি। ভারতের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র মহাশয় আমাকে নানাভাবে প্রেরণা দিয়েছেন, উৎসাহিত করেছেন, সে কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গবেষক অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সেণ্টার ফর স্টাডিজ ইন সোস্যাল সায়েন্সেস কলকাতা'র ডক্টর বরুণ দে, শ্রীসুশান্ত ঘোষ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পবিত্র সরকার, অধ্যাপক অমলেন্দু দে, অধ্যাপক ফজলুর রহমান (ঢাকা বাংলাদেশ) মহাশয়ের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ না করে পারলাম না।

পশ্চিমবাংলার বহু পাঠাগারে এমন কি অনেক গ্রামে-গঞ্জে পত্র-পত্রিকা দেখার জন্য ঘুরেছিলাম। কোথাও কিছু তথ্য পেয়েছি, কোথাও কিছু সংগ্রহ করতে পারিনি। যে সব পাঠাগারে পত্র-পত্রিকা দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম, তার মধ্যে জাতীয় গ্রন্থাগার, সেণ্টার ফর স্টাডিজ ইন সোস্যাল সায়েন্সেস কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, গান্ধী মেমোরিয়াল কমিটির পাঠাগার, ব্যারাকপুর—গান্ধী মিউজিয়াম, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার, মুজাফ্‌ফর আহমদ পাঠাগার, তালতলা পাবলিক লাইব্রেরীর নাম স্মরণ করছি।

এই গ্রন্থে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত অনেক কাগজ নিয়ে আলোচনা করতে পারিনি। তার কারণ সব কাগজ আমার চোখে পড়েনি। কোথাও কোন কাগজের দু-একটি সংখ্যা দেখেছিলাম। তা' উল্লেখ করেছি। এই গ্রন্থে যে সব পত্র-পত্রিকা নিয়ে আলোচনা করেছি, তার একটি বড় অংশ কয়েক জনের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে দেখেছিলাম। সব কাগজ নিয়ে আলোচনা করেছি, একথা পাঠক যেন মনে না করেন। বহু পত্র-পত্রিকার কোন সন্ধান পাইনি। কয়েকদিন আগে হুগলী জেলায় কোন একটি গ্রামে 'ধর্ম্ম'' পত্রিকা চোখে পড়লো। এই পত্রিকার কথা গ্রন্থে উল্লেখ করতে পারিনি। 'ধর্ম্ম'' ছিল সাপ্তাহিক কাগজ। সম্পাদকঃ অরবিন্দ ঘোষ। বাংলা ১৩১৪ সালে প্রকাশিত কাগজ দেখেছিলাম। দাম প্রতি সংখ্যা দুই পয়সা ছিল। একটি লেখার কিছু অংশ হলো এইঃ '..বিশেষতঃ আমাদের রাজনীতিক জীবনে দৈনিক পত্রিকার অভাব গুরুতর অভাব। প্রতিদিন যাহা ঘটিতেছে, তাহা তৎক্ষণাৎ লোককে জানাইয়া সেই সম্বন্ধে জাতীয় দলের মত বা কর্ত্তব্য লোকের সম্মুখে স্থাপন করিতে না পারিলে আমাদের চেষ্টায় তেজ তৎপরতা ও ক্ষিপ্রতা হইতে পারেনা। সে দিন কলেজ স্কোয়ারে এক স্বদেশী সভা হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা ও বক্তৃতার সারাংশ একটি সুপ্রসিদ্ধ দৈনিক পত্রিকায় দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু পত্রিকার কর্ত্তাগণ প্রকাশ করিতে অসম্মত হন। সেই সভায় শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ অধ্যক্ষ হইয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং ঘন ঘন বয়কটের উল্লেখও হইয়াছিল, ইহাতে হয়ত কর্ত্তাগণ ভীত বা বিরক্ত হইলেন. সে ভয় ও বিরক্ত স্বাভাবিক, আজকালকার দিনে বয়কট নামের যত কম উল্লেখ হয়, ততই ব্যক্তিগত মঙ্গল সম্ভব। বয়কট প্রচারের জন্য স্বাধীন দৈনিক পত্রিকার আবশ্যকতা প্রতিদিন বোধ হইতেছে।'

পুরাতন পত্র-পত্রিকার খোঁজে পশ্চিমবাংলার অনেক গ্রামে ঘুরেছি। যদি কোথাও ব্যক্তিগত সংগ্রহ থাকে এই আশা নিয়ে ঘুরেছিলাম। কয়েকজন শুধু ঘুরিয়েছেন। নানা রকম গল্প শুনিয়েছেন। কিছুই দেখাতে পারেননি। তাঁদের কথা শুনে বৃথা অর্থ ব্যয় এবং সময় নষ্ট হয়েছিল। বাঁকুড়া এবং হুগলী জেলায় দুটি বাড়িতে কয়েকটি পত্র-পত্রিকা দেখার সুযোগ হয়েছিল। তাঁরা প্রথমে প্রতিজ্ঞা করতে বলেন। তারপর কয়েকটি পত্র-পত্রিকা দেখিয়েছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিলঃ নাম উল্লেখ করা চলবে

না, কৃতজ্ঞতা জানাতে পারবো না। ওই কথা মতো তাঁদের নাম উল্লেখ করতে পারলাম না। কিন্তু তাঁদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

অনেকে লেখার পরিকল্পনা করেন। কয়েকশো পৃষ্ঠা লিখেও তা' ছাপা অক্ষরে বেরোয় না। হয়তো, আমার এই লেখাও ঘরে পড়ে থাকতো। ডক্টর মহাদেবপ্রসাদ সাহা মহাশয়ের উৎসাহে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হলো। তা' ছাড়া ডক্টর মহাদেবপ্রসাদ সাহা মহাশয় ভূমিকা লিখে দিয়ে গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। তার জন্য প্রচলিত ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর স্নেহানুকূল্য খর্ব করতে চাই না। দীর্ঘদিন ধরে পুরাতন ছেঁড়া বই, কাগজ এবং অনেক পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ করেছিলাম। কিন্তু ওই সব নিয়ে লেখার আগে অনেক কাগজ জলে ভিজে, পোকায় কেটে নষ্ট করেছিল। যাদের রাখার জায়গা নেই, তাদের এইসব সংগ্রহ করার শখ বা খেয়াল হলে বেশি দিন রাখা সম্ভব নয়। আমিও রাখতে পারিনি। এই গ্রন্থে যেটুকু তথ্য পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরেছি, তাও হয়তো কোনদিন হারিযে যেত। রক্ষা করতে পারতাম না। গ্রন্থ মুদ্রণ ও প্রকাশনা ব্যাপারে শ্রীমিহির মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযোগেন বসুকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। টেম্পল প্রেসের কুশলী কর্মীবন্ধুদের সাহায্য পেয়েছি, তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আরও অনেকে গ্রন্থ প্রকাশে উৎসাহিত করেছিলেন। কিন্তু তার তালিকা দিয়ে বক্তব্য দীর্ঘ করতে চাইনা। যদি এই গ্রন্থ অনুসন্ধিৎসু পাঠক সমাজের ভাল লাগে তা হলে নিজেকে ধন্য মনে করবো।

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

৩, বেনিয়াপাড়া লেন,
কলকাতা-৭০০ ০১৪
স্বাধীনতা দিবস
১৫ই আগস্ট, ১৯৮৭

১ ॥ স্বাধীনতা দিবস

২৬শে জানুয়ারী ভারতবাসীর কাছে একটি পবিত্র দিন। শত শত শহীদের রক্তর্পণে এবং অসংখ্য দেশকর্মীর আত্মত্যাগে যে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, সেই স্বাধীনতার জন্য শপথ গ্রহণের দিন এই ২৬শে জানুয়ারী। এই দিনটিকে ভারতবাসী বিরাট স্বপ্ন নিয়ে গ্রহণ করেছিল। ভারতবাসী এই দিনে শপথ গ্রহণকালে পেয়েছিল অফুরন্ত শক্তি। প্রচণ্ড এক উন্মাদনা দেশপ্রেমিকদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল।

২৬শে জানুয়ারী প্রসঙ্গে জওহরলাল নেহেরু[১] লিখেছেন, '১৯৩০-এর ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস আসিল। বিদ্যুৎচমকের মত আমরা দেশের আগ্রহ ও উদ্দীপনা দেখিতে পাইলাম। সর্ব্বত্র বৃহৎ জনতা নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, স্বাধীনতার সংকল্পবাক্য উচ্চারণ করিতেছে, সে এক মহান দৃশ্য। সেখানে কোন বক্তৃতা নাই, অনুরোধ উপরোধ নাই। এই অনুষ্ঠান হইতে গান্ধিজী প্রেরণা লাভ করিলেন এবং দেশের নাড়ীর গতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা হইতে তিনি বুঝিলেন, কার্য্য করার সময় উপস্থিত। রঙ্গমঞ্চে ঘটনার দ্রুত সমাবেশে মহানাট্য জমিয়া উঠিল।'

জওহরলাল নেহেরু[২] লিখিত গ্রন্থ থেকে সংকল্পবাক্য উদ্ধৃত হলো।

১৯৩০ সালে ২৬শে জানুয়ারী দেশের অসংখ্য মানুষ যে স্বাধীনতা দিবসের সংকল্প-বাক্য পাঠ করে শপথ গ্রহণ করেছিলেন, সেই সংকল্পবাক্য হলো এই ঃ

'আমরা বিশ্বাস করি যে, আত্মবিকাশের পূর্ণ সুযোগলাভের জন্য অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের ন্যায় ভারতবাসীদেরও স্বাধীনতা লাভ করিবার, স্বীয় শ্রমার্জ্জিত বিত্ত ভোগ করিবার এবং জীবন ধারণের উপযোগী উপকরণ পাইবার অবিচ্ছেদ্য অধিকার আছে। আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, যদি কোনও গভর্ণমেণ্ট কোন জাতিকে এই সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত করে এবং তাহাকে নির্য্যাতন করে, তবে সেই গভর্ণমেণ্টকে পরিবর্ত্তন বা ধ্বংস করিবার অধিকারও এই জাতির আছে। ভারত গভর্ণমেণ্ট ভারতবাসীকে শুধু স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত রাখিয়াই বিরত হয় নাই, অধিকন্তু জনসাধারণের শোষণের উপরই আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতবর্ষের অর্থনীতি ও রাজনীতি, সভ্যতা ও অধ্যাত্ম সম্পত্তির সর্ব্বনাশ করিয়াছে, সুতরাং ভারতের পক্ষে ব্রিটিশ সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া পূর্ণ স্বরাজ অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

ভারতের অর্থনৈতিক সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আয়ের তুলনায় অত্যধিক

পরিমিত রাজস্ব আমাদের দেশের লোকের নিকট আদায় করা হয়। আমাদের দৈনিক আয় গড়পড়তা সাত পয়সা মাত্র। আমরা যে গুরু করভার বহন করিতে বাধ্য হই, তাহার শতকরা বিশ টাকা কৃষকদের নিকট হইতে ভূমি-কর স্বরূপ এবং শতকরা তিন টাকা লবণ শুল্ক বাবদ আদায় করা হয়। এই শুল্কভারে দরিদ্র জনসাধারণ অত্যন্ত পীড়িত হইতেছে।

সুতা-কাটা প্রভৃতি গ্রাম্য শিল্পের ধ্বংস সাধন করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে অন্যান্য দেশের ন্যায় কোনও নূতন শিল্পের প্রবর্ত্তন করা হয় নাই, ফলে দেশের কৃষক সম্প্রদায়কে বৎসরে অন্ততঃ চারি মাস কাল অলসভাবে সময় কাটাইতে হয় এবং শিল্প-নৈপুণ্যের অভাবে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তিও খর্ব্ব হইতেছে।

বাণিজ্য-শুল্ক এবং মুদ্রা-নীতি এরূপ চতুরতার সহিত পরিচালিত করা হইতেছে যে তাহার ফলে কৃষকদের বোঝা আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদের দেশের আমদানী পণ্যের মধ্যে অধিকাংশই ইংলণ্ডে প্রস্তুত। বাণিজ্য-শুল্ক ধার্য্য করিবার পদ্ধতি ব্রিটিশ শিল্পের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় এবং উক্ত শুল্কলব্ধ রাজস্ব দরিদ্রের দুঃখ নিরাকরণের জন্য ব্যয়িত না হইয়া ব্যয়বহুল শাসনতন্ত্র পরিচালনার জন্য ব্যয়িত হয়। মুদ্রা-বিনিময়-নীতি আরও অধিক যথেচ্ছাচারিতার পরিচায়ক ; ইহার ফলে কোটি কোটি টাকা দেশ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে।

ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতের রাষ্ট্রীয় অবস্থা যত হীন হইয়াছে, এরূপ আর কখনও হয় নাই। কোন প্রকার শাসন-সংস্কারই ভারতবাসীকে প্রকৃত রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করেন নাই। আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিকে পর্য্যন্ত বিদেশী শাসকগণের নিকট অবনত হইতে হয়। আমরা স্বাধীন মত প্রকাশ এবং স্বাধীনভাবে সঙ্ঘ সমিতি গঠনের অধিকারে বঞ্চিত। আমাদের দেশের অনেককেই নির্ব্বাসিত অবস্থায় বিদেশে কাল কাটাইতে হইতেছে। তাঁহারা স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে পারেন না। শাসনকার্য্য পরিচালনা উপযোগী সমস্ত প্রতিভার বিলোপ সাধনের ফলে জনসাধারণকে শুধু কেরাণীগিরি এবং গ্রাম্য পঞ্চায়েতী লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইতেছে।

সভ্যতা-সংস্কৃতির দিক দিয়া, বৈদেশিক শিক্ষা পদ্ধতি আমাদিগকে আমাদের বিশিষ্ট ভাবধারা হইতে বিচ্যুত করিয়াছে। ফলে যে শৃঙ্খল আমাদিগকে দাসত্বের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, সেই শৃঙ্খলকেই আমরা আদর করিতে শিখিয়াছে।

বাধ্যতামূলক নিরস্ত্রীকরণ আমাদের নৈতিক সর্ব্বনাশ করিয়া আমাদিগকে নির্ব্বীর্য্য করিয়া ফেলিয়াছে। আমাদের প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতাকে নিষ্পেষণ করিবার উদ্দেশ্যে নিযুক্ত বিজাতীয় সৈন্যদলের উপস্থিতির মারাত্মক ফল এই হইয়াছে যে, উহাদিগকে দেখাইয়া আমরা মনে করি যে, বিদেশীয়

আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে, এমন কি, চোর, ডাকাত, গুণ্ডা প্রভৃতির হস্ত হইতে নিজেদের গৃহ রক্ষা করিতেও আমরা অসমর্থ।

যে শাসন-পদ্ধতি আমাদের দেশের এই চতুর্বিধ সর্বনাশ সাধন করিয়াছে, সেই শাসন-পদ্ধতির অধীনে আর মুহূর্তকাল বাস করা আমরা মনুষ্যত্ব ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপরাধ বলিয়া মনে করি। এ কথা আমরা অবশ্যই স্বীকার করি যে, হিংসাই স্বাধীনতা অর্জনের প্রকৃষ্টতম পন্থা নহে; সুতরাং আমরা ব্রিটিশের সহিত সর্বপ্রকার স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতা যথাসাধ্য বর্জন করিবার জন্য প্রস্তুত হইব এবং কর প্রদান বন্ধ ও অন্যান্য উপায়ে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ-নীতি অবলম্বন করিবার জন্য প্রস্তুত হইব। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে উত্তেজনার কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আমরা যদি হিংসামূলক উপায় অবলম্বন না করিয়া স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতা বর্জন করিতে পারি এবং কর প্রদানে বিরত হই, তাহা হইলে এই অমানুষিক শাসনতন্ত্রের অবসান সুনিশ্চিত। অতএব এতদ্দ্বারা আমরা শান্ত সংহত দৃঢ়তার সংকল্প গ্রহণ করিতেছি যে, পূর্ণস্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কংগ্রেস যখন যেরূপ নির্দেশ দিবেন, আমরা সেই নির্দেশ ঐকান্তিকভাবে পালন করিব—বন্দেমাতরম্।'

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে ১৯২৮ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল। এই অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী জানিয়ে একটি প্রস্তাব সভায় পেশ করেছিলেন। ওই সময় সুভাষচন্দ্র বসু স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়কও হয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধিজী ও তাঁর সমর্থকদের বিরোধিতায় সুভাষচন্দ্র বসুর প্রস্তাব গৃহীত হয়নি।

বিভিন্ন সময়ে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে আমাদের চোখে পড়ে নানা ধরণের আন্দোলনের কথা। ভারত বিরাট দেশ। স্বাধীনতার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে নানাভাবে আন্দোলন হয়েছিল। দেশবাসীকে একত্র করার জন্য বিভিন্ন সময়ের নেতারা নানা পন্থা গ্রহণ করেছিলেন। যেমন: মহারাষ্ট্রে জনগণের দেবতারূপে 'গণেশ পূজা' বা 'গণপতি পূজা'। মহারাষ্ট্র এবং কলকাতায় 'শিবাজী উৎসব'। কলকাতায় 'ভারতমাতার পূজা' প্রভৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯০৫ সালে গঙ্গাস্নান করে 'রাখী বন্ধন', ওই দিনে 'অরন্ধন' পালন করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৩০ সালে ২৬শে জানুয়ারী এসেছিল সারা ভারতবাসীর মুক্তির আলো নিয়ে। এই কারণে ভারতের সকল সম্প্রদায়ের নর-নারী ২৬শে জানুয়ারী দিনটিকে মুক্তি দিবসরূপে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিল।

এক সময়ে কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে অনেকে পূর্ণস্বাধীনতার কথা ভাবতেও পারতেন না। তাঁদের অনেকে সেদিন 'ডোমিনিয়ন স্টেটাসের'

আদর্শে কিছু ক্ষমতা লাভের জন্য আন্দোলন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়[৩] লিখেছেন।

'এদিকে ১৯২৭ সালের শেষদিকে মাদ্রাজে আহূত কংগ্রেসের প্রস্তাব মত দিল্লীতে সর্বদলের এক সম্মেলন আহূত হইল। নানা দলের নানা মত মন্থন করিয়া একটি কমিটির উপর ভারতের ভাবী সংবিধান রচনার ভার অর্পিত হইল। মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে এই কমিটি গঠিত হয়। মোটামুটিভাবে ডোমিনিয়ন স্টেটাসের আদর্শে সংবিধান রচিত হইল। সুভাষ বসু, জওহরলাল প্রভৃতি যুবকরা এই সংবিধান অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে পারিলেন না, তাঁহারা স্বাধীন ভারত স্থাপনের পক্ষপাতী।'

এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা যেতে পাবে সেদিন দেশের অসংখ্য মানুষ স্বাধীনতা চেয়েছিলেন। তাঁরা 'ডোমিনিয়ন স্টেটাসের' কথা শুনে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তার একটি পরিচয় পাওয়া যায়, কলকাতার খিদিরপুর অঞ্চলের সঙের মুখ দিয়ে ব্যঙ্গ করে ছড়া কাটানো হয়েছিল :

শোনো, মা হবেন ডোমনী, / আর পব্‌বোনা কোপনী। / বিলেত কাপড় দেবে অমনি, / শোনো, মা হবেন ডোমনী। / মোদের ভাঙতে হবে চরকা, / সাহেবদের হবে না তড়কা। / মোদেব ভাঙতে হবে তাঁত, / তাঁতির কাটতে হবে হাত। / যারা খাটে দিন-রাত, / তারা খবর শুনে কাত। / শোনো, মা হবেন ডোমনী, / আর পব্‌বোনা কোপনী।

সেকালে বাংলার বিভিন্ন শহর ও গ্রাম থেকে সঙ বের হতো। কলকাতার জেলেপাড়ার সঙে 'হোমরুল' নিয়েও ব্যঙ্গ করা হয়েছিল। তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কৌতূহলী পাঠক আমার 'বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে' গ্রন্থে ২৫২ পৃষ্ঠা দেখতে পারেন। 'হোমরুল আন্দোলন' প্রসঙ্গে প্রফুল্লকুমার সরকার[৪] লিখেছেন : '১৯১৬ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন আহূত হয়, তাহাতে চরমপন্থী ও নরমপন্থী দলের মধ্যে আবার বিবাদ বাধিয়া উঠে। চরমপন্থী বা নবীন জাতীয়তাবাদী দল প্রস্তাব করেন যে, মিসেস অ্যানি বেশান্তকে ঐ অধিবেশনের সভানেত্রী করা হউক। মিসেস বেশান্ত তাহারই কিছু পূর্বে 'হোমরুল' আন্দোলন-এর জন্য বিনা বিচারে অন্তরীণ হইয়াছিলেন। নরমপন্থী মডারেট দলের নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মিসেস বেশান্তের সভাপতিত্বের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। এই সময়ে চরমপন্থী বা নবীন জাতীয়তাবাদী দলের মুখপাত্রস্বরূপ ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল ঘোষ, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, মৌলবী ফজলুল হক্, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথও ইঁহাদের সঙ্গে মিসেস বেশান্তকেই সভানেত্রীরূপে বরণ করিবার প্রস্তাব করেন।'

১৯৩০ সালে ২৬শে জানুয়ারী ভারতবাসী স্বাধীনতার জন্য সংকল্প গ্রহণ করেছিল। বিশ বছর পরে অর্থাৎ ১৯৫০ সালে ২৬শে জানুয়ারী,

ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস বলে ঘোষিত হয়। ওই দিন অশোকের স্তম্ভে সারনাথে যে প্রতীকটি রয়েছে, ভারতবর্ষ তাকে রাষ্ট্রীয় প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করে।

প্রসঙ্গ পঞ্জী

১। জওহরলাল নেহরু, আত্মচরিত, (সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্তৃক অনূদিত)।

২। জওহরলাল নেহরু, পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থ।

৩। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ভারতের জাতীয় আন্দোলন, পৃঃ ১৮৯।

৪। প্রফুল্লকুমার সরকার জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ (১৩৬৭) পৃঃ ৯৭।

২ ॥ বিপ্লবীদের পত্র-পত্রিকা

ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনের ইতিহাসে বিপ্লবীদের পত্র-পত্রিকার দান কম নয়। বিপ্লবীদের হিংসার পথ নিয়ে সেকালের জননায়কদের সঙ্গে বহু বিরোধ ছিল। কিন্তু তাঁরাও বিশ্বাস করতেন, বিপ্লবীরাও চেয়েছিলেন, ভারতের স্বাধীনতা। তাঁদের আপোসহীন সংগ্রাম ও ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য দেশবাসীর সঙ্গে সেকালের জননায়করাও বিপ্লবীদের শ্রদ্ধা করতেন। দেশবাসীর পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তির জন্য স্বাধীনতার আন্দোলনের ইতিহাসে সেকালের বাংলা পত্র-পত্রিকা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্রিকা প্রচারের বাহন। বিদেশীদের শাসন ও শোষণের কাহিনী দেশবাসীর সামনে তুলে ধরার জন্য বিপ্লবীরা পত্র-পত্রিকা বের করেছিলেন। সেদিন সংবাদপত্রকে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে গড়ে তোলার কথা বিপ্লবীরা ভাবতে পারেন নি। দেশবাসীর দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনী, বিভিন্ন সমস্যার কথা, দেশপ্রেমের বাণী প্রচার করাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। অনেকে সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী জনমত গড়ে তোলার জন্য লেখনী ধরেছিলেন। বিপ্লবীদের পত্র-পত্রিকা ছিল দেশপ্রেমিকদের প্রাণের জিনিস। ইংরেজ শাসন ও শোষণের কথা দেশবাসীর কাছে তাঁদের সাধ্য মতো পৌঁছে দেবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন।

১৯০৫ সালে বঙ্গ-ভঙ্গকে কেন্দ্র করে সারা বাংলাদেশের দেশপ্রেমিকরা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। অমরেন্দ্র-নাথ রায়[১] লিখেছেন, 'বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময়কে লোকে সাধারণতঃ স্বদেশী যুগ বলিয়া থাকে। ১৩১২ সালের শেষকাল হইতে ১৩১৮ সাল পর্যন্ত এই যুগের স্থিতিকাল। এই সময়টিকে যে হিসাবে স্বদেশী যুগ বলা

হয়, সে হিসাবে এই সময়কার বঙ্গ-সাহিত্যকে "স্বদেশী সাহিত্য" বলিলে বোধ করি তেমন দোষের হয় না। "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রের উচ্চধ্বনিতে সমগ্র দেশ তখন প্রকম্পিত ও প্রতিধ্বনিত। একদিকে যেমন সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্রের অগ্নিময়ী বাগ্মিতা তেমনি আর একদিকে রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত ও কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ প্রভৃতির আবেগময়ী গান ও কবিতা, গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদ প্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতির স্বদেশ প্রেমমূলক নাট্য-গ্রন্থের প্রাণস্পর্শী অভিনয়, মুকুন্দদাশের যাত্রা, অরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির দেশাত্মবোধপূর্ণ গদ্য নিবন্ধ এবং "সন্ধ্যা", "যুগান্তর" ও "নবশক্তি" প্রভৃতি দৈনিক ও সাপ্তাহিকের জ্বালাময়ী উচ্ছ্বাস, সমগ্র বঙ্গদেশে সে সময়ে স্বদেশ প্রেমের এক অপূর্ব্ব বন্যা আনিয়াছিল।'

১৯০৫ সালের ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে শ্রমিকেরাও সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। বাংলার শ্রমিকদের মধ্যে রাজনৈতিক অভ্যুত্থান ঘটেছিল। ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে কলকাতার ট্রামের শ্রমিকেরা ধর্মঘট করেছিলেন। তা' ছাড়া শ্রমিক অসন্তোষের ফলে ক্যালকাটা গেজেটের' প্রকাশ ১৯০৫ সালে বন্ধ হয়েছিল। কলকাতার সরকারী ছাপাখানার শ্রমিকেরা ১৯০৫ সালে তিন মাসের জন্য ধর্মঘট চালিয়েছিলেন। ১৯০৭ সালে বাংলার রেল শ্রমিকেরা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করেছিলেন। ওই বছর কলকাতার ডকের শ্রমিকেরা ধর্মঘটে নেমেছিলেন। ১৯০৮ সালে কাকনাড়া জুট মিলের শ্রমিকেরা ধর্মঘট করেন। ওই সময় পুলিশ শ্রমিকদের ওপর গুলি চালিয়েছিল। এই রকম বহু শ্রমিক আন্দোলনের কথা ইতিহাসের পাতায় ছড়িয়ে আছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শ্রমিক আন্দোলনের তথ্য সংক্ষিপ্তভাবে গোপাল ঘোষ লিখিত বই 'ভারতে প্রথম ধর্মঘট ও শ্রমিক ধর্মঘটের দিনলিপি' থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

যোগেশচন্দ্র বাগল[২] লিখেছেন, '১৯০৫ সালে ১১ই ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে লর্ড কার্জন চ্যান্সেলার রূপে একটি বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় তিনি সমগ্র এশিয়াবাসীকে মিথ্যাবাদী, অসাধু ও কপটতাপ্রিয় বলে আখ্যা দেন।'

লর্ড কার্জনের উক্তির প্রতিবাদে কলকাতার টাউন হলে এক বিরাট জনসভা হয়েছিল। রাসবিহারী ঘোষ কার্জনের উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন।

শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু[৩] লিখেছেন, 'লর্ড কার্জন তাঁর সমাবর্তন ভাষণে প্রাচ্যদেশীয়দের কার্যতঃ মিথ্যাবাদী বলেছিলেন। নিবেদিতা তার উত্তরে অমৃতবাজার পত্রিকায় এক বেনামা লেখায় কার্জনের নিজের রচনাংশ উদ্ধৃত করে তাঁকেই মিথ্যাবাদী বলে প্রমাণ করেন, যার ফলে বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। খুব অল্প কয়েকজনই আসল লেখক কে, তা' জানতেন।'

ভগিনী নিবেদিতা বিপ্লবীদের সমর্থন করতেন। এই কারণে ইংরেজ সরকার তাঁর গতিবিধির প্রতি যে দৃষ্টি রাখতেন তার পরিচয় পাওয়া যায় শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসুর লেখায়। শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু[৪] লিখেছেন, 'রাজনৈতিক আন্দোলনের সময়ে তাঁর সমস্ত চিঠি সেন্সারের ব্যবস্থা করেন।'

ইংরেজ শাসনে ভারতবাসী অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। বাংলার বিপ্লবীরা নানাভাবে আন্দোলনে নেমেছিলেন। তার মধ্যে একটি পথ হলো পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করে দেশবাসীকে সচেতন করা।

কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রীটের 'ডাফরিন হাসপাতালের কাছে কানাই ধর লেন। এই গলির ২৭ নং বাড়িতে 'যুগান্তর' অফিস স্থাপিত হয়। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, দেবব্রত বসু ও অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য 'যুগান্তর' কাগজের প্রতিষ্ঠাতা। বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য বহু বিপ্লবী 'যুগান্তর' কাগজে যোগ দিয়ে বিপ্লববাদ প্রচারে সহায়তা করেন।

বিপ্লবীরা কিভাবে গোপনে 'যুগান্তর' কাগজ বিক্রি করতেন, তার পরিচয় পাওয়া যায় চন্দ্রাবতী[৫] লিখিত গ্রন্থে। চন্দ্রাবতীর লেখা কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হলো ঃ

'সশস্ত্র আন্দোলন প্রচার করবার জন্য তাঁরা "যুগান্তর" নামে একখানা পত্রিকা বের করলেন। বাবা বললেন পত্রিকাটা আমাদের শ্যামবাজার অঞ্চল থেকেই বেরুত। আমাদের বাড়ীর পাশেই ছিল ভট্টাচার্জি মশায়ের বাড়ীর মশলার দোকান। সন্ধ্যার পর তিনি দোকান বন্ধ করে আমাদের বেনে-বৈঠকখানা ঘরে এসে বসতেন। হঠাৎ ওই যে চাদর গায়ে দেওয়া লোকটা বাড়ীতে ঢুকল ও কে? ও তো সরাসরি বৈঠকখানা ঘরে এসে উপস্থিত হল। চাদরের অন্তরাল থেকে একখানা কাগজ বের করে ফেলে দিয়ে গেল। একটা কথাও বলল না। লোকটা যেমন এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। লোকটা চলে যাবার পরই জ্যাঠামশাই উঠে গিয়ে সদর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসলেন। তারপর সকলে মিলে লোকটার ফেলে দিয়ে যাওয়া "যুগান্তর" পত্রিকাখানা পড়তেন ও আলোচনা করতেন।'

'যুগান্তর' প্রসঙ্গে James Campbell Ker লিখেছেন[৬],

'The Yugantar

The first and most pernicious of the revolutionary papers of Calcutta was the Yugantar (New Era) started in 1906 by Barindra Kumar Ghose and Abinash Chandra Bhattacharji, members of the Maniktolla Conspiracy and Bhupendra Nath Dutt, the brother of Swami Vivekananda, founder of the Ramkrishna Mission. The paper was seditious from the very start, but before being prosecuted it received on June 7th,

1907, a warning from the Government of Bengal in respect of an article which appeared in the issue of the 2nd of June. The warning had no effect, and the issue of June 16th contained two articles enlitled "Away with Fear" and "The Medicine of the Big Stick" for which Bhupendra Nath Dutt, as editor, was prosecuted. He admitted full responsibility for the articles and was convicted by Mr. Kingsford on 24th July, 1907, and sentenced to one year's rigorous imprisonment; the press was ordered to be confiscated as an instrument used in the Commission of the offence. On appeal the conviction and sentence were upheld, but the order of confiscation was set aside by the High court on the ground that the press could not be so regarded.

The paper re-appeared at once and the tone was worse than before. A prosecution was therefore instituted against Abinash Chandra Bhattacharji as manager of the paper, and Basanta Kumar Bhattacharji as printer and publisher, in respect of articles in the issues dated 30th July and 5th and 12 August 1907'.

'যুগান্তর' ও বিপ্লবীদল প্রসঙ্গে লিখেছেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়[৭]। তাঁর লেখা থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হলো।

'...বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের পূর্বে যে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার জন্য গুপ্ত সভা-সমিতি স্থাপনের চেষ্টা না হইয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু তাহা কার্যতঃ বিশেষ ফলদায়ী হয় নাই। ১৯০৫ সালে সমস্ত বাংলাদেশ লর্ড কার্জনকৃত অপমানে যে বাত্যাবিক্ষুব্ধ সাগরবক্ষের মত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল সেই চাঞ্চল্য হইতে প্রকৃতপক্ষে বাংলার বিপ্লববাদের উৎপত্তি। দেশের মধ্যে তখন যে প্রবল উত্তেজনাস্রোত বহিতেছিল তাহাই আবার বিশেষ ঘূর্ণাবর্তে পরিণত হইয়া বিপ্লবকেন্দ্রের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল। "যুগান্তর" ছিল ঐরূপ একটি বিপ্লবকেন্দ্রের মুখপত্র। ঐ সংবাদপত্রের পরিচালকগণের সংস্রবে আসিয়াই আমি বিপ্লবী দলে যোগ দিয়াছিলাম।'

বিপ্লবী আন্দোলন প্রসঙ্গে লিখেছেন বলাই দেবশর্মা[৮]। স্বদেশী আন্দোলনে সংবাদপত্রের ভূমিকা প্রসঙ্গে আলোচনাকালে লিখেছেন:

'...১৯০৫ খৃষ্টাব্দের স্বদেশী আন্দোলন হইতে অখণ্ড ভারতের রাষ্ট্র-স্বাধীনতার জন্য যে গুপ্ত প্রচেষ্টা হইয়াছিল, তাহা হইতেই আলোচনা আরম্ভ করিতেছি। বাস্তবিকপক্ষে বাংলার বৈপ্লবিক তরুণগণই—স্বায়ত্ত শাসন, হোমরুল প্রভৃতি ইংরেজ কমনওয়েলথ সংযুক্ত শাসনাধিকারের পরিবর্তে দেশের পূর্ণ স্বাধীনতালাভে ব্রতী হইয়াছিলেন—চাহিয়াছিলেন

ইংরেজ বর্জিত ভারতবর্ষ। বৈপ্লবিকগণের ইহা কেবল আদর্শগত ভাবনা ছিল না, ইহা ছিল একান্ত বাস্তবপন্থী ও সক্রিয়।

এই সক্রিয়তার একটি অভিব্যক্তি হইতেছে বিপ্লববাদী সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার। "সন্ধ্যা", "যুগান্তরের" প্রকাশকাল পর্যন্ত বাংলার সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রসমূহ বৈধ আন্দোলনের মুখপত্র ছিল। চরমপন্থী রাজনীতিকরা বৃটিশ ব্যতিরিক্ত স্বাধীনতার কথা চিন্তা করিতেছিলেন বটে, তবে সে আকাঙ্ক্ষা সংবাদপত্রের মধ্যস্থতায় তখন আত্মপ্রকাশ করে নাই। ভারতীয় জাতির স্বয়ং কর্তৃত্বের কথা ব্রহ্মবান্ধবের "সন্ধ্যা" পত্রিকাতেই প্রথম উদ্ঘোষিত হইল। ১৩১২ সালে জন্মাষ্টমীর দিন "সন্ধ্যা" দৈনিক পত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিল। সম্পাদকীয় নিবন্ধে উপাধ্যায় লিখিলেন, "আমাদিগকে সর্বতোভাবে স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে হইবে। আমরা স্বরাজগড় প্রতিষ্ঠা করিব। সেখানে ফিরিঙ্গীর কোনও নামগন্ধ থাকিবে না।"

বলাই দেবশর্মা[৯] আরও উল্লেখ করেছেন:

'সন্ধ্যার পরই যুগান্তর। বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্র প্রচারের জন্য যুগান্তরের প্রকাশ। উহার মর্মবাণী এইরূপ:

'অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত মোরা, অভয়া চরণে নম্রশির।'

"যুগান্তর" অখণ্ডবঙ্গের আকাশ বাতাস আলোড়িত করিয়া বাঙ্গালীকে প্রতিবোধিত করিতে লাগিল:

অস্ত্র নাই তাই দুঃখ? পাইবে কি প্রহরণ / সাধিলে কাঁদিলে? বক্তৃতার উচ্চকণ্ঠ কর সংবরণ, / প্রস্তর গলিবে কিরে নয়ন সলিলে? / কোটি কোটি ক্ষীণ হস্ত মুক্তির সংগ্রামে / উঠি যদি এককালে স্বাধীনতা তরে।'

স্বস্তিকা[১০] পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংগীত ছাপা হয়েছিল। এই গান বৈপ্লবিক আদর্শবাদের মুখপত্র তৎকালীন 'যুগান্তরে' প্রকাশিত হয়ে সারা দেশে যথেষ্ট উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল।

'না হইতে মাগো বোধন তোমার / ভেঙ্গেছে রাক্ষস মঙ্গল-ঘট, / জাগো রণচণ্ডী! জাগো মা আমার! / আবার পূজিব চরণ তট॥ / অগুরু চন্দন ধূলায় ধূসর / ভূমিতে লুটায় চামর চাঁচর, / মঙ্গল শিখা গিয়াছে নিবিয়া, হলো না বুঝি মা পূজন তোমার— / ভেঙ্গেছে রাক্ষস মঙ্গল ঘট। / ঐ গঙ্গাজল রয়েছে পড়িয়া / জবা বিল্বদল গেল শুকাইয়া, / পূজার সময় যায় যে বহিয়া— / জাগো মা আমার! সময় নিকট। / দৈত্য-তেজ নাহি কার পরাভব / বিজয় শঙ্খ কেন মা নীরব? / হুঙ্কারে বিনাশ প্রচণ্ড দানব, / অট্ট অট্টহাসে হাস মা বিকট॥'

'যুগান্তর' প্রসঙ্গে যোগেশচন্দ্র বাগল[১১] লিখেছেন:

"সাপ্তাহিক যুগান্তর"—কি সংবাদপত্র পরিচালনে, কি রাষ্ট্রীয় কর্ম-পদ্ধতি বিশ্লেষণে বাংলাদেশে যুগান্তর সৃষ্টি করে। এর সম্পাদক ও

পরিচালক ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। অরবিন্দ ঘোষ, সখারাম গণেশ দেউস্কর, দেবব্রত বসু (পরলোকগত প্রজ্ঞানানন্দ স্বামী), অরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিগণ ছিলেন যুগান্তরের লেখক। যুগান্তর তরুণ দলের মুখপত্র। যুগান্তর-পক্ষীয়দের আদর্শ ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা। বাহুবলকে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের উপায় বলে তাঁরা বিশ্বাস করতেন।"

'যুগান্তর' পত্রিকার নাম গ্রহণ করা হয়েছিল—শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিত 'যুগান্তর' উপন্যাস দেখে। এই নামটি সেদিন বিপ্লবীদের মনের মতো হয়েছিল। 'যুগান্তরের' দাম ছিল এক পয়সা। সাপ্তাহিক কাগজ হিসাবে ২৭ নং কানাই ধর লেন থেকে বেরোত। পরে স্থানান্তরিত হয় ৪১ নং চাপাতলা ফার্স্ট লেনে। এর পরে ২৮/১, মির্জাপুর ষ্ট্রীট এবং ৭৫ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে অফিস স্থানান্তরিত হয়।

খ্যাতনামা সাংবাদিক প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বলতেন, 'যুগান্তর' প্রায় সাত হাজার কপি ছাপা হতো। একথা তিনি সেদিনের বিপ্লবীদের কাছে শুনেছিলেন। তিনি আরও বলতেন, 'যুগান্তর' কিছু কপি বিনামূল্যে বিপ্লবীদের কাছে পাঠানো হতো। তা' হলেও বেশ ভালো সংখ্যা বিক্রি হতো। যুগান্তর পত্রিকার দরদীরা অনেকে কাগজের জন্য টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করতেন।

সেকালের ইংরাজী সংবাদপত্র *The Englishman* [১২] কাগজে 'যুগান্তর' মামলার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। ওই সংবাদের কিছু অংশ হলো এই :

'The Jugantar' case,

Mr. Roy : I may be able to commence doing so to-day, and take on some of the witness.

Kali Charan Roy of Chorebagan, a newspaper hawker, was the first witness called and stated that he knew the 'Yugantar' newspaper, which had its office at 28/1, Mirzapur Street, for the past month and a half or two months. Before that the office was situated close to the Medical College.

He had been weekly to the office of the paper in Mirzapur Street, to buy newspapers. Witness used to buy 100 copies of the paper for Rs 1/- and he used to sell them at a pice a copy, and make a profit of 9 annas.'

পুলিশ 'যুগান্তরে' লেখার জন্য ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে গ্রেপ্তার করে। ওই মামলার সংবাদ ছাপা হয়েছিল সেকালের *The Englishman* [১৩] কাগজে। এই কাগজের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হলো :

'Mr. A. C. Banerji, with Babu Monoj Mohan Bose, appeared on behalf of the editor, and applied for bail on his behalf.'

এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে আদালতে পুলিশ থেকে নিযুক্ত ছিলেন ইন্সপেক্টর পি, সি, লাহিড়ী।

যুগান্তর কাগজের মামলার আর একটি সংবাদ *The Englishman* [১৪] কাগজে ছাপা হয়েছিল। ওই সংবাদের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হলো :

'The next witness was Srimanta Roy Choudhury, Printer, "Keshub Printing Works" of . . . . . . He said he knew the accused for the last eight or ten months. He knew the "Jugantar" three of its issues were printed at the Keshub Works. Witness printed them under orders of the accused, whom he knew as Editor and Proprietor (in fact all in all) of the paper. The type was set up at the "Jugantar" office. Witness used to put it on the press of the Keshub Printing Works on the 16th June, witness printed 3,000 copies of the paper, although he had orders to strike 7,000 copies. Witness also admitted having printed the issues of the 2nd and the 16th June respectively. Witness's assistant Nibaran, printed the issue of the 9th June.

Babu Narain Chandra Bhattacharya, Bengali translator to the local government, deposed that he knew "Jugantar". He subscribed for it in his official capacity.'

যুগান্তর কাগজের মামলা নিয়ে সেকালে কলকাতায় যে কি আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় *The Englishman* [১৫] কাগজে প্রকাশিত একটি সংবাদ থেকে। ওই সংবাদ এখানে উদ্ধৃত হলো :

'Sedition in Calcutta, and the Extremists

On Wednesday a huge gathering assembled in College Square to express sympathy with the convicted Editor of the "Jugantar". Babu Bepin Chandra Pal presided. Besides the President Babu Brahma Bandhab Upadhyaya, Editor of the "Sandhya", Babu Shamsundar Chakrabarty, of the 'Bande Mataram", and others spoke, Babu Brahmabandhab Upadhya said that they had gathered there not to mourn, but to express joy at the dignified manner in which the convicted had met the charge. If the government had adopted the violent measure with the intention of sending a thrill of terror, the speaker observed, they were sadly mistaken.

If would strongly foster a strong desire in many a mind to emulate the convicted, and to strive hard after the rare crown of martyr. In the couse of his speech, Babu Bepin Chandra Pal said that the conviction had, so to speak, laid the foundation-stone of the Swaraj here in Calcutta, while bricks had long been laid in the Punjab, in the shape of the deportation of prominent men like lala Lajpat Rai and Ajit Sing.'

বিদেশী শাসন ও শোষণের কথা স্মরণ করে প্রচণ্ড বেদনা বোধ করেছিলেন সেদিনের দেশপ্রেমিকরা। দিকে দিকে শুরু হয়েছিল স্বাধীনতার আন্দোলন। সেই আন্দোলনের কাহিনী আজকের স্বাধীনতার ইতিহাস। স্বাধীনতার ইতিহাস আজ নতুন করে লেখা শুরু হয়েছে। এই ইতিহাস সাধারণ মানুষের সংগ্রামের কাহিনী। আজকের মানুষ খুঁজছে যাঁরা স্বাধীনতার জন্য বুকের তাজা রক্ত দিয়েছিলেন তাঁদের কথা। যাঁরা দেশকে স্বাধীন করার জন্য বন্ধুর পথে এগিয়ে গিয়ে দেশবাসীর কাছে পেঁাছিয়ে দিয়েছিলেন স্বাধীনতার বার্তাকে। সেইসব মহান বিপ্লবী কর্মী বিপ্লবের বার্তা দশের কাছে পেঁাছিয়ে দিয়েছিলেন। বিপ্লববাদ ভারতের মুক্তি আন্দোলনের একটি পথ হিসাবে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। এই কারণে, সেদিন বিপ্লবীদের পত্র-পত্রিকাগুলিকে বোমা-পিস্তলের মতো ইংরেজ সরকার ভয় করতো।

কোন কোন রাজনৈতিক দল প্রচার করেন ভারতের স্বাধীনতা অহিংসার পথে হয়েছে। কিন্তু এই কথা ঠিক নয়। হিংসা ও অহিংসা উভয় পথ ধরে আন্দোলনের ফলে ভারত স্বাধীন হয়েছে। বিপ্লবীদের প্রচুর অবদান রয়েছে। বিপ্লবীদের সমর্থন করে যে সব পত্র-পত্রিকা দেশবাসীর সামনে স্বাধীনতার বাণী পেঁাছিয়ে দিয়েছিলেন তার সঠিকভাবে ইতিহাস লেখা এখনও হয়নি। সেকালে একদল সাংবাদিক বিপ্লবীদের সুরে সুর মিলিয়ে তাঁরা লেখনী ধরেছিলেন। সেকালের সাংবাদিকদের ত্যাগের কথা, তাঁদের দেশভক্তি, সাহস দেশের সাধারণ মানুষকে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিল। সেদিনের সাংবাদিকরা দেশের স্বাধীনতার চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার কথাও চিন্তা করেছিলেন। বিপ্লবীদের আন্দোলন ও তাঁদের নিরলস প্রয়াস চালানোর ফলে দেশ স্বাধীন হয়েছে ইহাতে কোন সন্দেহ নেই।

যুগান্তরের সম্পাদক ছিলেন বাংলার অগ্নিযুগের অন্যতম বিপ্লবী নায়ক সুপণ্ডিত ও লেখক ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। বিপ্লবের কথা প্রকাশের জন্য তিনি এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। কারাগারে কর্ণেল মুলকান নামক এক আইরীশম্যান তাঁকে ঘানি ঘুরিয়ে তেল বের করার কাজে লাগিয়েছিল। জেল থেকে বেরিয়ে অজ্ঞাতভাবে তিনি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে

যাত্রা করেন। তিনি তুরস্ক, মস্কো, সুইডেন প্রভৃতি স্থানে যান। ১৯২১ সালে কমিণ্টার্ণের আহ্বানে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সোভিয়েট নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। ১৯২৬ সাল থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত কলকাতার ট্রাম ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ও বাস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এবং ১৯৩১ সালে প্রেস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন। তিনি সমাজতন্ত্রের ভাবধারা প্রচার করতে চেয়েছিলেন। রাজনৈতিক কর্মীদের প্রতি তাঁর ছিল নিবিড় মমত্ববোধ। এই অকৃতদার বিপ্লবী ৮২ বছর বয়সে ১৯৬১ সালে ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাংলা সন ১৩১৩ সালে অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য[১৬] 'যুগান্তর' থেকে বিভিন্ন লেখা পুনর্মুদ্রিত করে কয়েকটি বই বের করেছিলেন। বই 'যুগান্তর' অফিস, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। ওই সময় 'যুগান্তর অফিস ছিল ৪১ নং চাঁপাতলা ফার্স্ট লেনে। অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য যুগান্তরের কার্যাধ্যক্ষ ছিলেন। যুগান্তরের বার্ষিক মূল্য ১॥০ ছিল। আগে উল্লেখ করা হয়েছে যুগান্তর সাপ্তাহিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হত।

শ্রীশংকরীপ্রসাদ বসু[১৭] লিখেছেন, 'স্বামীজির ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত রাজদ্রোহের জন্য কারাবাস করার পরে আমেরিকায় গেলে সেখানে তাঁর পড়াশোনার ব্যবস্থা করেন নিবেদিতা,…'

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় চারিদিকে স্বদেশী সাহিত্য প্রচার শুরু হয়েছিল। ওই সময়ের সংবাদপত্র এবং পত্র-পত্রিকা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এবং সংবাদপত্র প্রসঙ্গে লিখেছেন ডক্টর তারাশঙ্কর ব্যানার্জি[১৮]। তাঁর লেখার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হলো ঃ

'The Partition of Bengal is a great landmark in the history of the national movement in India and thereby in the history of the press. The people of Bengal, nay the people of India, were fired with nationalist sentiment ever since the partition plan was officially announced in 1903. The Country was flooded with enthusiasm and there was a tremendous growth in the Bengal press.'

প্রফুল্লকুমার সরকার[১৯] স্বদেশী যুগের আন্দোলন প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

'১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের আদেশের পর স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়। কিন্তু এই আন্দোলন সহসা আবির্ভূত হইয়াছিল কোন ঐতিহাসিক এমন কথা বলিবেন না। কোন জাতির জীবনেই কোন বৃহৎ ঘটনা, কোন প্রচণ্ড যুগান্তকারী আন্দোলন অকস্মাৎ হয় না, তাহার পশ্চাতে দীর্ঘকালব্যাপী একটা সাধনার ইতিহাস নিশ্চয়ই থাকে। বাঙ্গলায় যুগান্তকারী স্বদেশী

আন্দোলনের পশ্চাতেও যে এমনই একটা ইতিহাস আছে, তার পরিচয় ইতি-পূর্বেই আমরা কিছু দিয়েছি। এইবার স্বদেশী আন্দোলনের অব্যবহিত পূর্বের কথা—বিশেষ ভাবে ১৯০০-১৯০৫ এই কয়েক বৎসরের কথা বলিব। এই যুগের নাম দেওয়া যাইতে পারে 'স্বদেশী যুগের ঊষা'।

'সূর্যোদয়ের পূর্বে ঊষার আগমন, তখনও রাত্রির অন্ধকার ভাল করিয়া কাটে নাই, লোক-কোলাহল ভাল করিয়া জাগে নাই। তবে উদ্যোগ পর্বের একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, পাখীর কাকলী শোনা যাইতেছে, পূর্বাকাশে অরুণের রেখা কেবল দেখা দিয়াছে। বাঙলা দেশেও ১৯০০-১৯০৫ সাল এমনই একটা উদ্যোগ-পর্বের যুগ।'

স্বদেশী আন্দোলনের সময় অমৃতলাল বসু গান রচনা করিয়াছিলেন ঃ

ওরা জোর করে দেয় দিক্‌না বঙ্গ বলিদান। / আমরা রব অন্তরঙ্গ, এক অঙ্গে মনের সঙ্গে মিলিয়ে প্রাণ। / আমরা জাত বাঙ্গালী প্রেম-কাঙ্গালী— / ভাবছিস্ তোরা মন ভাঙালি, / তা' নয় জ্বালিয়ে আগুন করে দ্বিগুন / বাড়িয়ে দিলি প্রাণের টান। / আমাদের চোখ ফিরেছে মায়ের কুঁড়েতে, / বিদেশী চিনির চেয়ে দেশের গুড়েতে, / আবাব কর্কচেতে হয়েছে রুচি চাইনে / তোদের লবণ দান। / আমাদের ভাতেব সঙ্গে তাঁত বজায় থাক্, / নাই বা দেখাই সাজের জাঁক, / তোদের ওই চক্‌চকান মধুব চাকে / করবো না আর বিষ-পান। / তোদের কাঁচের বাসন কাঁচের চুড়ি, / ফেলবো ভেঙে মেরে তুড়ি, / করে দেবতা সাক্ষী ঘরেব লক্ষ্মী / শাঁখার আবার রাখবো মান।

বঙ্গভঙ্গ বাতিল করার জন্য সারা বাংলা দেশের মানুষ তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল। এই সময় থেকে দেশব্যাপী বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়। একদিকে দেশ নেতারা স্বদেশী শিল্পের প্রচার অন্য দিকে বিদেশী শিল্প বর্জন বা 'বয়কট' করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রফুল্লকুমার সরকার[২০] লিখেছেন ঃ

'নূতন দলের শক্তিশালী নেতা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এই সময়ে "সন্ধ্যা" নামক বিখ্যাত দৈনিক পত্র প্রকাশ করিয়া এই সমস্ত কথা জোরের সঙ্গে প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গে আরও অনেক শক্তিমান ব্যক্তি আসিয়া যোগ দিলেন, যথা—শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা প্রভৃতি। বিপিনচন্দ্র পালও তাঁহার 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রে জ্বালাময়ী ভাষায় নূতন দলের মত প্রচার করিতে লাগিলেন। Passive Resistance বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের নীতি রাজনৈতিক সংগ্রামের পন্থা হিসাবে বিপিনচন্দ্রই প্রথমে 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রে প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ইহার অব্যবহিত পরে (মোহনদাস করমচন্দ) গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় "সত্যাগ্রহ" নীতি অবলম্বন করেন। বিপিনচন্দ্রের "নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ" যে গান্ধীর সত্যাগ্রহের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ

নাই। কংগ্রেসের নিয়মতন্ত্রবাদীরা ভারতের জন্য তখন "ডোমিনিয়ান স্টেটাস" ব্রিটিশ সাম্রাজ্যর মধ্যে বা "ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন" চাহিতেন। ১৯২৮ পর্যন্ত গান্ধীর নেতৃত্ব আরম্ভ হইবার পরেও কংগ্রেস এই ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের বেশী কিছু দাবী করে নাই। কিন্তু বিপিনচন্দ্র সেই স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হইতেই জাতির পক্ষ হইতে "নিউ ইন্ডিয়া" পত্রে জোরের সঙ্গে "Full Autonomy" বা পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের দাবী প্রচার করিতে লাগিলেন। নূতন দলের মতবাদ এইভাবে দ্রুত গড়িয়া উঠিতে লাগিল, দেশের যুবকেরা তাহাতে সাড়া দিতে লাগিল।'

প্রফুল্লকুমার সরকার[21] আরও উল্লেখ করেছেন: 'বিপিনচন্দ্র দাবী করিয়াছিলেন Full Autonomy বা পূর্ণস্বাতন্ত্র্য। শ্রীঅরবিন্দ আরও স্পষ্টভাবে জাতির পক্ষ হইতে দাবী করিলেন—Independence বা স্বাধীনতা। সে স্বাধীনতা যে ভিক্ষার পথে লাভ হইবে না, তাহার জন্য আত্মশক্তির সাধনা করিতে হইবে, ইহাও তিনি নির্ভীক ভাবে জাতির নিকট প্রচার করিলেন।'

James Campbell Ker[22] লিখিত গ্রন্থে 'সন্ধ্যা' পত্রিকার কথা উল্লেখ আছে। ওই গ্রন্থের কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো:

"The paper was extremely seditious and fanatical, and in August, 1907, proceedings were taken against it, the manager Saroda Charan Sen was arrested on the 29th, and the editor Brahmo Bandhab Upadhyaya and the printer and publisher Haricharan Das on September 3rd. While the case was still pending the editor died, and on November 18th the case against the others were withdrawn as they explained that they had been under the influence of the deceased, admitted that the articles charged were both scurribous and seditious, and tendered an apology to the Government of Bengal.'

যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়[23] 'সন্ধ্যা' প্রসঙ্গে লিখেছেন:

"খুব সাধারণ লোকদের মনকে তেমনি পেয়ে বসেছিল "সন্ধ্যা" কাগজ। এর "মাস্তুক" বা শিরোনামা এবং সম্পাদকীয় লেখার ঢং একটা সত্যি নতুন জিনিস ছিল। এ লেখায় অল্প-শিক্ষিত, অর্ধ-লিখিত বা অশিক্ষিতরা 'মন বাঁধা, প্রাণ বাঁধা' কিছু মাল পেয়ে যেত। 'লে মাটি দে চাপা', 'সুশীলের তুড়ি লাফ', 'ফিরিঙ্গীকে বলায় বাপ', 'ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারে', 'কালীঘাটে জোড়া পাঁঠা', 'কুদে-লাট ফুলার', 'লাঠি খটাখট বম ফটাফট' ইত্যাদি যখন কাগজ ফেরিওয়ালার আকাশ ফাটানো গলায় বেরুত, সে কী ভিড় [illegible] খরিদ করতে।

টিনওলা, ছুতোর মিস্ত্রী, কামার-কুমোর, ছোট দোকানদার কে-না কিনত এ কাগজ ? একটি কাগজের চারপাশে অসাধারণ ভিড় নিয়মিতভাবে দেশের খবর শুনত। "সন্ধ্যা" কাগজের জনপ্রিয়তার দিক থেকে উপরি-উক্ত চিত্র দেওয়া হয়েছে। শিক্ষিত ভদ্রলোকেরাও একে মুখরোচক হিসাবে যথেষ্ট সংখ্যায় পড়তেন। সাহেবরা এর ওপর ভারী চটা ছিল। কেননা "সন্ধ্যা" তাদের ফিরিঙ্গী ছাড়া অন্য আখ্যায় বর্ণনা করত না। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে এ কাগজের প্রতিষ্ঠাতা খুব সাফল্য লাভ করেছিলেন। সাধারণের ভিতর নতুন দেশপ্রেম ঢোকাতে ও ছড়াতে এ কাগজ ছিল অদ্বিতীয়।'

যদুগোপাল মুখোপাধ্যায[২৪] 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

'যুগান্তর-এর লেখা ছিল আর এক ধরণের। উচ্চ-ভাব, সাবলীল পুষ্পায়িত ভাষা, তীব্র তেজস্বীতা, সুন্দর দার্শনিক তত্ত্ব, অগ্নিময় উদ্দীপনা ও চমৎকার তথ্য বিশ্লেষণ।'

'সন্ধ্যা' ও সেকালের অন্যান্য পত্র-পত্রিকা প্রসঙ্গে প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়[২৫] লিখেছেন ঃ

'আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী দল নিজ মতবাদ প্রচারের জন্য সংবাদপত্র স্থাপনের উদ্যোগী হইলেন। 'সন্ধ্যা' এই দলের মুখপত্র ছিল। কিন্তু ইংরেজীতে সংবাদপত্র প্রয়োজন বোধ করায় হরিদাস হালদারের নিকট সামান্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া বিপিনচন্দ্র পাল "বন্দেমাতরম্" পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। বিহারীলাল চক্রবর্তী মহাশয়ের ছাপাখানা হইতে এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তাহার পর সুবোধচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, রজনীনাথ রায় প্রভৃতির সহায়তায় এই পত্রিকা পরিচালনের ব্যবস্থা হইলো ক্রীক রোতে অফিস স্থানান্তরিত হয় ও অরবিন্দ ঘোষ পত্রিকা পরিচালনার ভার গ্রহণ কবেন। মনোরঞ্জন ও অরবিন্দ পরিচানায় 'নবশক্তি' নামে একটি বাঙ্গালা পত্রিকাও বাহির হয়। তরুণের দল নিজ মতবাদ প্রচার করিবার জন্য "যুগান্তর" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করিতে থাকেন।'

ভারতের স্বাধীনতা যে আবেদন-নিবেদনের ভিতর দিয়ে আসবে না, একথা বিপ্লবীরা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। এই কারণে তাঁরা একদিকে বোমা-পিস্তলের সাহায্য গ্রহণ করে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ রাজপুরুষদের অস্থির করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। অপর দিকে বিপ্লবের বাণী দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করার জন্য তাঁদের অনেকে পত্র-পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়[২৬] লিখেছেন ঃ 'এইরূপে চরমপন্থী ও নরমপন্থী দলের বিচ্ছেদ ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইয়া উঠে। নরমপন্থীদল ইংরাজ সরকারের শুভমতির উপর আস্থাবান থাকায় আবেদন-নিবেদনে অবিশ্বাসী চরমপন্থী দল জাতির আত্মপ্রত্যয় জাগাইয়া শক্তিশালী জাতি গঠনে উদ্যমশীল হইয়া পড়েন।

'ইহার পর উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে সন্ধ্যা'র বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ ও উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের মৃত্যু। "ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে" নামক একটি প্রবন্ধের জন্য ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের শেষাশেষি উপাধ্যায়কে রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়। ইংরাজ সরকারের বিচারে যে তাঁহার আস্থা নাই, ইহা প্রদর্শনের জন্য উপাধ্যায় বরবেশে আদালতে উপস্থিত হইলেন। তিনি মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে সম্মত হইলেন না। একটি লিখিত জবানবন্দীতে বলিলেন তিনি "Not responsible to an alien Government for his humble share in God ordained Mission of Swaraj", অর্থাৎ বিধিনির্দিষ্ট স্বরাজ লাভের ব্যবস্থায় তিনি যে সামান্য অংশ গ্রহণ করিতেছেন, তাহার জন্য বিদেশী সরকারের নিকট কোনও জবাবদিহি তাঁহার করিবার নাই ; কারণ তিনি সেই সরকারের নিকট কোন দায়িত্ব স্বীকার করেন না।'

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রসঙ্গে একটি মূল্যবান ও তথ্যবহুল গ্রন্থ লেখেন প্রবোধচন্দ্র সিংহ[২৭]। উক্ত গ্রন্থে উল্লেখ আছে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় 'সন্ধ্যা' প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লিখেছিলেন ঃ

'সন্ধ্যা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি এই প্রকাশ করিলেন—দুঃসময় পড়িলে লোকে বলে, এই ত কলির সন্ধ্যা অর্থাৎ কালরাত্রির কেবলমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। অন্ধকার ঘুচিয়া গিয়া সুপ্রভাত হইতে এখন অনেক বিলম্ব। কিন্তু কলির সন্ধ্যার একটি শাস্ত্রীয় অর্থ আছে। বারশত বৎসর ধরিয়া কলির এক একটি সন্ধ্যা। এরূপ চারিটি সন্ধ্যা চলিয়া গিয়াছে। এখন পঞ্চম সন্ধ্যা।'

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় 'সন্ধ্যা' কেন বের করেছিলেন, এ কথা উল্লেখ করেছেন, প্রবোধচন্দ্র সিংহ[২৮]। কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হলো ঃ

'এই পত্রিকায় কোন নূতন কথা বলিবার স্পর্দ্ধা আমরা রাখিব না। আমাদের অগ্রজদিগের নিকট যাহা শিখিয়াছি, তাহাই কেবল নূতন আকারে প্রকাশ করিব। তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি।

এই সকল বিষয়ে ভূষিত হইয়া জনসমাজের মধ্যে প্রচারিত হইতে লাগিল। দিনের পর দিন সন্ধ্যার গুণগরিমা চারিদিকে বিস্তারিত হইতে লাগিল।'

'সন্ধ্যা' প্রথম সংখ্যা থেকে সাধারণ মানুষ অতি প্রিয় সংবাদপত্র রূপে গ্রহণ করেছিল। সাধারণ মানুষ ছিল 'সন্ধ্যা'র গ্রাহক। আগে যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের লেখা উল্লেখ করা হয়েছে। 'সন্ধ্যা'র ভাষা প্রসঙ্গে প্রবোধ চন্দ্র সিংহ[২৯] লিখেছেন ঃ

'......সন্ধ্যার সেই আদিম গুরু গম্ভীর ভাষা পরিত্যাগ করিয়া আপামর সাধারণের হৃদয়গ্রাহী গ্রাম্যভাষা, রূপকথা, অপভাষা ও হেঁয়ালী প্রভৃতি দ্বারা এমন এক অদ্ভুত ভাষার সৃষ্টি করিলেন, যাহা বঙ্গভাষায় অপূর্ব্ব এবং

অতুলনীয়। এমন এক ভাষায় সৃষ্টি করিলেন যাহা জনসাধারণের অতীব আদরের বস্তু হইয়া দাঁড়াইল।

এই ভাষা পাঠ করিয়া দোকানের দোকানি-পশারী, জমিদারের সরকার, গোমস্তা, পাঠশালার গুরুশিষ্য, রাস্তার মুটে, গাড়োয়ান সকলেই হাসিত কাঁদিত। জমিদার, গৃহস্থ, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, নরনারী, বালকবালিকা, যুবকবৃদ্ধ সকলেই কখন আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িত, কখন বা ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিত। কখন সন্ধ্যা আসিবে, আজ সন্ধ্যায় কি লিখিয়াছে, এই জানিবার জন্য সকলেই ব্যাকুল হইয়া থাকিত।'

নির্ভীকতায়, তেজস্বীতায় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ছিলেন এক অসাধারণ পুরুষ সিংহ। বৈচিত্র্যময় তাঁর জীবন। যে পথ যখন তাঁর ভাল বলে মনে হতো, সেই মুহূর্তে তিনি সেই পথ গ্রহণ করতেন,—অকপট চিত্তে সেই পথে চলতেন। সামাজিক সুখ্যাতি বা অখ্যাতির দিকে তাঁর কোন দিনই লক্ষ্য ছিল না। অপরের মন রেখে তিনি কোন দিন চলেন নি। ব্রহ্মবান্ধবের স্বদেশপ্রেম ছিল প্রগাঢ় অনুপম। দেশবাসীকে জাতীয় ভাব প্রচারের জন্য কেবল বলতেন: 'গণ্ডীভ্রষ্ট হইও না। নিজেদের সর্বস্বের প্রতি মমতাযুক্ত হও। যে শক্তি আজ সুষুপ্ত, তাহাই মধ্যাহ্ন সূর্য্যের মত উদ্ভাসিত হইয়া সর্ব দুর্গতি মোচন করিবে। কিন্তু পরমুখী হইলেই সর্বনাশ।'

তিনি স্পষ্টই বলতেন: 'দেশের লোকেরা যাহাতে ঘর ছাড়িয়া পরকে আপন না করে, তাহার জন্য আয়োজন করা চাই। আমার দেশ, আমার বাড়ী, আমার ঘর, আমার জাতি, আমার ধর্ম্ম—যা কিছু, আমার ভাল-মন্দ, সুশ্রী-বিশ্রী সমস্তকে ভালবাসিতে হইবে।'

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রসঙ্গে প্রবোধচন্দ্র সিংহ[৩০] লিখেছেন:

'অন্যায় ও অসত্য দেখিলে তিনি শত্রুমিত্র বিচার করিতেন না। অকপট চিত্তে ঘোষণা করিয়া তাহাদের অন্তঃস্থলে আঘাত করিতেন। এই অকপট সত্যবাদিতা ও তেজস্বিতার ফলে তিনি সমাজের মধ্যে অনেকের নিকট—বিশেষতঃ ন্যায়নিষ্ঠ ইংরেজের চক্ষে বিরাগভাজন হইয়াছেন।'

ব্রহ্মবান্ধব ছিলেন সত্য ও স্বাধীনতার উপাসক। দেশবাসীকে আত্মনিষ্ঠ ও আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে বারে বারে বলতেন।

বেশ মনে আছে, ১৯৬০ সালে ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ বসুর উত্তর কলকাতার বাসভবনে গিয়েছিলাম। ওই সময় অমরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের পিতা অতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সঙ্গেও কথা বলার সুযোগ আমার হয়েছিল। অতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সঙ্গে ব্রহ্মবান্ধবের মিত্রতা ছিল নিবিড়।

অমরেন্দ্রনাথ বসু ব্রহ্মবান্ধবের সময়ের একটি ছোট্ট ঘটনার কথা উল্লেখ

করেন ঃ সেকালে কলকাতায় ছেলে ধরার একটা গুজব উঠল। ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে চুরি করে তাদের বিকলাঙ্গ করার কাহিনী লোকের মুখে মুখে ঘুরতে থাকে। এই কারণে উত্তর কলকাতার কোন এক পাড়ায় যুবকেরা ছেলে ধরার দল সন্দেহ করে একটি ঘোড়ার গাড়ি আটক করে। উন্মত্ত জনতা সেই বগীগাড়ি ভেঙে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। দেশের যুব সমাজের ওপর ব্রহ্মবান্ধবের বিরাট প্রতিপত্তি ছিল। সেকালে বিভিন্ন ব্যায়াম সমিতির মাধ্যমে বিপ্লবীরা স্বদেশী ভাবধারা এবং বিপ্লবের বাণী প্রচার করতেন। ব্রহ্মবান্ধব নির্দেশ দিলেন, ইংরেজ সরকারের পুলিসের ওপর নির্ভর করে থাকা উচিত নয়। অবিচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য প্রতি পল্লীতে একটি করে স্বদেশী থানা গড়ে তোলা দরকার। স্বদেশী থানা গঠন করে প্রকারান্তরে ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য বিভিন্ন স্থানে সংগঠন ও লড়াইয়ের ঘাঁটি প্রস্তুত করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। এই ঘটনা থেকে জানা যায়, তাঁর বিপ্লবী চিন্তাধারা ও সংগঠন গড়ে তোলাব কর্মক্ষমতার কথা।

সুকুমার দত্ত[৩১] সম্পাদিত একটি হুগলী জেলা বার্ষিকী পত্রিকায় উপাধ্যায় সম্পর্কে অধ্যাপক বিনয় সরকার যা' বলেছিলেন তা' ছাপা হয়েছিল।

এখানে সেই লেখা উদ্ধৃত হলো ঃ

'ঐ প্রথম দেখলাম। গেরুয়া-পরা লোক। পায়ে ছিল না জুতো। কাছা খোলা সাধুর চেহারা। গায়ে জামা নাই, গেরুয়া চাদর। এই মূর্তিতে আমি একটা নয়া দুনিয়ার খবর পেলাম। তখনো আমি বিবেকানন্দী দলের কোন স্বামীজীকে দেখিনি। সতীশবাবু ফকির বটে, কিন্তু তাঁর কাপড়-চোপড়ে সাধুয়ানি ছিল না। ব্রহ্মবান্ধবই আমার অভিজ্ঞতায় সর্বপ্রথম আধুনিক বাঙ্গালী সন্ন্যাসী। কাজেই আমি তাঁর হাব-ভাবে বিশেষ প্রভাবান্বিত হয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, ব্রহ্মবান্ধব সতীশ বাবুর পরবর্তী ধাপ। অনুকরণ যোগ্যও বটে। তাঁর চোখের আর হাঁটার ভঙ্গী দেখে মনে হয়েছিল যে, লোকটা চব্বিশ-ঘণ্টা দুনিয়াকে কলা দেখাচ্ছে। মানুষের মতন মনুষ।'

ব্রহ্মবান্ধব ১৩১৩ সালের ফাল্গুন মাসে 'স্বরাজ' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র এবং কিছুদিন পরে 'করালী' নামে আর একখানি অর্দ্ধসাপ্তাহিক পত্র 'সন্ধ্যা' অফিস থেকে বের করেছিলেন।

বিপিনচন্দ্র পাল[৩২] ব্রহ্মবান্ধব সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ

'আমাদের বর্তমান স্বাদেশিকতার আদর্শ কতটা পরিমাণে যে আমরা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি, দেশের লোকে যেন সে কথা ক্রমে ভুলিয়া যাইতেছে। নতুবা এত লোকের স্মৃতিকে জাগাইয়া রাখিবার জন্য কত চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু উপাধ্যায় মহাশয়ের নামে একটা বাৎসরিক স্মৃতি-সভার আয়োজন পর্যন্ত হয় না কেন ?

বিপিনচন্দ্র পাল[৩৩] ব্রহ্মবান্ধব সম্বন্ধে আরও লিখেছেন ঃ

'উপাধ্যায়ের মধ্যে একটা প্রকৃত শ্রদ্ধার ভাব ছিল, এ কথাটা সকলে জানেন না ও বোঝেন না। "সন্ধ্যা"-পত্রিকার সম্পাদক বলিয়াই বাঙ্গালী সমাজে উপাধ্যায় বিশেষ ভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। আর "সন্ধ্যাতে" প্রায়ই সমাজের বিশেষ নব্যশিক্ষাভিমানী সম্প্রদায়ের, কোন কোন শ্রেষ্ঠজন সম্বন্ধে এরূপ কঠোর, তীব্র কখনও বা গভীর বিদ্রূপাত্মক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত যে এগুলি পড়িয়া অপরিচিত লোকে কোন প্রকারে সম্পাদককে একজন শ্রদ্ধাশীল লোক বলিয়া কল্পনা করিতে পারিত না। কিন্তু উপাধ্যায়কে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে জানিতেন, তাঁহারা তাঁহার কথাবার্তায় কখনও প্রকৃত শ্রদ্ধাশীলতার অভাব দেখিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

পল্লীর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য, পল্লীবাসীর কাহাকেও না কাহাকেও তার আবর্জনারাশি পরিষ্কার করা অত্যাবশ্যক হয়। এ অত্যাবশ্যকীয় কর্ম্ম যে করিতে যাইবে, তার হাতে ও গায়ে কিছু ময়লাও লাগিবেই লাগিবে। কিন্তু দশের হিতের জন্য এ কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে বলিয়া সে ব্যক্তি যে স্বভাবতঃ আবর্জনা ভালবাসে, এমন কথা যেমন বলা সঙ্গত হয় না, সেইরূপে সময় বিশেষে সমাজের নৈতিক বা রাষ্ট্রীয় আবর্জনা পরিষ্কার করা প্রয়োজন হইলে, সমাজের শ্রেষ্ঠজনকেও সর্ব্বসমক্ষে অপদস্থ করা আবশ্যক হইতে পারে। আর সে অবস্থায়, সে অপ্রীতিকর কর্ম্ম যদি কেহ করে, তাহাতে তাহাকে স্বল্প বিস্তর হীনতাও স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাই বলিয়া সেই নির্ব্বিকার-চিত্ত দেশসেবককে হীন চরিত্রের লোক বলিয়া মনে করা কখনই সঙ্গত হয় না। উপাধ্যায় সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। "সন্ধ্যা" পত্রিকায় সমাজের কোন কোন শ্রেষ্ঠজনকে যখন তখন তীব্রভাবে আক্রমণ করা হইত বলিয়া সম্পাদকের প্রকৃতিতে যে একটা স্বাভাবিকী শ্রদ্ধাশীলতা ছিল না, সরাসরিভাবে এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না।'

ব্রহ্মবান্ধব মাতৃভূমির সেবার যে মহাব্রত গ্রহণ করেছিলেন তাহা অতুলনীয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁহার নাম চিরদিনের জন্য লেখা থাকবে। তিনি ছিলেন বিদ্রোহী সেনানায়ক। বারে বারে দলগঠন করেছিলেন। কিন্তু সেনাবাহিনীর কে তাঁকে অনুসরণ করল কি করল না, সে জন্য কোন দিন তাকিয়ে দেখেননি। তিনি চিরকাল একাকী নিজের মত ও পথ ধরে চলতেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯০৬ সালে আগষ্ট মাসে "সন্ধ্যা" অফিস কলিকাতায় ২৩নং শিবনারায়ণ দাসের লেনে ছিল।

সেকালের *The Englishman*[৩৪] কাগজে সন্ধ্যার মামলার সংবাদ ছাপা হয়েছিল। উক্ত সংবাদের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হলো ঃ

'Sandhya' Sedition Prosecution

Statement by the Editor.

Yesterday Mr. D. H. Kingsford, Chief Presidency Magistrate, took up the case in which Brahma Bandhab Upadhya, Saroda Churan Sen and Hari Churan Das, said to be the editor, Manager and printer, respectively, of the 'Sandha' a daily vernacular newspaper, are charged under Section 124A of the I.P.C., with publishing certain alleged seditious articles.

Mr. Hume, Public Prosecutor and Babu Tarak Nath Sadu appeared for the Crown. Mr. C. R. Dass defended the first accused, Mr. J. N. Roy, the Second accused, and Mr. A. K. Ghose the third accused.'

শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়[৩৫] বিপিনচন্দ্র পালের জীবনী আলোচনাকালে লিখেছেন ঃ

'এই মত পরিবর্তন সম্পর্কে বিপিনচন্দ্রের আর একটি প্রধান যুক্তি ছিল যে, সন্ত্রাসবাদী কর্মপন্থা গ্রহণের ফলে শাসকদের মনোভাব কঠোরতার মাত্রাই কেবল বৃদ্ধি পায়।

"সন্ধ্যা", "বন্দেমাতরম", "নবশক্তি" প্রভৃতি পত্রিকা একের পর এক সরকারী রোষ দৃষ্টিতে পড়ে বন্ধ হয়ে যায়। অনুশীলন সমিতি এবং অনুরূপ অন্যান্য সংস্থা বে-আইনি ঘোষিত হয়; সরকারি আইন সংস্কার করে বিপ্লবী রাজনৈতিক নেতাদের কারারুদ্ধ করেন (১৯০৮); অতঃপর মর্লে-মিণ্টো শাসন ব্যবস্থা (১৯০৯) প্রবর্তিত হয়।'

আগে 'যুগান্তর' এবং 'সন্ধ্যা' প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। সেকালে মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'নবশক্তি' ছিল চরমপন্থীদের মুখপত্র। ১৯০৭ সালে কলকাতা থেকে 'সোনার বাংলা' নামক একটি সাময়িক পত্র পুলিশের দৃষ্টিতে পড়ে। সম্পাদককে আদালতে দাঁড়াতে হয়। উক্ত কাগজের সম্পাদকের নাম বাসুদেব ভট্টাচার্য। ইনি সরকারী ডিক্লারেশন না নিয়ে কাগজ বের করেছিলেন।

S. Natarajan[৩৬] লিখিত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঃ

'The Sedition Committee Report (1919) following soon on the publication of the Montagu-Chelmsford threw out a spark which rapidly kindled into a nation-wide fire. The committee which was presided over by Mr. Justice Rowlatt, recommended strengthening the executive. It was the general Indian opinion that the recommendations would deprive Indians of their fundamental rights. Nevertheless legislation was passed im-

plementing the recommendations, and Gandhi undertook a Satyagraha campaign to protest against the laws. The agitation was to take the form of reading publicly, copying and distributing proscribed Literature openly, and courting punishment.'

সেকালে বিপ্লবীদের একটি প্রিয় সাময়িক পত্রের নাম ঃ 'বিজলী'। ১৯১১ সাল থেকে বেশ কয়েক বছর এই কাগজের সঙ্গে সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় জড়িত ছিলেন। তিনি ছিলেন সম্পাদক। কার্যালয় ছিল ঃ ১৪/এ, শরৎ ঘোষ স্ট্রীট, ইণ্টালী, কলকাতা। কাগজ ছিল সাপ্তাহিক।

বিজলী পত্রিকা প্রকাশ করার উদ্দেশ্য একটি সংখ্যায় বলা হয়েছিল। বিজলী[৩৭] পত্রিকার ওই সংখ্যা থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হলো ঃ

'নিবেদন

বিজলীর কর্ম্মভার গ্রহণ করিবার আগে মনে পড়ে আজ ৪ বৎসর আগেকার কথা। দ্বীপান্তর প্রত্যাগত বারীন্দ্র, উপেন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গে কোনও এক মহানুযোগে আমার পরিচয় হয়। দেশের সত্যকার অবস্থা, সমাজের দুর্দ্দশা, শাসক ও শোষক সম্প্রদায়ের অত্যাচার, বাঙালী জীবনের দুর্নীতি ও কলঙ্ক, জাতীয় চরিত্রের দুর্ব্বলতা—এক কথায় জাতীয় জীবনের মধ্যে ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতির সমস্যাগুলি কি প্রকারে দেশের সর্ব্বসাধারণকে বুঝান যায়, এই লইয়া তখন ইঁহাদের মধ্যে খুব জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। এই সমস্ত চিন্তার মধ্যে বারীন্দ্রকুমার তাঁহার স্বভাব সিদ্ধ তেজের সহিত বলিলেন—"এই পচা গলা সমাজটার গতিবিধি না করিতে পারিলে 'দেশ' 'দেশ' বলে চীৎকার করিলে কিছুই হবে না।"

তদানীন্তন সাময়িক পত্রের ভাষা অর্দ্ধশিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত বা যৎসামান্য লেখাপড়া জানা লোকের পক্ষে বিশেষ বোধগম্য নয়. এই বিবেচনায় বারীন্দ্রকুমার স্থির করিলেন যে অতি সহজ ও সরল ভাষায় বাঙালীর জাতীয় সমস্যাগুলি একে একে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে হইবে এবং শুধু বক্তৃতায় নয়, কাজে এই সব সমস্যার নিরসন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য লইয়াই বিজলী'র সৃষ্টি হইয়াছিল।

ওই সংখ্যায় সহঃ-সম্পাদক হিসাবে সুবোধ রায়ের নাম প্রকাশিত হয়েছিল। তা' ছাড়া চীন-জাপান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ বক্তৃতা, নজরুল ইসলামের 'মোহ-অন্তের গান' ছাপা হয়েছিল। নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন ঃ

জাগো, আজ বঙ্গবাসী / মজাল পাপ-চণ্ডাল তোদের বাঙ্গালা / দেশের কাশী। / জাগো বঙ্গবাসী। / (তোরা) হত্যা দিতিস যাঁর থানে / আজ সেই

দেবতা কেঁদে / তোদের দ্বারে হত্যা দিয়ে মাগেন সহায় / আপনি আসি' / জাগো বঙ্গবাসী ! / মোহের যার নাইক অন্ত / পূজারী সেই মোহান্ত / জাতী ধর্ম্মের সর্ব্বস্বান্ত / করছে বেদীমূলে / (তোদের) পূজার প্রসাদ বলে / খাওয়ায় পাপের কলুষ গুলে, / তীর্থে গিয়ে দেখে আসিস্ / পাপ-ব্যাভিচার রাশি রাশি / জাগো বঙ্গবাসী ! / ধর্ম্মের ব্যবসাদারী, / চালায় সব এই ব্যাপারী / জমাচ্ছে হাঁড়ি হাঁড়ি / টাকার কাঁড়ি ঘরে। / (ওরে) ছাই মেখে দে ভিখারি / শিব বেড়ান ভিক্ষা করে, / তাঁর পূজারী দিনের দিন / হ'চ্ছে খোদার খাসী। / জাগো বঙ্গবাসী ! / এই সব ধর্ম্মঘাগী / দেবতায় করছে দাগী / মুখে কয় সর্ব্বত্যাগী / ভোগ নরকে বসে। / (ওসে) পাপের ঘণ্টা বাজায় পাপী / দেব-দেউলে প'শে / (তোরা) ভক্ত হ'য়ে পূজিস তারে / জোগাস খোরাক সেবাদাসী / জাগো বঙ্গবাসী। / দিয়ে নিজ রক্ত বিন্দু, / ভরালি পাপের সিন্ধু, / ডুবুলি তায় ডুবলি হিন্দু / ডুবালি দেবতারে / (চেয়ে দেখ) ভোগের বিষ্ঠা পড়ছে / তোদের বেদীর ধূপাধারে / পূজারীর কমণ্ডলুর / গঙ্গাজলে মদের ফেনা উঠ্‌ছে ভাসি / জাগো বঙ্গবাসী। / দিতে এসে পূজারতি / সতীত্ব হারায় সতী, / পুণ্য খাতায় ক্ষতি / লেখায় ভক্তি দিয়ে / (ও) তার ফাঁকা ভক্তির ভণ্ডামিতে / মহাদেব আজ ঘোড়ার ঘাসী। / জাগো বঙ্গবাসী ! / তোরা সব ভক্তিশালী / (তোরা সব শক্তিশালী) বুকে নয় মুখে খালি, / বেড়ালকে বাছতে দিলি / মাছের কাঁটা ঘেরে, / (তোরা) পূজারীকে পূজা করিস্ / পূজার ঠাকুর ছেড়ে। / (ওই দেখ) অত্যাচারের বুকের পরে / দাঁড়িয়ে হাসে সর্ব্বনাশী / জাগো বঙ্গবাসী।

সেকালে তারকেশ্বরের মোহন্তের দ্বারা নানা অনাচার চলছিল। অনাচার বন্ধ করার জন্য এবং মোহন্তকে অপসারিত করার জন্য তারকেশ্বরে আন্দোলন হয়েছিল। সেদিন এই তীর্থস্থানের অনাচার বন্ধ করার জন্য সত্যাগ্রহ শুরু হয়েছিল। দলে দলে দেশপ্রেমিক যুবকেরা সেদিন বাংলা-দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এসে তারকেশ্বরের সত্যাগ্রহে যোগদান করে-ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানের সৎ ও নির্ভীক দেশপ্রেমিকরা এই আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন। অনেকে এই আন্দোলনকে সফল করার জন্য সেদিন বাংলায় ছুটে এসে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন।

বিজলী[৩৮] পত্রিকায় 'বৈঠকী' কলমে লেখা হয়েছিল ঃ

'বর্তমানে কংগ্রেস কর্তৃক তারকেশ্বর মন্দিরের ব্যবস্থা বিষয়ে বসুমতীতে আলোচনা প্রসঙ্গে তর্করত্ন মহাশয় বলেছেন যে, মন্দিরে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতির পূজাদির ভিন্ন ব্যবস্থা আগেও যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে। এতে তিনি খুবই সন্তুষ্ট! ব্রাহ্মণসভার সভাপতি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে যারা সত্যাগ্রহ করে জেলে যাচ্ছে তারা কি সবাই কুলীন

ব্রাহ্মণতনয় ? মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষার জন্য জেলে যাবার বেলায় সব জাতির পক্ষেই সমান ব্যবস্থা আর মন্দির প্রবেশ ব্রাহ্মণেরই অধিকার !

সাধে কি আর কান্তকবি গেয়েছেন—

এখনও গলায় ঝুলায়ে রেখেছি / এমন ধোলাই করা পৈতে, / তোমরা মোদের সম্মান করিবে / সে কথা আবার কইতে ?'

বিজলী[৩৯] কাগজে নজরুল ইসলাম লিখিত কবিতা 'নাগমাতা' ছাপা হয়েছিল। এই সংখ্যায় ৭৮৩ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছিল একটি সংবাদ। সংবাদটি হলো এই ঃ

'অগ্নি-বীণা, দোলন চাঁপার কবি নজরুল ইসলামের "বিষের বাঁশী" বাহির হইল। ইহাতে আছে কবির বিষ জ্বালাময় রুদ্র-দীপক তানের সমস্ত গান।'

বিজলী[৪০] কাগজে পৃষ্ঠা ৭৯৮, বৈঠকী কলমে লেখা হয়েছিল ঃ

'তারকেশ্বরে অনাচার হচ্ছে এই কথা স্টেটস্‌ম্যান খুব বড় গলায় শনিবার প্রচার করেছিলেন। তাঁর কথায় নির্ভর করে তাঁরা উল্লসিত হয়েছিলেন সেই 'তেজ' পত্রিকার পরমাত্মা শর্ম্মা রবিবারে স্টেট্‌সম্যানে প্রতিবাদ করে লিখেছেন যে ওসব আমি কিছুই লিখিনি। "গোলমালের" সম্পাদক এক রকম জিনিষ আমাকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়ে আর এক রকম জিনিষ কাগজে ছাপিয়ে দিয়েছেন। শর্ম্মা মহাশয়ের বোঝা উচিত ছিল যে "গোলমালের" সম্পাদক যিনি, গোলমাল করাই তাঁর একমাত্র কর্তব্য।'

বিজলী[৪১] কাগজে 'বৈঠকী' কলমে ছাপা হয়েছিল ঃ

'লাট সাহেব বলেছেন বেঙ্গল কাউন্সিলের আগামী অধিবেশনে মন্ত্রীর বেতনের জন্য যাঁরা ভোট দেবেন তাঁদের মধ্যে থেকেই তৃতীয় মন্ত্রী নির্বাচিত হবে। টোপ একটি কিন্তু সরকারী পুকুরে রুই-কাৎলার তো অভাব নেই! এখন যাঁর পূর্বজন্মের সুকৃতি আছে তিনিই টোপটি গিলতে পারেন।'

ওই সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সংবাদপত্রের ওপর ইংরেজ সরকারের আক্রমণ চলছিল। ওই আক্রমণে "কেশরী" পত্রিকাও পড়েছিল। "কেশরী" পত্রিকার সংবাদ ছাপা হয়েছিল তৎকালীন "বিজলী" পত্রিকায়। সংবাদটি বিজলী[৪২] পত্রিকা থেকে এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

'কেশরী পত্রিকায় বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারের বিরুদ্ধে একটা প্রবন্ধ লেখার জন্য এন. সি. কেলকর মহোদয়ের পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা হয়েছে।'

সেকালের বিজলী[৪৩] পত্রিকায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সংবাদ, বিপ্লবীদের কথা প্রকাশিত হতো। তিনটি সংবাদ এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

(১)

'পুলিশ রিপোর্টে প্রকাশ, কলিকাতা এবং সহরতলীতে ৩১ খানা দৈনিক পত্র, ৩ খানা অর্দ্ধ সাপ্তাহিক, ৭০ খানা সাপ্তাহিক, ১৫ খানা পাক্ষিক, ১৭৭ খানা মাসিক, ২৭ খানা ত্রৈমাসিক, ৩ খানা দ্বিমাসিক, ১ খানা ষাণ্মাসিক, ৩ খানা বার্ষিক পত্র প্রকাশিত হয়। কলিকাতা এবং সহরতলীতে মোট ৬ শত ছাপাখানা আছে।'

(২)

'১৮১৮ সালের ৩ রেগুলেশনের রাজবন্দী মনোমোহন ভট্টাচার্য্যের অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশন করা হয়েছে। তিনি এখন শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে আছেন।'

(৩)

'ভবেশচন্দ্র রায় নামে যে বাঙ্গালী যুবকটি মির্জাপুর স্ট্রীটে পিস্তল সহ গ্রেপ্তার হয়েছিল তার দু বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে।'

বিজলী[৪৪] পত্রিকায় শৈলেশনাথ বিশী লিখিত 'বোলশেভিকবাদ' গ্রন্থের সমালোচনা ছাপা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, বোলশেভিকবাদ গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছিলেন—নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

বিজলী[৪৫] পত্রিকায় প্রকাশিত একটি লেখায়, সেকালের বিপ্লবীদের মনের কথা প্রকাশ পেয়েছিল। লেখাটি হলো এই ঃ

'বাঙ্গলার বিপ্লবপন্থীদের অস্তিত্ব যিনি অকপটভাবে স্বীকার করেছেন, ১৯০৫ সাল থেকে এ পর্য্যন্ত যে বিপ্লববাদীর দল মরিয়াও মরে নাই—স্বরাজদল বা পরিবর্তন বিরোধী যে কোনও দলের প্রতি তাদের কতটুকু আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে তা আমাদের সঠিক জানা নেই; তবে অশেষ নির্য্যাতন ও অবমাননার পর আজ ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে তারা যে রাজসরকারের দিকে চেয়ে আছে এ কথা অস্বীকার করার উপায় নাই। তাদের আয়োজন ব্যর্থ হয়েছে কি সার্থক হয়েছে সে বিচার করতেও আমরা চাই না; তবে একটা কথা আমাদের আজ মনে হয় যে এই ক্ষুব্ধ অসন্তুষ্ট দুঃসাহসিকের দল একদিকে মহাত্মা গান্ধী, অন্যদিকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে দেশযজ্ঞের নেতৃত্ব করতে দেখে সম্ভ্রমে নিস্তব্ধ হয়ে আছে; কিন্তু যখনই তারা দেখবে যে এই দুই মহাজনের সমস্ত প্রচেষ্টা বিফল হয়ে গেল তখনই তারা তাদের রুদ্ধ প্রচণ্ড শক্তিকে আবার ভীষণভাবে জাগিয়ে ভারতবর্ষে আবার দুর্য্যোগ সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে।'

বিজলী[৪৬] পত্রিকায় আর একটি লেখায় বলা হয়েছিল ঃ

'ভারতবর্ষের যা দাবী, তা সহযোগী, অসহযোগী এবং স্বরাজী সকলেই ত একবাক্যে প্রচার করছেন। দলের বিভিন্ন মত ও কর্ম্মপদ্ধতিকে ছাড়িয়া সমগ্র দেশের অন্তর থেকে আজ স্বাধীনতার দাবী অকুতোভয়ে আত্মপ্রকাশ

করেছে। নিত্য নূতন আইনের নাগপাশে আজ অদম্য ইচ্ছাকে বেঁধে রাখা চলবে না।'

বিজলী[৪৭] পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছিল একটি কবিতা—'নূতন বোধন'। কবিতাটি হলো এই ঃ

আবার আজি মা বোধন তোমার / আবার সাজাব মঙ্গল ঘট, / জাগো দেশ-চণ্ডী জাগো মা আমার, / আবার পূজিব চরণ-তট। / নরমুণ্ডময়ী অশিবা মূরতি / সেই সে আমার দখিনা কালী, / তুচ্ছ এ শির,......দিয়া / এবার মায়ের সাজাব ডালি। / পশুর মুণ্ডে পশুর দেবতা / পশু মানবেতে পূজন করে, / এ মহা পূজার মানব অঙ্গে / বলি দিয়া দেব অঙ্গ ধরে।

এই সময় বিজলীর সম্পাদক ছিলেন—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, কাগজের দাম ছিল তিন পয়সা। প্রকাশিত হতো ৯৩।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলকাতা থেকে।

বিজলী[৪৮] পত্রিকায় বিপ্লবীদের কথা প্রসঙ্গে একটি লেখা (বোমার আবির্ভাব ও তিরোভাব) ছাপা হয়েছিল। সেই লেখাটি এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

'দেশে বোমা কেন এসেছিল, আর কেনই বা চলে গেল সেই পুরানো কথা নিয়ে এতদিন পরে আবার সরগরম হতে আরম্ভ হয়েছে। বোমা এনেছিল বিপ্লবীরা একথা সবাই জানেন। কিন্তু কেন? বোমা মেরে জন-কয়েক রাজকর্মচারীর মাথা উড়িয়ে দিলেই কি দেশ স্বাধীন হবে? না, এ ভুল ধারণা বিপ্লবীদের কস্মিনকালেও ছিল না। "যুগান্তর" সংঘের নেতা বারীন্দ্রকুমার ১৯০৮ সালে আদালতে এ কথা বেশ স্পষ্ট করেই বলেছিলেন ঃ

'বোমা মেরেই যে দেশ উদ্ধার হবে এ দুরাশা আমরা করিনি। তবে দেশের লোকে এক তরফা মার খেয়ে খেয়ে একেবারে নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছিল বলেই তাদের মনটা চাঙ্গা করবার জন্যে বোমার আবিষ্কার। দেশব্যাপী বিপ্লবের যে আয়োজন চলছিল, বোমাটা তারি একটা অঙ্গমাত্র। বোমাই বিপ্লবের সর্বস্ব নয়। বিপ্লববাদ দেশে থাকলেই যে বোমার রূপ ধরে তা সব সময় আত্মপ্রকাশ করবে, এ কথার কোন মানে নেই। বোমার কতটুকু কাজ হতে পারে বা না হতে পারে তা ১৯০৭ সাল থেকে ১৯১৭ পর্য্যন্ত পরীক্ষা হয়ে গেছে। এ কয় বছর ধস্তাধস্তির ফল হয়েছে এই যে এখন স্বাধীনতার কথা সকল লোকেরই মুখে। সকলেরই ভয় অল্প বিস্তর ভেঙ্গে গেছে। দেশব্যাপী অত্যাচার সত্ত্বেও লোকের মন দমে যাচ্ছে না। আর ভবিষ্যতে দমবারও কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বোমা যে জন্য এসেছিল সে কাজ হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে, বোমারও তিরোভাব হয়েছে। দেশের যে কতখানি পরিবর্তন হয়েছে সব বোঝা যায়, যখন দেখি কুলি-মজুরেরা পর্য্যন্ত স্বরাজের আলোচনা করতে আরম্ভ করছে। এমন কি পুলিসের

কর্মচারীরা পর্য্যন্ত পেন্সনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে স্বাধীনতার বার্তা ঘোষণা করছেন।

কিন্তু বিপ্লববাদীরা কোথায় গেলেন? তাঁদের কোন সাড়াশব্দ নেই কেন? রিফর্ম বিলের শান্তিজল মাথায় পড়ায় তাঁরা শান্ত হয়ে গেছেন, এই অনুমান করে কেউ কেউ তাঁদের গায়ে খানিকটা বীররস উদ্গার করে দিয়ে থাকেন। বাংলাদেশে বিপ্লববাদীর সংখ্যা কত তা আমরা জানিনে। গত যুদ্ধের সময় প্রায় দেড় হাজার যুবককে বিপ্লববাদী বলে সন্দেহ করে অন্তরীণে রাখা হয়েছিল। তাঁরা কি আশা করেন যে বিপ্লববাদীরা সবাই মিলে গোলদীঘির ধারে জমায়েত হয়ে বক্তৃতা দেবেন যে তাঁদের মত বদলায়নি, না খানকতক তলোয়ার আর গোটাকতক বন্দুক নিয়ে তারা পুলিশ সার্জেন্ট-দের সঙ্গে যুদ্ধ-ঘোষণা করে দেবেন? দেড় হাজার যুবক প্রাণ দিলেও যে দেশ স্বাধীন হয় না এ কথাটা তাঁরা বেশই জানেন। দেশের অধিকাংশ লোক যতদিন না স্বাধীনতা লাভ করবার জন্যে মরতে প্রস্তুত হয় ততদিন স্বাধীনতা লাভ যে দুঃসাধ্য এ অভিজ্ঞতা তাঁদের হয়েছে। স্বাধীনতার নাম শুনলে যখন দেশের লোক চমকে উঠতো তখন বিপ্লববাদীরা নির্ভীক চিত্তে স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করেছিলেন, দেশের লোক যখন অত্যাচারের ভয়ে স্বদেশী আন্দোলন ছেড়ে দিচ্ছিল, তখন নিজেদের মাথা লুটিয়ে দিয়ে বিপ্লববাদীরা দেশের ভয় ভাঙ্গাবার চেষ্টা করেছিলেন। দেশের লোক আজ তাঁদের কার্য্যপ্রণালী মেনে না নিলেও তাঁদের আদর্শ মেনে নিয়েছে। নিতান্ত পচা মডারেট ছাড়া এমন সকলেই দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা চান।

মতভেদ আছে উপায় নিয়ে। দেশের অধিকাংশ লোকেরই এমন মত যে মহাত্মা গান্ধীর মতানুসারে অসহযোগ নীতি অবলম্বন করলে স্বাধীনতা লাভ হতে পারে, অন্ততঃ হয় কি না হয় তা একবার দেখা উচিত। দেশের লোকের মতের, বিরুদ্ধাচরণ করে কখনো বিপ্লববাদীরা কৃতকার্য্য হতে পারে না। এ অবস্থায় বিপ্লববাদের কোন রকম বহিঃপ্রকাশ যদি দেখা না যায় ত তা থেকে কি একথা বলা চলে যে বিপ্লববাদীরা সুখের পরাধীনতা স্বীকার করে নিয়েছেন? বোমা বিপ্লববাদীদের অস্ত্র মাত্র, বিপ্লব স্বাধীনতা লাভের একটি উপায় মাত্র। এ কথাগুলি ভুলে যাঁরা যান, তাঁরাই তালে, ঘোলে, অম্বলে একাকার করে বসে থাকেন।'

বিজলী[৪৯] পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছিল প্রিয়ম্বদা দেবী লিখিত 'সঙ্কল্প' কবিতা। কবিতাটি হলো এই:

ফিরে আমি যাবনাত আর, / আর আমি করিব না শোক, / চন্দ্র-চূড়ে দেখেছি তোমার / ধারা ঝরে অমৃত আলোক! / সুদূর এ মাঠের উপরে, / প্রভু তব সিংহদ্বার হতে / আহ্বান আসিছে শঙ্খ স্বরে, / হারাব না পথ কোন মতে।

ওই সময় বিজলী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

বিজলী[৫০] পত্রিকা লিখেছিলেন—বর্ধমানের রাজার কথা। লেখাটি এখানে তুলে ধরা হলো ঃ

'সবার উপরে টেক্কা দিয়েছেন আমাদের বর্দ্ধমানাধিপ বিজয়চন্দ্র মহাতাপ বাহাদুর। তিনি বলেন—রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তির প্রস্তাব তোলাই সঙ্গত হয়নি। তার একটি কারণ এই যে, খোদ লাট সাহেব বলেছেন, সরকার যে প্রমাণ পেয়েছেন তাতে তাদের মুক্তি দেওয়া সঙ্গত নয়।

পরকীয়া নইলে যে প্রেম হয় না। আহা, ভক্ত গৌরাঙ্গ দাস! অন্তিমে তোমার যেন শ্রীইংলণ্ড লাভ হয়।

তিনি আর একটি অকাট্য যুক্তি দেখাইয়াছেন যে, কয়দিন আগে একজন ইউরোপীয় আততায়ীর হস্তে নিহত হয়েছেন বলে। ইউরোপীয় সম্প্রদায় আইন ও শৃঙ্খলার কথা তুলেছেন। কাজেই এ রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তির প্রস্তাব গৃহীত হতে পারে না। প্রস্তাব গৃহীত হলেই বুঝতে হবে—বাংলা এখনো স্বায়ত্বশাসনের যোগ্যতালাভ করেনি।

মন্থরবেদী বর্দ্ধমানের ভূঁড়িতে যে এত বুদ্ধি ছিল তা আমরা এতদিন বুঝতেও পারিনি। দুর্ভাগ্য আমাদের।'

এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তখন বিজলী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন—নলিনীকান্ত সরকার। কাগজ ছাপা হতো Cherry Press Ltd., ৯৩।১এ বহুবাজার স্ট্রীট, কলকাতা থেকে।

বিজলী[৫১] পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল কবি কাজি নজরুলের সংবাদ। ওই সংবাদ এখানে উল্লেখ করা হলো।

'বহরমপুর সদর আদালতে সৈনিক কবি কাজি নজরুলের ৪২ ধারা মতে যে বিচার চলছিল, গত ৬ই ফেব্রুয়ারী তার রায় বের হয়েছে। কবি বেকসুর খালাস পেয়েছেন।

স্থানীয় বারের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত ব্রজভূষণ গুপ্ত মহাশয় বিনে পয়সায় কবির সমর্থন করে সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন।'

এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ওই সময় বিজলী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন নলিনীকান্ত সরকার। কাগজের দাম ছিল এক আনা।

বিজলী[৫২] পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল বিপ্লবী গোপীনাথ সাহার কথা। বিজলী থেকে এখানে উদ্ধৃত হলো ঃ

'গোপীনাথের বিদায় বাণী'

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী হাইকোর্টের সেসনে মিঃ ডের হত্যাপরাধে অভিযুক্ত গোপীনাথ সাহাকে বিচারপতি মিঃ পিয়ার্সন জিজ্ঞাসা করেন, তাহার কিছু বক্তব্য আছে কি? গোপীনাথ প্রত্যুত্তরে বলে,

"আজ আমার বড় শুভ দিন। মা তাঁর বক্ষে চির-বিশ্রামের জন্য

আমাকে ডাকছেন, তাই আমি যেতে চাই। আমি দেশের কাজে ভক্তিনম্রচিত্তে আপনাকে নিযুক্ত করবো বলেই মায়ের ডাকে আমি বাড়ী ছেড়েছিলাম। আমি মায়ের কাজে বাংলার নানান্ জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি। গত বৎসর খবরের কাগজ পড়ে, আমি জান্‌তে পারি যে, মিঃ টেগার্ট নামক একজন ইউরোপীয় ভদ্রলোক সমগ্র পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আন্দোলন সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তিনি আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম চেষ্টায় বাধা দিবার জন্য সম্প্রতি ভারতবর্ষে ফিরে এসেছেন। সেই সময় থেকেই আমি আমাদের এই স্বাধীনতার কণ্টক সম্বন্ধে চিন্তা করছিলাম। যখনই আমি এ সম্বন্ধে ভাবতাম, তখনই আমার মাথা গরম হয়ে উঠ্‌ত। ক্রমে আমার আহার নিদ্রা বন্ধ হয়ে উঠলো। আমি রাত্রিকালে ছাদে ঘুরে বেড়াতাম, আমার ঘুম পর্য্যন্ত হত না। যখন আমার এই রকম অবস্থা, তখন আমি মায়ের ডাক শুনতে পেলাম। মা যেন আমায় বলছেন,—

তার অনুসরণ কর।

সেই সময় থেকেই আমি মিঃ টেগার্ট সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করতে লাগলাম। ক্রমে আমি জানতে পারলাম—গত স্বদেশী আন্দোলনের যুগে যে কলিকাতা পুলিশের ডেপুটী কমিশনার ছিল। সেই সময় সে অনেক দেশভক্তের উপর অনেক রকম অত্যাচার করেছে। এমন কি, যাঁরা মায়ের সেবা করেনি, তাদের পর্য্যন্ত লাঞ্ছিত করেছে। লোকটা সময় সময় অমানুষিক অত্যাচার পর্য্যন্ত করত। সে অনেক লোককে বিনা বিচারে আটক করেছে। যাদের সঙ্গে রাজনীতির বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ নাই, এমন লোককেও সে আটক করবার ব্যবস্থা করেছিল। সেই সময় বালেশ্বরে পুলিশের সঙ্গে দেশ ভক্তদের যে যুদ্ধ হয়, সেই হাঙ্গামায় সে শ্রদ্ধাস্পদ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও সংস্পর্কিত ছিল।

আমি শুনেছি, মিঃ টেগার্টের বাড়ী নাকি আয়র্লণ্ডে। সে স্বদেশবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রামেও বাধা দিয়েছিল ; কিন্তু কৃতকার্য্য হতে পারেনি। এই সব বিষয় আমি প্রায়ই বিশেষ রূপে চিন্তা করতাম ; আমি যেন শুনতে পেলাম—মা যেন আমায় ডেকে বলছেন,—লোকটাকে পৃথিবী হ'তে সরিয়ে দাও!

আমি প্রথমে লালবাজারে মিঃ টেগার্টকে দেখি। তারপর নতুন বাজারে ফুলের ষ্টলের কাছে তাকে অনেকবার দেখেছি। অনেকবার তার পাশ কাটিয়েও চলে গিয়েছি। অনেকবার আমি আগ্নেয় অস্ত্রাদি সঙ্গে নিয়ে ইডেন বাগান ও অন্যান্য স্থান পর্য্যন্ত তার অনুসরণ করেছি। এমন কি তাকে লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়তেও উদ্যত হয়েছিলাম, কিন্তু মায়ের কাছ থেকে শেষ আদেশ না পাওয়ায় আমি তা' থেকে বিরত হয়েছিলাম।

আমি প্রায়ই চিন্তা করতাম—লোকটাকে খুন করব কিনা। গ্রেপ্তারের দু' তিন দিন আগে আমার আগেকার অবস্থা আবার ফিরে এল। তখন

আবার আমার মাথা গরম হয়ে উঠলো। আমি আর ঘুমোতে পারলাম না, ঘরের মধ্যেও থাকতে পারতাম না, আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা পর্য্যন্ত ছিল না। মনে হত আমার ঘরের চারিদিকেই যেন আগুন। তাই আমি দৌড়িয়ে ছাদে গিয়ে ঘুরে বেড়াতাম। আমাকে যেদিন গ্রেপ্তার করা হয়, সেদিন আমি মাঠে বেড়াতে গিয়ে একজন সাহেবকে দেখতে পাই। মনে হল এই তো মিঃ টেগার্ট। তাই আমি তাকে লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়ি। আমি কতবার যে গুলী ছুঁড়েছিলাম, আমার তা' মনে নাই। তবে অনেক বার ছুঁড়েছিলাম, কেন না আমার আশংকা পাছে সে আবার বেঁচে যায়। গুলী ছোঁড়বার আগে বা গুলী ছোঁড়বার সময় আমাব নিজেকে বাঁচাবার চিন্তা আদৌ মনে হয়নি।

আমাকে যখন গ্রেপ্তার করে পুলিশ কমিশনারের ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন পর্য্যন্ত আমার ধারণা ছিল যে, আমি মিঃ টেগার্টকে হত্যা করেছি। কিন্তু তাকে সেখানে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমি একেবারে অবাক হয়ে যাই। তখন আমার মনে হল—আমি করেছি কি? সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করল—তুমি ভুল করেছ, কেমন? তারপর মিঃ টেগার্ট আমাব নাম ধাম জিজ্ঞাসা করছিল। আমি তাব কোন জবাব দিইনি। তারপব আমাকে ইলিসিয়াম রোতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আমি ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছিলাম, আমার শরীর ভাল নয়, আমাকে বিরক্ত করবেন না। মিঃ টেগার্ট আবার আমায় জিজ্ঞাসা করে—তুমি ভুল করেছ, নয়? এইবার আমি বললাম—তোমাকেই খুন করা আমার উদ্দেশ্য ছিল; ভগবানের কৃপায় এ যাত্রা বেঁচে গেলে।

পরের দিন বেলা ১২টার সময় আমি ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে একরার করি। আমি বলি, আমার নাম—গোপীনাথ সাহা। বাড়ী—শ্রীরামপুর, ক্ষেত্রমোহন স্ট্রীটে। পিতার নাম বিজয় কৃষ্ণ সাহা। তিনি মারা গেছেন তারপর আমাকে অনেক জায়গায় ঘুরিয়ে প্রেসিডেন্সী জেলে নিয়ে আসা হয়। আমার সম্বন্ধে যা' বলবার বললাম। একজন নির্দোষ সাহেবকে যে আমি হত্যা করেছি, এ জন্য আমি দুঃখিত। সাহেব হলেই যে আমার শত্রু হবে, আমি তা' মনে করিনে; অন্যান্য যারা এই ঘটনায় আহত হয়েছে, তাদের জন্যও আমি দুঃখিত। এই রকম কাজের সময় যারা বাধা দেয়, তারা স্বদেশীই হোক আর যাই হোক তারা শত্রু অপেক্ষা অধিক অনিষ্টকারী। আমার বক্তব্য সমস্তই বললাম, তবে বিচার শেষ হয়ে গেলে দণ্ডিত হয়ে আমি আমার স্বদেশবাসীর কাছে কয়েকটি কথা বলিতে চাই। অনুগ্রহ করে আমাকে সেই অনুমতিটুকু দিবেন। তাতে আমার পাঁচ মিনিটের বেশী সময় লাগবে না। আর জেল থেকে আমি মায়ের কাছে একখানা চিঠি লিখতে চাই, সেজন্য আমাকে একটু অবসর দিবেন।'

বিজলী[৫৩] পত্রিকায় বিপ্লবী গোপীনাথ সাহার বিচারের কথা ছাপা হয়েছিল। সংবাদটি হলো এই ঃ

ফাঁসীর হুকুম

গত ১৬ই ফ্রেব্রুয়ারী তারিখে বিচারপতি মিঃ পিয়ার্সন গোপীনাথের বিচারের রায় পাঠ করেন। তাতে তাকে তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। ৯জন জুরীর মধ্যে সাতজন আসামীকে দোষী সাবস্ত করেন। বিচারপতির কথা শেষ না হতেই আদালতে গোপীনাথ উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠে—"আমি চললাম। আমার প্রতি রক্তবিন্দু যেন ভারতের ঘরে ঘরে স্বাধীনতার বীজ বপন করে।"

তারপর বিচারপতি ও জুরীরা আসন পরিত্যাগ করতে উদ্যত হলে, সে আবার চীৎকার করে বলে—

"যতদিন পর্য্যন্ত জালিয়ানওয়ালাবাগ ও চাঁদপুরের মত ঘটনা ঘটবে, ততদিন পর্য্যন্ত এই রকম ঘটনা ঘটবেই ঘটবে। এমন একদিন আসবে, যেদিন সরকারকে এর ফলাফল ভোগ করতে হবে। আপনারা মনে রাখবেন—যতদিন পর্য্যন্ত রুদ্রনীতি বর্ত্তমান থাকবে ততদিন পর্য্যন্ত এই রকম ঘটনার অবসান হতে পারে না।'

বিজলী[৫৪] পত্রিকায় একটি ব্যঙ্গ কবিতা ছাপা হয়েছিল। কবিতাটি এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

'কর-পরশনে বিপরীত রীত / (শ্রীমন্দা' ঠাকুরেণোদ্‌গীরিতং) / নৃপ-নন্দন কঙ্গরসে রসিয়া, / পরিধান ধুতী খদ্দর কসিয়া। / দ্বিজ নন্দন চন্দন পুষ্প করে, / অতি হীন জনে ধরি তুষ্ট করে। / কত বিপ্র কুলোদ্ভব বর্ণগুরু, / এক ভোট তরে ধরে শূদ্র উরু / ধরি বিপ্রপদে নত শূদ্র কহে, / ছি ছি কী কর ঠাকুর কী কর হে। / নতজানু হয়ে মম জানু ধরি, / তব সূত্র-শিখা অপমান করি, / ইহকাল তরে পরকাল দিলে, / প্রভু হীরক ফেলি কি কাঁচ নিলে। / কত অট্টালিকাবাসী পট্টাধারী, / চলে বিদ্বান উদ্যান-পাল বাড়ী। / কত শিক্ষাভিমানীরা ভিক্ষা করে, / চলে লক্ষপতি দীনের লক্ষ্য করে। / ঘৃণা ব্যঞ্জক শব্দে ত্যানা কহে, বলে তেনুকাকা বাড়ীতে আছ হে। / যিনি তস্কর দলপতি দৈত্য গুরু, / তিনি বাক্যদানে আজি কল্পতরু। / ঠেলি নর্দ্দমাকর্দমে অর্দ্ধরাতে, / কত মর্দ্দ জনে ফিরে ফর্দ্দ হাতে। / কভু বক্তৃতা দিল কেহ মঞ্চে উঠে, ব্যস্‌ উত্তর দিল তারে লোষ্ট্র ছুটে। / বল কোন দলে কোন দলে কোন্দল হে, / এ অহিংস দল কেহ হিংস নহে। / তবে কঙ্গরঙ্গে দেখি ভঙ্গ রণে, / সদা শঙ্কিত কেন বিপক্ষগণে ?'

ইহাও উল্লেখযোগ্য যে এই সংখ্যার সম্পাদকের নাম ছিল্‌ দুর্জনের ঃ

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও নলিনীকান্ত সরকার। প্রতি সংখ্যা কাগজের দাম ছিল এক আনা।

'আত্মশক্তি' ছিল সেকালের বিপ্লবীদের অন্যতম মুখপত্র। আত্মশক্তি ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা। ছাপা হতো 'চেরী প্রেস', ৯৩ এ, বহুবাজার স্ট্রীট, কলকাতা থেকে। এই কাগজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন—গোপাললাল সান্যাল, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই সময় প্রচার সংখ্যা ছিল প্রায় ১২০০ কপি।

১৯৩৪ সালে 'আত্মশক্তি' কাগজের পরিচালক হিসাবে নাম থাকতো—ফরওয়ার্ড পাবলিশিং হাউস। ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা শুক্রবার, ১৬ই বৈশাখ, ১৩৩৪ সাল, ইং ২৯শে এপ্রিল ১৯২৭ সালের সংখ্যায় সম্পাদক: গোপাললাল সান্যাল। ১৯ নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া স্ট্রীট, কলিকাতা। কাগজের দাম প্রতি সংখ্যা এক আনা।

সেকালের পত্র-পত্রিকার কথা উল্লেখ করেছেন অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।[৫৫] অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় লিখেছেন:

'স্বাভাবিক দেশজ কারণে ইতিমধ্যে বাংলা সাহিত্যের মোড় কতকটা ১৯৩৩ সালে গর্কি'র 'মা' তরজমায় গ্রন্থকারে প্রকাশ হয়, আগেই বুঝি "লাঙল" ও "আত্মশক্তি" পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে তা' বেরিয়েছিল।'

বিপ্লবীদের প্রিয় সাময়িকপত্র 'বিজলীর' কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। বিজলী প্রসঙ্গে মুজফ্‌ফর আহমদ[৫৬] লিখেছেন:

'বারীন্দ্রকুমার ঘোষেরা থাকতেন শ্যামবাজারের মোহনলাল স্ট্রীটে। তাঁদের সাপ্তাহিক "বিজলী"ও প্রকাশিত হত ওই ঠিকানা হ'তেই। শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশের (তখনও দেশবন্ধু হন নি) মাসিক কাগজ "নারায়ণের পরিচালনার ভারও ছিল শ্রীবারীন ঘোষেদের হাতে।'

মনে হয় লেখক ১৯২০ সালের কথা উল্লেখ করেছেন।

Intelliegence Bureau, Govt. of India [৫৭], বইতে উল্লেখ আছে সেকালের পত্র-পত্রিকার সংবাদ। উক্ত বই থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত হলো:

'*Press propaganda.* Being satisfied by Mr. Gandhi's arrest and conviction, in 1922, that his programme had definitely failed, the terrorists decided then to resume their campaign of violence. There is reason to believe that the Chittagong Congress of April 1922 was the occasion of the decision to resume violent methods. This second terrorist campaign was ushered in, like the first, by a resumption of terrorist propaganda in the extremist press. Within a short time of the repeal of the Indian Press Act in March 1922, mushroom vernacular journals like the "Atma Sakti", the "Sarathi", the "Muktikam",

"Bijoli" and others began to publish articles having a direct or indirect tendency to excite violent hostility against government and the British. The commonest type of propaganda was to denounce the economic oppression of the British in India, to extol, in mystical and sometimes in poetic Language, freedom and self-sacrifice, and to publish appreciative articles in praise of revolutionaries. This last was a new feature of revolutionary propaganda and its nature will appear from the following extract from the annual report on Indian newspapers in Bengal for the year 1923 :--

"A noteworthy feature in the year under review was the large amount of writing in frank praise of old revolutionaries. The 'Ananda Bazar Patrika' referred to them as selfless youths with indomitable resolution, who kindled the lamp of life by undergoing death. The 'Prabartak' far march, in continuation of previous issues, extolled Kanai Lal Dutt the murderer of the approver Narendra Lal Gossain in the Alipore Conspiracy case. These are primarily narratives. Highly appreciative biographical notices of Jatindra Mukherjee and his three associates (killed at Balasore in an encounter with the police) now appeared in many papers. It was explained, however, that this laudation did not necessarily imply adoption of their methods. The justification was set forth by the "Sarathi", the distrust of the people must be removed. To give them such a training, the life stories of self-sacrificing heroic patriots must be recited to them, we adopt their methods, but are we not on that account, to respect their renunciation, their heroism, and their patriotism".

'আত্মশক্তি' পত্রিকায় একদিকে যেমন ইংরেজের বিরুদ্ধে বিপ্লবের কথা প্রচার করা হতো, আর একদিকে সমাজের ও দেশের বিভিন্ন সংবাদ দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা হতো। ইংরেজ কোম্পানী কত লাভ করলো, কোথায় কোন সরকারী আমলা কি করেছে, কিংবা দেশের কোন পত্র-পত্রিকার সম্পাদক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন সেই সব সংবাদ ছাপা হতো।

আত্মশক্তি[৫৮] পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল : 'কলিকাতা ট্রাম কোম্পানী, গত সপ্তাহে এই কোম্পানীর আয় হইয়াছে, ১০১,১৮৪ টাকা। গত বৎসরে ঐ সপ্তাহে আয় হইয়াছিল ৯২,৫৩১ টাকা। বাসের উৎপাতেও কোম্পানীর আয় কমা দূরে থাকুক বাড়িয়া গিয়াছে।'

আত্মশক্তি[৫৯] পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল : 'মালদহের ম্যাজিস্ট্রেটের কীর্ত্তি'। সংবাদটি এখানে উল্লেখ করা হলো :

'মালদহের অস্থায়ী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এম. ঘোষ ১৪৪ ধারা জারী করিয়া সাঁওতালদিগকে কালীপূজা করিতে বাধা দিয়া এবং সাঁওতাল গুরুকে সে স্থান হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া স্বীয় ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। সম্প্রতি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ পেডি উক্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়াছেন এবং গুরুকেও মালদহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার আদেশ দিয়াছেন। ৭ই মে তারিখে কালীপূজার আয়োজন হইয়াছে।'

'আত্মশক্তি'[৬০] কাগজে একটি ছোট সংবাদে বলা হয়েছিল ঃ

'সম্পাদকের অদৃষ্ট'

"ভোটরঙ্গ' সম্পাদক দোষী সাব্যস্ত হইয়া তিন-মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

"মতয়ালা" [হিন্দী পত্রিকা] সম্পাদক মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

"হিন্দু-পঞ্চ" সম্পাদক ছয় মাস এবং মুদ্রাকর চারিমাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।'

'আত্মশক্তি'[৬১] কাগজে আর একটি সংবাদে উল্লেখ করা হয়েছিল বলশেভিক মামলার কথা। সংবাদটি হলো এই '

'বলশেভিক ষড়যন্ত্রের মামলা

"সোসালিষ্ট সম্পাদক মিঃ এস. এ. ডাঙ্গে কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্রের মামলায় চারি বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তিনি ২৩শে তারিখে মুক্তিলাভ করিবেন কথা ছিল। সাধারণের মধ্যে কোন সমারোহ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত দিনে মুক্তি না দিয়া পরদিন প্রাতে ৬টার সময় মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য এক সভা হইবে।'

আত্মশক্তি[৬২] কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল দেশবাসীর প্রতি সুভাষচন্দ্র বসুর নিবেদন। কিছু অংশ হলো এই ঃ

' ·চতুর্দ্দিকেই নবজাগরণের চিহ্ন দেখা যাইতেছে। পূজনীয় চিত্তরঞ্জন দাশের আকস্মিক অন্তর্ধানের পর যে ঘনান্ধকার আমাদিগকে আবৃত করিয়াছিলেন, তাহা ক্রমশঃ অপসারিত হইয়াছে। যাহা এখনও আছে, তাহার মধ্যেও নব প্রভাতের নবীন সূর্য্যের অরুণ আভা দেখা যাইতেছে।

সময় নিকট হইলে, কর্ম্মের আহ্বান আসিলে, যেন আমরা সকলেই একাগ্রচিত্তে পুনরায় কার্য্য আরম্ভ করতে পারি আজ ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।'

আত্মশক্তি[৬৩] কাগজে ছাপা হয়েছিল রাজদ্রোহ মামলার কথা। সংবাদটি হলো এই ঃ

'জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী

শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী ১২৪ ধারা অনুসারে যে অভিযুক্ত হইয়াছেন, গত ৩০শে মে আলিপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এ. সি. দত্তের এজলাসে সেই মোকদ্দমায় বিচার আরম্ভ হইয়াছে।'

আত্মশক্তি[৬৪] কাগজে আর একটি রাজদ্রোহ মামলার কথা ছাপা হয়েছিল। সংবাদটি হল এই ঃ

আত্মশক্তি রাজদ্রোহ মামলা

সম্পাদকের দুই মাস কারাদণ্ড

'শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী লিখিত একটি প্রবন্ধের জন্য রাজদ্রোহ অভিযোগে "আত্মশক্তি" সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোপাললাল সান্যাল এবং মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায় গত সেপ্টেম্বর মাসে রাজদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত হন। কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারে সম্পাদক মহাশয় দুই মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে ও ২৫০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে এক মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং মুদ্রাকর ১০০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে এক মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রাপ্ত হন।

উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে, হাইকোর্টে আপীল হইয়াছিল। গত ২০শে তারিখে বিচারপতি মিঃ চারুচন্দ্র ঘোষ ও মিঃ গ্রেগরীর এজলাসে আপীলের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। বিচারপতিদ্বয় আপীল ডিসমিস করিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয়ের দুই মাস জেল বহাল রহিল।'

আত্মশক্তি[৬৫] কাগজে ছাপা হয়েছিল 'দেশের বাণী'র কথা। সংবাদটি হলো এই ঃ

'দেশের বাণী

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার অভিযোগে ১২৪ক এবং ১৫৩ক ধারা অনুসারে উক্ত পত্রিকার সম্পাদক যথাক্রমে ১০০ / এবং ৩০০ / অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। হাইকোর্টে আপীল হওয়াতে সম্পাদক ১২৪ক ধারা অনুসারে দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন কিন্তু ১৫৩ক ধারার দণ্ড বহাল আছে।'

'সারথি' ছিল সাপ্তাহিক কাগজ। পরিচালক ছিলেন অনিলবরণ রায়। এঁর বাড়ি ছিল বাঁকুড়া। পিতার নাম নবকুমার রায়। নবকুমার রায় বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেসের কর্মী ছিলেন। কাগজ ছাপা হতো, 'সরস্বতী প্রেস' থেকে। তখন 'সরস্বতী প্রেসের' ঠিকানা ছিল ঃ ২৬/১, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা। 'সারথি' পত্রিকা ১ম বর্ষ, ৩৫শ সংখ্যা, ২৮শে চৈত্র, বৃহস্পতিবার ১৩৩০, ১০ই এপ্রিল ১৯২৪ সালের সংখ্যায় উল্লেখ ছিল ঃ 'সম্পাদক, প্রকাশক ও প্রিণ্টার ঃ ইন্দুভূষণ রায়।'

সেকালের বাংলা পত্র-পত্রিকার খোঁজে ৯ই জুন, ১৯৭৮ সালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে 'শ্রীসরস্বতী প্রেসে' শৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়ের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। শৈলেন্দ্রনাথ গুহরায় জানিয়েছিলেন, ১৯২৩ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে সরস্বতী প্রেস ছোট আকারে গড়ে ওঠে। তখন প্রেস ছিল ২৬/১, বেনেটোলা লেনে। তিনি আরও বলেছিলেন, ৭৮ বছর বয়সে সব কথা

মনে পড়ছে না। শ্রীসরস্বতী প্রেস ছিল বিপ্লবীদের একটি কেন্দ্র। শ্রীসরস্বতী প্রেসের গোড়ায় ছিলেন : মনোরঞ্জন গুপ্ত, অরুণচন্দ্র গুহ, শৈলেন্দ্র গুহরায়। প্রেসে আসতেন, মানবেন্দ্রনাথ রায়, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জয়প্রকাশ নারায়ণ, ডক্টর রামমনোহর লোহিয়া, মুজফ্ফর আহমদ এবং আরও অনেকে। এই প্রেস থেকে বিভিন্ন সময় বহু বিপ্লবীদের পত্র-পত্রিকা ছাপা হয়েছিল। পুলিশের হামলাও হতো। পুলিশ প্রায় ইংরেজ বিরোধী কিছু পাওয়া যায় কি না, তা' খোঁজ করতো। পুলিশের লোক প্রেসের আশে-পাশে ঘুরে বেড়াতো; তা' আমরা সেদিন জানতাম। শৈলেন্দ্রনাথ গুহরায় আরও জানিয়েছিলেন যে, সেকালে তাঁরা ছিলেন "যুগান্তর" রাজনৈতিক দলের লোক। "যুগান্তর" রাজনৈতিক দলের বিপ্লবী প্রচারপত্র এবং পুস্তিকা ছাপার জন্য কয়েকজনের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'শ্রীসরস্বতী প্রেস"।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, 'যুগান্তর' দলের অন্যতম কর্মী ছিলেন—অরুণচন্দ্র গুহ। অরুণচন্দ্রের জন্ম বরিশালে (বর্তমানে বাংলাদেশ) ১৮৯২ সালে। বাবার নাম : কৈলাশচন্দ্র গুহ। ১৯১৫ সালে বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ থেকে বি-এ পাশ করেন। অল্প বয়সে ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্র মামলায় লিপ্ত থাকার অভিযোগে তাঁকে ১৯১৬ সালে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তারপর বহুবার তিনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। ১৯১৩ সালে শ্রীসরস্বতী প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। অরুণচন্দ্র গুহ আমাকে জানিয়েছিলেন, ১৯২২ সালে তিনি 'সারথি' পত্রিকা প্রকাশ করেন। তা' ছাড়া ১৯২৮ সালে 'স্বাধীনতা' পত্রিকা তিনি বের করেছিলেন। তাছাড়া শ্রীসরস্বতী প্রেস থেকে তিনি বের করতেন 'মন্দিরা' মাসিক পত্রিকা। মন্দিরার পুরাতন কপি তিনি দেখিয়েছিলেন।

সাপ্তাহিক 'সারথি'[৬৬] পত্রিকা থেকে কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো :

'স্বামী বিশ্বানন্দ তারকেশ্বর প্রভৃতি স্থানের মোহন্তদের সম্বন্ধে যে সব দুর্নীতি ও অত্যাচারের সংবাদ সর্বত্র শ্রুত হয় তাহার নিরাকরণ মানসে একদল সত্যাগ্রহী সম্পূর্ণ অহিংস স্বেচ্ছাসেবক সঙ্ঘ 'মহাবীর দল' নামে গঠন করিয়াছেন। কলুষিত চরিত্র মোহন্তদের হস্ত হইতে হিন্দুর পবিত্র ধর্মস্থানগুলি উদ্ধার করাই তাহাদের প্রতিজ্ঞা। হিন্দুদের প্রাণে স্বধর্মের জন্য একটুও দরদবোধ নাই—তাই তাহাদের ধর্মকে লইয়া এইসব নীতিহীন ভ্রষ্ট চরিত্র মোহন্তগণ নির্ব্বিকার চিত্তে খেলা করিতে পারে।...'

Sir Cecil Kaye[৬৭] লিখেছেন :

'. . .The Amrita Bazar Patrika, as already mentioned, made free use of its sentiments and phraseology; as also did another

Calcutta paper, the "Atmasakti", directed by a group of Bengal revolutionaries'.

Sir Cecil Kaye[৬৮] লিখেছেন ঃ

'...One, a short-lived publication, edited by Nalini Gupta's recruit of Muzaffar Ahmed, and the other, the "Dhumketu", a Bengal revolutionaries' organ ; the "Desher Bani (Noakhali, Bengal) :'

'দেশের বাণী' ছিল জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের সাপ্তাহিক পত্র। ছাপা হতো নোয়াখালি শহরে (বর্তমানে বাংলাদেশ) "মিল প্রেস" থেকে। কাগজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, ক্ষিতীশচন্দ্র রায়। এঁদের বাড়ি ছিল নোয়াখালি শহরে। সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের পিতার নাম উদয়চন্দ্র মিত্র। সেকালে এই কাগজের বেশ নাম ছিল। এটি ১৯২১-১৯২২ সালের কথা। ওই সময় 'মিল প্রেস' পরিচালনা করতেন ঃ আবদুল রসীদ খান।

Sir Cecil Kaye[৬৯] লিখেছেন ঃ

'Sometime ago it was reported that certain individuals in Calcutta had subscribed to and were receiving the workers *Dreadnought* from England. The names of these individuals were given and enquiry was made about them in Calcutta one of them only, Muhammad Yusha Khan, has been found to be receiving the paper : it could not be ascertained whether others were receiving or not. Mohammad Yusha Khan is a member of a big firm in Calcutta dealing in salted hides, he is Wahabi and a Cousion of Mohammad Akram Khan, Khilafat agitator and editor of Mohammadi. Yusha Khan helped Akram Khan with money to start this paper and supports him generally in political matters. This paper describes itself as published by the C. P. (British section of the Third International) editor Syivia Pankhurst. Miss Pankhurst of course receives money from the Soviet Government and attended the recent Conference of the Third International at Moscow.'

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ'র কথা। ইনি ছিলেন একজন খ্যাতনামা সাংবাদিক। ১৯১৫-১৯২২ সালের মধ্যে সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী' বের করেন। তখন 'মোহাম্মদী' অফিস ছিল ঃ ২৯ নং আপার চিৎপুর রোড, কলকাতা। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ'র সম্পাদনায় আর একটি দৈনিক কাগজ প্রকাশিত হতো। এই দৈনিক কাগজের নাম ছিল—'আজাদ'। 'আজাদ' অফিস ছিল কলকাতার ইণ্টালি মার্কেটের সামনে। বর্তমানে যে বাড়িতে 'লোক সেবক' পত্রিকার অফিস, ওই বাড়ি থেকে 'আজাদ' পত্রিকা প্রকাশিত হতো। 'মোহাম্মদী' এবং 'আজাদ'

সম্পাদকরূপে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। একদা তিনি খেলাফত আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। শোনা যায়, ১৯২১ সালে 'মোহাম্মদী' কাগজে লেখার জন্য এক বছর তিনি কারাবরণ করেন। জাতীয়তাবাদী সাংবাদিক হিসাবে জীবন শুরু করেন। পরে তিনি উগ্র মুসলিম লীগের সমর্থক ও নেতারূপে পরিচিত হন। দেশ বিভাগের পরে ভারত ত্যাগ করেন।

বাংলা সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের ইতিহাসে দেখা যায় যে, বিভিন্ন সময়ে অনেকে সামান্য কিছু টাকা সংগ্রহ করে কাগজ বের করেছিলেন। আমাদের দেশে শিশুমৃত্যুর মতো বহু পত্র-পত্রিকা দু-এক সংখ্যা প্রকাশিত হবার পরে আর ছাপা হয়নি। বাংলার ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, প্রফুল্লকুমার সরকার, মাখনলাল সেন, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি খ্যাতনামা সাংবাদিকেরা দেশের সাধারণ মানুষের কাছ থেকে প্রচুর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পেয়েছিলেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বহু পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন ধরণের নিবন্ধ লিখেছিলেন। কয়েকটি কাগজের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো : মানসী, বিজয়া, সাহিত্য, প্রবাহিনী, নায়ক, নারায়ণ বঙ্গবাণী, কল্পনা, সারথি, অনুসন্ধান প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা ছাপা হয়েছিল।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে নটরাজন[৭০] লিখেছেন :

'It was considered opinion of Panchcowrie Banerjee who claimed that during the thirty-one years of his journalistic career he has been editor in-chief of "almost all the leading Bengali and Hindi Newspapers in Calcutta", that the commercial spirit had become the dominant force in journalism, that, though the Non-Cooperation Movement was cashing in on the political agitation of the Press for fifty years, it was not being pushes by the Press, and that the public platform was more widely exploited to spread anti-British feeling.'

১৯২০ সালের বাংলা সংবাদপত্রের কথা বলতে গিয়ে S. Natarajan[৭১] লিখেছেন :

'There were in 1920 a few Indian Language journals which functioned as associates of Indian-owned English news papers, specially in Bengal. The most distinguished of these was the daily *Nayak*, edited by the versatile Panchcowri Banerjee who even drew cartoons, the Bengali Counterpart of the *Bengalee*. The *Basumati* appearing as a daily, weekly and monthly under the editorship of the talented Hemendra Kumar Ghosh (sic) from 1914, was an independent venture.

With Manoranjan Guha-Thakurta's *Nabashakti* a victim to Government displeasure, the *Sanjivani* and the *Hitabadi* were the two leading weeklies, both supporting the Congress.'

'নায়ক' কাগজের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। যাঁরা এই কাগজ প্রকাশ করার ব্যাপারে জড়িত ছিলেন তাঁদের কয়েকজনের নাম যেমনঃ আনন্দচরণ সেন, শশধর ঘোষ। 'নায়ক' ছাপা হতো—'তারা প্রেসে'· ৫৬ নং সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে হিজলীর ঘটনা বড় বেদনার। হিজলীতে গুলি চলেছিল। গুলিচালনা নিয়ে গোটা বাংলাদেশের মানুষ উত্তেজিত হয়েছিল। আনন্দবাজার পত্রিকা[১২] থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হলো :

'হিজলীর ঘটনার জন্য রাজবন্দীরাই দায়ী গুলি মারা ব্যাপারে গভর্ণমেন্টের সিদ্ধান্ত

গত কল্য ৫ই ডিসেম্বর কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় নিম্নলিখিত সরকারী ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে।··গত ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৩১ তারিখ হিজলী বন্দী নিবাসে যে ঘটনা ঘটিয়াছে এবং তৎবিষয়ে তদন্ত কমিটি অনুসন্ধান করিয়া যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন স-পরিষদ লাট বাহাদুর তৎসম্পর্কে বিবেচনা করিয়া যে সমস্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে প্রদত্ত হইল : ··১৫ই তারিখের ব্যাপার রাজবন্দী এবং সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করিয়াছিল এবং তিনি মন্তব্য করিতেছেন যে, সমস্ত ব্যাপারে রাজবন্দীরাই ছিল উপদ্রব সৃষ্টিকারী।'

সে দিনের কাগজে আরও উল্লেখ ছিল :

'গুলি করাটা নিয়মশৃঙ্খলার বিরোধী

···দেখা যাইতেছে যে, গুলি করার কোন আদেশ দেওয়া হয় নাই, সুতরাং পরে যে সমস্ত গুলি বর্ষিত হইয়াছিল, তাহা সমর্থন করা যায় না। স-পরিষদ লাট বাহাদুর কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছেন এবং মন্তব্য করিতেছেন যে, এই সমস্ত সিপাহীদের কার্য দ্বারা নিয়ম শৃঙ্খলার কার্য গুরুতররূপে ভঙ্গ হইয়াছে।'

আগে উল্লেখ করা হয়েছে, কারাগারে গুলি চালনার পরে দেশের মানুষ উত্তেজিত হয়েছিল। সাংবাদিকরাও প্রতিবাদ করেছিলেন। 'নায়ক' পত্রিকা প্রতিবাদ করে লিখেছিলেন। তার ফলে রাজদ্রোহ মামলায় জড়িয়ে পড়ে। আনন্দবাজার পত্রিকায়[১৩] প্রকাশিত সংবাদ এখানে উল্লেখ করা হলো :

'নায়ক রাজদ্রোহের মামলা

সম্পাদক ও মুদ্রাকর প্রত্যেকের ৬ মাস দণ্ড। গত ২৬শে সেপ্টেম্বর

তারিখের "নায়ক" পত্রিকায় "হিজলীতে নৃশংস কাণ্ড" শীর্ষক রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করার অপরাধে উক্ত পত্রিকার সম্পাদক ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহরায় এবং মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত নাগের প্রত্যেকের প্রতি ম্যাজিস্ট্রেট ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন।...'

'নায়ক' পত্রিকা প্রসঙ্গে আলোচনাকালে প্রতাপচন্দ্র গুহরায়ের নামও উল্লেখ করা দরকার। এক সময় ইনি 'নায়ক' কাগজের সম্পাদনা করেছিলেন। প্রতাপচন্দ্র গুহরায় ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিনি নায়ক, মর্মবাণী এবং মাতৃভূমি কাগজের সম্পাদক ছিলেন।

'সঞ্জীবনী' প্রকাশিত হতো. ৬ নং কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা থেকে। এই কাগজের সম্পাদক ছিলেন—কৃষ্ণকুমার মিত্র।

অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের[৭৪] লেখায় 'বঙ্গবাসী' ও 'সঞ্জীবনী' অফিসের কথা উল্লেখ আছে। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের লেখা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত হলো: 'আর মনে পড়ে তখনকার দিনের প্রকাণ্ড সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি—"বঙ্গবাসী" দেখেছি কম, যদিও মনে আছে দাদুর সঙ্গে গেছি কলেজ স্ট্রীটে—হ্যারিসন রোড মোড়ের কাছাকাছি ভবানী দত্ত লেনে বিরাট কাঠের সিঁড়ি বেয়ে "বঙ্গবাসী" অফিসে। "হিতবাদী"ও খুব বেশি মনে নেই। তবে মনে আছে দাদু একবার নিয়ে গিয়েছিলেন কলুটোলা স্ট্রীটে আর বলেছিলেন যে এককালে রবিঠাকুরও বুঝি ঐ কাগজে লিখতেন। "সঞ্জীবনী"র কথা একটু বেশি মনে আছে, কারণ তার সম্পাদকীয় স্তম্ভের মাথায় লেখা থাকত ফরাসি বিপ্লবের মূলমন্ত্র। "সাম্য. মৈত্রী, স্বাধীনতা"। "সঞ্জীবনী"-সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রকে বহুবার দেখেছি—সৌম্য. ঋষি-প্রতিম মূর্তি, স্বদেশী যুগের উগ্রপন্থী বলে খ্যাত হলেও তখন তিনি ধীর, স্থির, সংযত রাজনীতির সমর্থক।'

আগে 'আত্মশক্তি', 'সারথি', 'বিজলী' প্রভৃতি পত্রিকা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। শ্রীসুপ্রকাশ রায়[৭৫] লিখেছেন:

'১৯২১ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে "ভারতীয় প্রেস আইন" তুলিয়া লইবার পর মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে "আত্মশক্তি", "সারথি", "মুক্তিকাম", "বিজলী", প্রভৃতি বহু বৈপ্লবিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই সকল পত্রিকায় অবিলম্বে ভারতের বৃটিশ-শাসকদের উচ্ছেদের উদ্দেশে দেশের যুব-ছাত্র শক্তিকে বৈপ্লবিক সংগ্রামে যোগদানের আহ্বান জানাইয়া বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে থাকে। সাধারণতঃ এই সকল রচনায় ভারতে বৃটিশ-রাজের আর্থিক শোষণের উচ্ছেদ, ধর্মীয় ও কাব্যিক ভাষায় স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগের জয়গান এবং জ্বালাময়ী ভাষায় বিপ্লবীদের আদর্শ প্রচার করা হইত।'

কংগ্রেসের ওপরতলার অধিকাংশ নেতা ইংরেজদের সঙ্গে আবেদন-নিবেদন করে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের মতো একটা কিছুতে সন্তুষ্ট ছিলেন।

কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসু এবং ভারতের অসংখ্য বিপ্লবীরা কংগ্রেস নেতাদের ওই রূপ প্রস্তাবের সমর্থন করেন নি। গান্ধীজীর নির্দেশ মতো সুতোকাটা, অস্পৃশ্যতা বর্জন, মাদক বর্জন, বিদেশী দ্রব্য বর্জন, জাতীয় শিক্ষা প্রচার প্রভৃতি গঠনমূলক কাজ-কর্ম সমর্থন করেও তাঁরা বিপ্লবের পথে চলার কথাও চিন্তা করেছিলেন।

ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন[৭৬] লিখেছেন ঃ

'বঙ্গ-বিভাগের পূর্বেই গোপনে গোপনে বিপ্লবের ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। বঙ্গ-বিভাগের ফলে দেশে যে প্রবল অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল বিপ্লবী নায়কেরা তাহার সুযোগ লইতে অবহেলা করেন নাই। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইংরাজের শত্রু শক্তির সহায়তাও তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বেচ্ছাতন্ত্রের সর্বপ্রধান সহায় দেশীয় সৈন্যদলকেও তাঁহারা সিপাহী বিদ্রোহের মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে তাঁহারা বিদেশী রাজশক্তির উচ্ছেদ করিতে পারেন নাই। সে কৃতিত্ব আপাতঃ দৃষ্টিতে গান্ধীজির। বিপ্লবের কঠিন ব্রত গ্রহণ করিবার সাহস ও শক্তি সকলের ছিল না। বিপ্লবের আহ্বান দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণের নিকট পৌঁছায় নাই। কৃষক ও শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের লোকেরা যে বিপ্লবীদিগকে শৌর্য ও সাহসের জন্য শ্রদ্ধা করিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের কঠিন ব্রতের উদ্দেশ্য তাহারা বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু গান্ধীজির আদর্শ বুঝিতে তাহাদের কষ্ট হয় নাই। চম্পারণের কৃষক আন্দোলনে, লবণের আইন অমান্য আন্দোলনে তাই ভারতের মৌন জনবল (ইংরাজের mute millions) উদাসীন থাকে নাই। বিপ্লবীরাও অনেকে নীতি হিসাবে গান্ধীজির আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন।

তথাপি মনে হয় বুড়িবালামের যুদ্ধ না হইলে, চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত না হইলে, সুভাষচন্দ্র পরিচালিত জাতীয় সেনাদল ভারতের পূর্বোত্তর সীমান্তে উপস্থিত না হইলে কেবল অহিংসা আন্দোলনের ফলে ইংরাজ ভারত ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইত কি না সন্দেহ।'

'লাঙল' কাগজ প্রসঙ্গে মুজফ্ফর আহমদ[৭৭] লিখেছেন ঃ

'এই পার্টি গঠিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার মুখপত্ররূপে "লাঙল" নাম দিয়ে সাপ্তাহিক কাগজ বা'র হয়েছিল। ১৯২৫ সালের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে "লাঙল"-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সেবার স্বরাজ পার্টির অফিসের জন্যে কলকাতা ৩৭ নং হ্যারিসন রোডের দোতলায় দু'খানা কামরা ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। এই ঠিকানা হতেই "লাঙল" কাগজেরও প্রকাশ আরম্ভ হয়। লাঙলের প্রধান পরিচালক হিসাবে কাজী নজরুল ইসলামের নাম লেখা হতো, আর সম্পাদকরূপে নাম ছাপা হতো মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের।'

মুজফ্ফর আহমদ[৭৮] লিখেছেন ঃ 'লাঙলের' প্রথম সংখ্যায় নজরুলের বিখ্যাত কবিতা "সাম্যবাদী" প্রকাশিত হয়েছিল।'

মুজফ্ফর আহমদ [৭৯] আরও উল্লেখ করেছেন ঃ

'১৯২৬ সালের ১২ই আগস্ট হতে "লাঙল"-এর নাম পরিবর্তন করে "গণবাণী" করা হয়। কাগজের কভারের ওপর লিখে দেওয়া হয়েছিল (এর সাথে "লাঙল" একীভূত হয়েছে)। নাম পরিবর্তনের কারণ ছিল এই। "লাঙল" নাম হতে বহু লোক মনে করতেন যে "লাঙল" শুধু কৃষকদেরই কাগজ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা ছিলাম শ্রমজীবী জনগণের কাগজ। এবারে নূতন ডিক্লারেশন আমি নিজের নামে নিলাম। ধীরে ধীরে কাগজের ভার আমার ঘাড়ে চেপেছিল। আমি ভাবলাম মিছিমিছি ঝুঁকিটা কেন অপর এক ব্যক্তির ঘাড়ে চাপিয়ে রাখি। ১৯২৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আঘাত আমাদের ওপরেও লাগে। মুসলিম নামধারী সম্পাদকের অর্থাৎ আমার সম্পাদিত "গণবাণী" হিন্দুরা কেনা কমিয়ে দিলেন। তখন আমার সঙ্গে যুগ্ম-সম্পাদকরূপে প্যারীমোহন দাশের নাম ছাপা হতে থাকে। তিনি কোনো কাজ করতেন না। পরে কালীপুরের সেনের নামও যুগ্ম-সম্পাদকরূপে ছাপা হয়েছে। তিনি কিছু কাজ করতেন।'

'লাঙল' এবং গণবাণী' প্রসঙ্গে জি. অধিকারী[৮০] লিখেছেন ঃ

'*Langul* which began publication on 16 December 1925 as the organ of the Labour-Swaraj Party and later became *ganavani*, the organ of the Workers' and Peasants' Party of Bengal and which Muzaffar Ahmad was connected from the very beginning, published in its issue No. 5. dt 21 January 1926 an article entiled "Communism and Bolshevism" which in the main gave a brief summary of the speech of Hasrat Mohani and it printed at the end the statement of Muzaffar Ahmad. . .'

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর[৮১] লিখিত গ্রন্থে উল্লেখ আছে "লাঙলের" কথা। কিছু অংশ হলো এই ঃ

'একদিন কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট দিয়ে কলেজ স্কোয়ার-মুখো চলেছি, হ্যারিসন রোড আর কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের কোণে ফেরিওয়ালাদের হাতে একটি নূতন কাগজ নজরে পড়লো। পত্রিকাটির নাম "লাঙল"। নতুন ধরণের নামটি লাগলো ভালো। পত্রিকাটি নিয়ে বাড়ী ফিরলুম, পড়ে দেখলুম যে শ্রমিক-কৃষকদলের নাম দিয়ে একটি দল সৃষ্টি হয়েছে, সেই দলেরই মুখপত্র হচ্ছে "লাঙল"। তখুনি চিঠি লিখলুম "লাঙলের" অফিসের ঠিকানায়। দলের তরফ থেকে শ্যামসুন্দীন সাহেব আমার সঙ্গে দেখা করতে জোড়াসাঁকোয় এলেন। তাঁর দু'তিন দিন বাদেই আমি হাজির হলুম গিয়ে "লাঙলে'র অফিসে। ৩৭ নং হ্যারিসন রোডে একটি মেসের দোতলায় দু'টি ঘর নিয়ে

শ্রমিক-কৃষকদলের ও 'লাঙলে'র অফিস ছিল। মনে আছে সেই বিকেল বেলাটা! আমি গিয়ে হাজির হলুম সেখানে। তখন আমার খালি পা, মাথায় ঝাঁকড়াচুল, পরণে খদ্দর। ঘরের মধ্যে একটি ছোট্ট মানুষ বসেছিলেন, শরীর তাঁর কৃশ, মুখ বিবর্ণ। শ্যামসুন্দীন সাহেব আলাপ করিয়ে দিয়ে বল্লেন ইনি হচ্ছেন মুজফ্‌ফর আহমেদ। পাশের ঘর থেকে লম্বা রোগা একজন বেরিয়ে এলেন। আলাপ হলো, শুনলুম তাঁর নাম নলিনী গুপ্ত। একটি অল্প বয়সী ছেলে সেখানে বসেছিলো, শ্যামসুন্দীন আলাপ করিয়ে দিয়ে বল্লেন—এ আমার ছোট ভাই, হালিম। প্রথম দিন মুজফ্‌ফরের সঙ্গে আলাপ হোলো। শ্রমিক-কৃষক দলের সম্বন্ধে আলোচনা করলুম দু'জনে। ডাঃ নরেশ সেনগুপ্ত তখন এই দলের সভাপতি, অতুল গুপ্ত সহ-সভাপতি আর হেমন্ত সরকার জেনারেল সেক্রেটারী।'

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর[৮২] আরও উল্লেখ করেছেন, 'নজরুলের কবিতাই ছিলো 'লাঙলে'র প্রধান আকর্ষণ। যে সব প্রবন্ধ ছাপা হোতো সেগুলোর মধ্যে কমিউনিষ্ট মতবাদের ছোঁওয়া কিছু কিছু থাকলেও উগ্র জাতীয়তাবাদেই ঠাসা থাকতো প্রবন্ধগুলি।'...

...'আমি যোগ দিলুম এই দলে। রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে 'লাঙলে'র জন্যে আশীর্বচন যোগাড় করবার ভার পড়লো আমার উপর। একদিন সকালবেলা রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে পেশ করলুম আমাদের আর্জি। তিনি তৎক্ষণাৎ লিখে দিলেন—

"জাগো, জাগো বলরাম, ধরো তব মরু-ভাঙ্গা হল,
প্রাণ দাও, শক্তি দাও, স্তব্ধ করো ব্যর্থ কোলাহল।'

'লাঙলে'র প্রচ্ছদপটে তাঁর আশীর্বচন থাকতো। এর কিছুদিন পরে আমরা পত্রিকার নাম বদল কোরে তার নাম রাখলুম "গণবাণী"। মুজফ্‌ফর হোলেন পত্রিকার সম্পাদক। এই 'গণবাণী'তেই আমি "কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো"র অনুবাদ ছাপাই। লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন আমাদের সেই প্রথম যুগের "গণবাণী" গোষ্ঠীর একজন।'

শ্রীসুকুমার মিত্র[৮৩] 'হেমন্তকুমার সরকারের' জীবনী ও তৎকালীন স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা নিয়ে আলোচনাকালে "লাঙলে"র কথা উল্লেখ করেছেন। শ্রীসুকুমার মিত্রের লেখা থেকে কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো :

'মৌলবী ফজলুল হক প্রমুখ মডারেট নেতাদের সঙ্গে থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনকে জোরদার করা যাবে না বুঝে ১৯২৫ সালের শেষদিকে তিনি বগুড়ায় নিখিল বঙ্গ প্রজা সম্মিলনীতে এক নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এর নাম হয় "ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায়।" এই দলের সাপ্তাহিক মুখপত্রের নাম রাখা হয় "লাঙল" এবং কাজী নজরুল

ইসলাম এর প্রধান পরিচালক হন। দলের সভাপতি, সহঃ সভাপতি সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন যথাক্রমে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, অতুল গুপ্ত এবং হেমন্তকুমার সরকার। এই দলটিই "লেবার স্বরাজ পার্টি" নামে খ্যাত হয়।'

'লাঙল' পত্রিকা, প্রথম খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৩শে পৌষ ১৩৩২, ইং ৭ই জানুয়ারী ১৯২৩, প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছিলঃ প্রধান পরিচালক—নজরুল ইসলাম। সম্পাদক—মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, নগদ মূল্য এক আনা, বার্ষিক ৩ টাকা। কাগজ ছিল ১৬ পৃষ্ঠা।' লাঙলে কি কি লেখা থাকতো তার উল্লেখ ছিল। তা' ছাড়া লাঙল যে শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ দলের সাপ্তাহিক মুখপত্র তা' উল্লেখ থাকতো।

'লাঙল'[৮৪] পত্রিকা থেকে কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো:

'ভারতীয় প্রথম কম্যুনিষ্ট কনফারেন্স

কানপুর

(ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির গঠন নীতি)

যেহেতু দেশীয় ও বৈদেশিক ধনিকগণের দ্বারা এবং ভারতীয় জমিদারগণের শোষণ-বৃত্তির দ্বারা ভারতবর্ষের শ্রমিক ও কৃষকগণ মানুষের মত জীবন যাপন করিতে পারিতেছে না, যেহেতু ভারতের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় দল সমূহে বুর্জোয়া (অভিজাত) দেরই সর্বাধিক প্রভুত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে আর এই প্রভুত্ব সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় কৃষক ও শ্রমিকগণের উন্নতির পরিপন্থী, সেই হেতু ভারতীয় কম্যুনিষ্টগণের এই সম্মিলন প্রস্তাব করিতেছে যে ভারতীয় শ্রমিক ও কৃষকগণের মুক্তির জন্য একটি দল গঠিত হউক। এই দল ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি (Communist Party of India) নামে অভিহিত হইবে। এই দলের চরম উদ্দেশ্য হইবে ভারতে কৃষক ও শ্রমিকগণের সাধারণতন্ত্র (স্বরাজ) প্রতিষ্ঠিত করা। ভূমি, খনি, গৃহ, টেলিগ্রাফ ও রেলওয়ে ইত্যাদি যে সমস্ত জন-সম্পদের উপর জন-সাধারণের অধিকার স্থাপিত হওয়া উচিত সেই সমস্ত সম্পদকে সর্ব্বাধিকার ভুক্ত ও সর্ব্বনাগরিকের আয়ত্ত করিয়া ভারতীয় শ্রমিক ও কৃষকগণের মানুষের মত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ব্যবস্থা করা কম্যুনিষ্ট পার্টির সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য হইবে।

এই সমস্ত উদ্দেশ্য সাধনে সাফল্য লাভের জন্য এই পার্টিকে সহর ও মফস্বলে শ্রমিক ও কৃষক সঙ্ঘ গঠন করিতে হইবে, ডিস্ট্রিক্ট ও তালুক বোর্ড ম্যুনিসিপ্যালিটি ব্যবস্থাপক সভাসমূহে লোক প্রেরণ করিতে হইবে এবং এইরূপ অন্যান্য উপায় ও প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। এখন যে সকল রাষ্ট্রীয় সঙ্ঘ রহিয়াছে এই পার্টি তাহাদের সমবায়ে বা তাহাদিগকে বাদ দিয়া কাজ করিবে।

এই পার্টির একটি কেন্দ্র কার্য্যালয় থাকিবে, কার্য্যালয়ের কাজ চালানর জন্য বর্ত্তমানে এক বা দুইজন সেক্রেটারী থাকিবেন।

সম্মিলনের সভাপতি আগামী বর্ষে অন্য সম্মিলন হওয়া পর্য্যন্ত এই পার্টির সভাপতি থাকিবেন।

কেবলমাত্র কম্যুনিষ্টগণই এই পার্টির অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবেন। তাঁহাদিগকে পার্টির উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করার জন্য প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে হইবে।

কোন সাম্প্রদায়িক সভা বা সংগঠনের সভ্য এই পার্টির সভ্য হইতে পারিবেন না।

ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির কংগ্রেস বা সম্মিলনের অধিবেশন বৎসরে একবার করিয়া ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে হইবে।

এতদ্ব্যতীত···ও রীফবাসীগণের স্বাধীনতার সময়ের সহিত সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া সম্মিলন এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে।

ইংলণ্ডে যে সকল কম্যুনিষ্ট কারারুদ্ধ হইয়াছেন, সম্মিলন তাঁহাদিগকে সমবেদনা জানাইতেছেন এবং ইংলণ্ডের সরকারের এরূপ ব্যবহারের প্রতি বিরক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে। বৃটিশ পার্লামেণ্টের কম্যুনিষ্ট ও ভারতীয় সদস্য মিঃ সাকলাৎওয়ালাকে যে আমেরিকাতে যাইতে দেওয়া হয় নাই তৎপ্রতিও সম্মিলন বিরক্তি প্রদর্শন করিয়াছে।

নিম্নলিখিত ভারতীয় কম্যুনিষ্টগণের কারাবরণেও সম্মিলন সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়াছে ঃ—

১. মোহম্মদ আকবর খান, (১০ বৎসর, এখনো কারাগারে)। ২. গওহর রহমান, (২ বৎসর, পুরো খাটিয়া মুক্ত হইয়াছেন)। ৩. মিঞা আকবর শাহ, (২ বৎসর, পুরো খাটিয়া মুক্ত হইয়াছেন)। ৪. সৈয়দ মোহম্মদ হাবীব, (১ বৎসর, পুরো খাটিয়া মুক্ত হইয়াছেন)। ৫. আবদুল মজীদ, (১ বৎসর, পুরো খাটিয়া মুক্ত হইয়াছেন)। ৬. রফিক আহ্মদ, (১ বৎসর, পুরো খাটিয়া মুক্ত হইয়াছেন)। ৭. ফিরোজ দীন, (১ বৎসর পুরো খাটিয়া মুক্ত হইয়াছেন)। ৮. মোহম্মদ সুলতান, (১ বৎসর পুরো খাটিয়া মুক্ত হইয়াছেন)। ৯. শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে, (৪ বৎসর, এখনো কারাগারে)। ১০. মোহম্মদ সওকৎ উস্মানী, (৪ বৎসর এখনও কারাগারে)। ১১. নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, (৪ বৎসর পাকস্থলীতে সাংঘাতিক ক্ষত হওয়ায় ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে)। ১২. মজফ্ফর আহমদ, (৪ বৎসর যক্ষা রোগাক্রান্ত হওয়ায় ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে)। ১৩. মোহম্মদ শফীক্, (৩ বৎসর এখনো কারাগারে)।

লাঙল[৮৫] পত্রিকায় নজরুল ইসলামের একটি পত্র ছাপা হয়েছিল। ওই পত্রটি এখানে উদ্ধৃত হলো ঃ

'নজরুল ইসলামের পত্র

আমার প্রিয় ময়মনসিংহের প্রজা ও শ্রমিক ভ্রাতৃবৃন্দ।

আপনারা আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, আপনাদের এই নবজাগরিত প্রাণের স্পর্শে নিজেকে পবিত্র করিয়া লইব, ধন্য হইব। কিন্তু দৈব প্রতিকূল হওয়ায় আমার সে আশা পূর্ণ হইল না। আমার শরীর আজও রীতিমত দুর্বল, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার মত শক্তি আমার একেবারেই নাই। আশা করি আমার এই অনিচ্ছাকৃত অক্ষমতা সকলে ক্ষমা করিবেন। এই ময়মনসিংহ আমার কাছে নূতন নহে। এই ময়মনসিংহ জেলার কাছে আমি অশেষ গুণে ঋণী। আমার বাল্যকালের অনেকগুলি দিন ইহারই বুকে কাটিয়া গিয়াছে। এইখানে থাকিয়া আমি কিছুদিন লেখাপড়া করিয়া গিয়াছি। আজও আবার মনে সেইসব প্রিয় স্মৃতি উজ্জ্বল ভাস্বর হইয়া জ্বলিতেছে। বড় আশা করিয়াছিলাম, আমার সেই শৈশব-চেনা ভূমির পবিত্র মাটি মাথায় লইয়া ধন্য হইব, উদার হৃদয় ময়মনসিংহ জেলাবাসীর প্রাণের পরশমণির স্পর্শে আমার লৌহপ্রাণকে কাঞ্চনময় করিয়া তুলিব। কিন্তু তাহা হইল না,—দুরদৃষ্ট আমার। যদি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ দিন দেন, আমার স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাই, তাহা হইলে আপনাদের গফরগাঁওয়ের নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনীতে যোগদান করিয়া ও আপনাদের দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইব। আপনারাই দেশের প্রাণ, দেশের আশা, দেশের ভবিষ্যৎ। মাটির মায়ায় আপনাদেরই হৃদয় কানায় কানায় ভরপুর। মাটির খাঁটি ছেলে আপনারাই। রৌদ্রে পুড়িয়া বৃষ্টির জলে ভিজিয়া—দিন নাই রাত নাই—সৃষ্টির প্রথম দিন হইতে আপনারাইত এই মাটির পৃথিবীকে প্রিয় সন্তানের মত লালন পালন করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন —আপনাদের মাঠের এক কোদাল মাটি লইলে আপনারা আত্মীয়ের হয় শির লেন কিংবা তাকে শির দেন,-- এত ভালবাসায় ভেজা যাদের মাটি, এক বুকের খুনে উর্বর যে শস্যশ্যামল মাঠ, আপনারা আমার কৃষাণ ভাইরা ছাড়া তাহার অন্য অধিকার কেহ নাই। আমার এই কৃষাণ ভাইদের ডাকে বর্ষায় আকাশ ভরিয়া বাদল নামে তাদের বুকের স্নেহ ধারার মতই মাঠ ঘাট পাণিতে বন্যায় সয়লাব হইয়া যায়, আমার এই কৃষাণ ভাইদের আদরে সোহাগে মাঠ ঘাট ফুলে ফলে ফসলে শ্যাম সবুজ হইয়া উঠে। আমার কৃষাণ ভাইদের বধূদের প্রার্থনায় কাঁচা ধান সোনার রঙে রাঙিয়া উঠে,—এই মাঠকে জিজ্ঞাসা কর, মাঠ ইহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইবে,—এ মাঠ চাষার এ মাটি চাষার, এর ফুল ফল কৃষক বধূর।

আর আমার শ্রমিক ভাইরা, যাহারা আপনাদের বিন্দু বিন্দু রক্ত দান করিয়া হুজুরদের অট্টালিকা লালে লাল করিয়া তুলিতেছে, যাহাদের অস্থিমজ্জা ছাঁচে ঢালিয়া রৌপ্যমুদ্রা তৈরী হইতেছে, যাহাদের চোখের জল সাগরে পড়িয়া মুক্তা মাণিক ফলাইতেছে—তাহারা আজ অবহেলিত;

নিষ্পেষিত, বুভুক্ষু। তাহাদের শিক্ষা নাই, দীক্ষা নাই, ক্ষুধায় পেট পুরিয়া আহার পায় না, পরণে বস্ত্র নাই।

হায় রে স্বার্থ! হায় রে লোভী দানব প্রকৃতির মানব! আজ কৃষাণের দুঃখে শ্রমিকের কাৎরাণীতে আল্লার আরশ কাঁপিয়া উঠিয়াছে। দিন আসিয়াছে, বহু যন্ত্রণা পাইয়াছে ভাই—এইবার তাহার প্রতীকারের ফেরশ্‌তা দেবতা আসিতেছেন। তোমাদের লাঙল, তোমাদের শাবল, তাঁহার অস্ত্র, তোমাদের কুটীর তাঁহার গৃহ। তোমাদের ছিন্ন মলিন বস্ত্র তাঁহার পতাকা, তোমরাই তাঁহার পিতা-মাতা। আমি আপনাদের মাঝে সেই অনাগত মহাপুরুষের শুভ আগমন প্রতীক্ষা করিয়া আপনাদের নবজাগরণকে সালাম করিয়া নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি, ঐ বুঝি নব দিনমণির উদয় হইল। ইতি।'

সেদিন বিভিন্ন বাংলা পত্র-পত্রিকায় ছাপা হতো স্বদেশী আন্দোলনের কথা। তা' ছাড়া থাকতো, কোথায় কোন দেশকর্মী গ্রেপ্তার হলেন, তাঁদের সংবাদ। লাঙল[৮৬] পত্রিকায় প্রকাশিত এই ধরণের একটি সংবাদ এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

'গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী সোমবার রাত্রি ১১টার সময় হতে ৩টা পর্য্যন্ত গোয়েন্দা পুলিশের লোকেরা ৬০/১, বেনিয়াপুকুর রোডের বাড়ীখানা তল্লাসি করেছিল। কোনো আপত্তিজনক জিনিস পাওয়া যায় নি। তবে শ্রীহট্টের করিমগঞ্জ মহকুমার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র দাস ওরফে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে পুলিশের লোকেরা গেরেফ্‌তার করে নিয়ে গেছে। প্রকাশ, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র দাস মাণিকতলার বোমার মোকদ্দমার পলাতক আসামী। বেনিয়াপুকুরের এই বাড়ীতে মোহাম্মদ ইস্‌মাইল নামক যাদবপুর টেক্‌নিক্যাল ইনস্টিটিউটের একটি ছাত্র থাকে। এ ছাত্রটির বাড়ীও করিমগঞ্জ মহকুমায়। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র দাস ইহারই অতিথিরূপে ক' দিন থেকে এ বাড়ীতে বাস করেছিল।'

'গণবাণী' নিয়ে এর আগে আলোচনা করা হয়েছে। এই পত্রিকার ১ম খণ্ড, ১৬শ সংখ্যা, ২৬শে মে ১৯২৭, ১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪ তারিখের কাগজে উল্লেখ ছিল সম্পাদক হিসাবে দুজনের নাম ঃ মুজফ্‌ফর আহমদ, প্যারীমোহন দাস।

বর্তমানে বহু পাঠাগারে ঘুরলেও সেকালের অনেক বাংলা পত্র-পত্রিকার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। এই রকম একটি পত্রিকার নাম 'নওরোজ'। এই কাগজের বিজ্ঞাপন 'গণবাণী' ২৬শে মে, ১৯২৭, ১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪ সালের সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। বিজ্ঞাপনটি হলো এই ঃ

"নওরোজ

মুসলমান পরিচালিত প্রথম শ্রেণীর সচিত্র মাসিক পত্র। নওরোজ কার্য্যালয়, ৪৫বি, মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।'

'নওরোজ' প্রসঙ্গে 'গণবাণী'তে[৮৭] লেখা হয়েছিল: 'বাংলা মাসিক "নওরোজ" যে বের হবে তার বিজ্ঞাপন বিভিন্ন কাগজে সকলে পড়েছেন। সম্প্রতি এ কাগজের প্রথম সংখ্যা বাজারে বের হয়েছে। এর বার্ষিক মূল্য চার টাকা আট আনা, প্রতি সংখ্যা নগদ মূল্য ছয় আনা। কলিকাতা ৪৫বি, মেছুয়াবাজার স্ট্রীট হতে "নওরোজ" প্রকাশিত হয়েছে। এর সম্পাদকীয় ভার মোহাম্মদ আফ্জাল-উল-হক সাহেব গ্রহণ করেছেন। সাধারণত মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত মাসিকগুলি যেমন হয়ে থাকে "নওরোজ" তার গণ্ডী এড়িয়ে গেছে দেখে আমরা অতিশয় আনন্দিত হয়েছি। বর্ত্তমান সময়ে মুসলমানেরা যে দু' একখানা মাসিক চালাচ্ছেন তার প্রত্যেক খানাই গোঁড়ামীর সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি। এ কাগজগুলির বিশিষ্ট নীতি হচ্ছে মুসলমান ছাড়া আর কারো লেখা না ছাপানো। তার পরে, প্রবন্ধ নির্ব্বাচনে যে যোগ্যতার পরিচয় এসব কাগজে পাওয়া যায় তাতে এমন কথা কিছুতেই বলতে পারা যায় না যে কাগজগুলি সত্যকারভাবে সম্পাদিত হয়। এটা খুবই আশার কথা যে "নওরোজ" সম্পাদত হয়েছে এবং সম্ভবতঃ সুসম্পাদিতই হয়েছে। কাগজের ছাপা ও কাগজ ভালো। প্রচ্ছদপটখানা অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত ও মুদ্রিত হয়েছে।

এ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল ইস্লাম, অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ এবং আরো অনেকে লিখেছেন। বাঙালী মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত এ মাসিকখানা যদি স্বাধীন চিন্তাধারা প্রবাহিত করা একটা উৎসস্বরূপ হয় তাহলে বাস্তবিকই সেটা খুবই শ্লাঘার বিষয় হবে। "নওরোজ" এর চালকেরা তাঁদের পাঠক-পাঠিকাগণের সমীপে এই নিবেদন জানিয়েছেন যে তাঁরা যেন "জাগ্রত ও উন্মুক্ত চিত্ত লইয়া নওরোজের এই প্রয়াসকে প্রীতির চক্ষে দেখেন।" আমরা পাল্টা নিবেদন জানাচ্ছি যে, তাঁরাও যেন 'জাগ্রত ও উন্মুক্ত চিত্ত লইয়া" কাগজখানার পরিচালনা করেন।'

'গণবাণী', ২য় খণ্ড, ১৭শ সংখ্যা, ৪ঠা অক্টোবর, ১৯২৮, ১৮ই আশ্বিনের সংখ্যায় দু-জন সম্পাদকের নাম থাকতো: মুজফ্ফর আহ্মদ, কালীকুমার সেন। এই সংখ্যায় প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছিল, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা:

'গাও আলোকের জয়গান'।
'আঁধার-মলিন আলোক
ভিখারী প্রাণ।'

বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে 'ধূমকেতু' একটি পরিচিত নাম। 'ধূমকেতু' পত্রিকা সেদিন অসংখ্য পাঠকের মনে দাগ কেটেছিল। এই পত্রিকা প্রসঙ্গে কাজী আবদুল ওদুদ[৮৮] লিখেছেন:

'কুমিল্লা থেকে ফিরে এসে নজরুল ১৩২৯ সাল (১৯২২ খৃষ্টাব্দে)

৭ নং প্রতাপ চাটুজ্জে লেন থেকে অর্দ্ধ সাপ্তাহিক "ধূমকেতু" প্রকাশ করেন "ধূমকেতু" প্রকৃতপক্ষে হ'য়ে ওঠে বাঙলার নির্য্যাতিত সন্ত্রাসবাদী-দলের অগ্নিবাণীর বাহন। তিনি তাতে যে-সব সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তার কতকগুলি সংকলন করে "যুগবাণী", "রুদ্রমঙ্গল" ও "দুর্দ্দিনের যাত্রী" নামক তিনটি বই বের করা হয় ঃ

'ধূমকেতু' প্রসঙ্গে মুজফ্ফর আহ্মদ[৮৯] লিখেছেন ঃ

'১৯২২ সালের ১২ই আগষ্ট তারিখে নজরুল ইসলামের সপ্তাহে দুবার প্রকাশিত 'ধূমকেতু'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথমে ৩২, কলেজ ষ্ট্রীটের দোতলায় 'ধূমকেতু'র অফিস ছিল। পরে সেই অফিস ৭, প্রতাপ চাটুজ্জ্যে লেনের দোতলায় উঠে যায়। আমার ধারণা, থেমে-থাকা সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন 'ধূমকেতু'র লেখার ভিতর দিয়ে আবার মাথা তুলেছিল। ৭, প্রতাপ চাটুজ্জ্যে লেন স্থিত "ধূমকেতু" অফিসে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী নেতারা যাতায়াত করতেন। আমি দেখেছি বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় এসেও নজরুল ইসলামকে আলিঙ্গন করে গেছেন। ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত ও জীবনলাল চট্টোপাধ্যায় তো হামিশা আসতেনই।'

'ধূমকেতু'র প্রকাশক গ্রেপ্তারের সংবাদ ছাপা হয়েছিল সেদিন একটি বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রে। অর্থাৎ 'আনন্দবাজার পত্রিকায়[৯০]। সেই সংবাদটি হলো এই ঃ

'ধূমকেতু'র প্রকাশক গ্রেপ্তার

অর্দ্ধ সাপ্তাহিক বাংলা সংবাদপত্র ধূমকেতুর অফিস গতকল্য খানাতল্লাস হইয়া গিয়াছে। আফজল হক এই সংবাদপত্রের মুদ্রাকর ও প্রকাশক। প্রকাশ যে আনন্দময়ীর আগমন এবং বিদ্রোহীর কৈফিয়ৎ নামক দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশ করায় পুলিশ রাজদ্রোহের অপরাধে আফজলকে অভিযুক্ত করিয়াছে।'

'ধূমকেতু'র সংবাদ সেদিন ছাপা হয়েছিল দাদাঠাকুরের কাগজে। দাদাঠাকুর অর্থাৎ শরৎচন্দ্র পণ্ডিত, যিনি সব সময়. সব কথায় যেন রসের ফোয়ারা ছোটোতেন। দাদাঠাকুর[৯১] লিখেছিলেন ঃ

'গত বুধবার এই ঠিক বেলা দুপুরে, / পুলিশের হানা পুন "ধূমকেতু" উপরে। / "ভাব্বার কথা" কবে লিখিলেন তাই গো, / সম্পাদক বরে তার লাগিয়া যে চায় গো। / "নিশ্চিন্ত" হেডিং দিলে চিন্তা ছিলনা কিছু, / "ভাববার কথা"তেই ভাবনা পিছু পিছু।'

'ধূমকেতু'র আর একটি সংবাদে দাদাঠাকুর[৯২] লিখেছিলেন ঃ

'ধূমকেতু'র দ্বিতীয় চালক / শ্রীঅমরেশ কাঞ্জিলাল, / রাজদ্রোহ অপরাধে / হাজত ভুগে মাসেক কাল। / সম্প্রতি হয়েছে তাহার / অপরাধের রায় প্রকাশ,/ আঠার মাসের জন্য / সপরিশ্রম কারাবাস।'

দাদাঠাকুরের কাগজে[১৩] কাজী নজরুল ইস্‌লামের সংবাদ ছাপা হয়েছিল। দাদাঠাকুর কবিতায় লিখেছিলেন ঃ

'কাজী নজরুল ইস্‌লাম আরও কয়েকটি প্রাণী— / হুগলীর জেল-খানাতে ছেড়েছে দানাপানী। / কর্ত্তাদের ব্যবহারে অন্ন ছেড়েছে তারা— / মতলবটা বেরিয়ে যাওয়া ভেঙ্গে এই দেহ কারা। / মাসাধিক কেটে গেল আজও মরেনি কেহ, / ওজনে নজরুলের বার সের কমলো দেহ। / নিজে যে ছাড়লো দানা কে তারে ভাত ধরাবে ? / মুখেতে দেয়ও যদি বল কে কোঁৎ করাবে ? / যদি কও না খাইলে এরা যে প্রাণ হারাবে, / কয়েদী মরে যদি দেশের এক আপদ যাবে। / ধৃষ্টতা দেখ দেখি সম্পাদক মৃণাল বসুর, / কয়েদীর সঙ্গে দেখা। এটা কি নয়কো কসুর / বসুজার আবেদনে গবর্ণমেণ্ট হয়নি রাজি, / সরকারের কি আসে যায় না খেয়ে মরলে কাজী ?'

কাজী নজরুল ইস্‌লামের আর একটি সংবাদ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য়[১৪] ছাপা হয়েছিল। সংবাদটি এখানে উদ্ধৃত হলো ঃ

'ধূমকেতু--সম্পাদক কাজী নজরুল ইসলাম জেল আইন অমান্য করায় বহরমপুরের মহাকুমা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এন কে বসুর এজলাসে তাঁহার বিচার চলিতেছে। কতিপয় হিন্দু ও মুসলমান উকিল তাঁহার পক্ষে মোকদ্দমা চালাইতেছেন। আর কোনও অপরাধের জন্য তাঁহার শাস্তি না হইলে আগামী ১৫ই ডিসেম্বর বহরমপুরের জেল হইতে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইবে।'

দাদাঠাকুরের কাগজে[১৫] আর একটি সাময়িক পত্রের সংবাদ ছাপা হয়েছিল। দাদাঠাকুরের লেখাটি হলো এই ঃ

'বিদ্রোহ প্রবন্ধ এক 'মশ্লেম জগতে', / মহাম্মদ মৈনুদ্দিন খান— সম্পাদক, / প্রকাশ করিয়া রাজদ্রোহ অপরাধে, / দণ্ডাদেশ পাইলেন ছ' মাস ফাটক।'

'মশ্লেম জগত' ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা। এর অফিস ছিল—২১/১, এণ্টনি বাগান লেন, কলকাতা। কাগজ ছাপা হতো—'মোহম্মদী প্রেস', ২৯, আপার চিৎপুর রোড, কলকাতা। কাগজের সম্পাদক—মহাম্মদ মৈনুদ্দিন খান।

দাদাঠাকুরের[১৬] লেখায় সেকালের বিভিন্ন কাগজের সম্পাদকের কথা উল্লেখ আছে। এখানে দাদাঠাকুরের দুটি লেখা উদ্ধৃত হলো ঃ

(১)

'ডেপুটি কমিশনার, কিডের হাতে খেয়ে মার,
মূর্চ্ছাগত হেম নলিনী ঘোষ,
"সার্ভেণ্টের" সম্পাদক, আর তার প্রকাশক,
প্রকাশ করে করলে মহাদোষ।

প্রেসিডেন্সির আদালতে, মানহানির ধারামতে,
হাকিম হুকুম দিল তার—
এই রায়ে গেল জানা, পাঁচশো টাকা জরিমানা,
দণ্ডেতে দণ্ডিত এডিটার।
এ টাকা না দিলে পরে, ছয় মাস লাল-ঘরে,
করিতে হইবে তাঁরে বাস,
প্রকাশক প্রিণ্টার, পচাশ রুপেয়া তার,
বিকল্পে শ্রীঘর এক মাস।
হাইকোর্টে আপীলে দু-জনে দু-মত দিলে,
অন্য জজ করিল বিচার,
শুনিলাম তাঁর মতে নিম্নতন আদালতে,
অঙ্গহানি আছে মামলার।
প্রবাদ বচনে বলে, যদি হাকিম টলে,
হুকুম টলেনা কোন মতে,
আসামী নোটিশ পেয়ে আদালতে এলো ধেয়ে,
বাহাল রহিল রায় সেই,
হাকিমের কাজে ত্রুটি, ভুগিল আসামী দুটি,
এক মুরগী দু'বার জবাই।'

(২)

নায়ক নায়ক / পাঁচকড়ি বাবু, / প্রিণ্টার শশধর,
স্টেটস্ম্যানের / প্রিয়নাথ গুহ / তিন জনের উপর।
মানহানি কেস / করিয়াছে দায়ের / শ্রীযুত পৃথ্বীশ রায়,
এ তিনের নামে / হাকিম সাহেব / শমন দিলেন তায়,
'ক্ষিপ্ত কুকুর', / 'ঘৃণ্য শৃগাল', / 'বানর' বলিয়া তাঁরে,
এ আসামীগণ / করে মানহানি / অনর্থক বারে বারে।
বাদীর পত্নী, / কন্যাদিগকে / করিয়াছে আক্রমণ।
বাদীর অসহ্য / হইল এসব, / এ নালিশ সে কারণ,
আপোশ যদ্যাপি / না হয় মামলা / অন্য বারের মত,
কাজীর বিচারে, / কি যে হয় / তাহা হইবেন অবগত।

প্রসঙ্গপঞ্জী

১। অমরেন্দ্রনাথ রায়, স্বদেশ মঙ্গল।
২। যোগেশচন্দ্র বাগল, মুক্তির সন্ধানে ভারত।

৩। শঙ্করী প্রসাদ বসু, নিবেদিতা লোকমাতা, প্রথম খণ্ড, ১৯৭১, পৃঃ ৭৩১।
৪। শঙ্করী প্রসাদ বসু, পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃঃ ৪১৭।
৫। চন্দ্রাবতী, কালের কড়চা, পৃঃ ২৯
৬। James Campbell Ker, Political trouble in India, 1907-1917, (Foreward- Dr. Mahadevaprasad Saha), page 62.
৭। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্বাসিতের আত্মকথা, ৮ম, সংস্করণ, ১৩৭৫, ভূমিকা।
৮। বলাই দেবশর্মা, স্বদেশী আন্দোলনে সংবাদ পত্রের ভূমিকা, স্বস্তিকা বিপ্লবী স্মরণ সংখ্যা, ১৩৬৫।
৯। বলাই দেবশর্মা, পূর্বে উল্লিখিত পত্রিকা।
১০। স্বস্তিকা, বিপ্লবী স্মরণ সংখ্যা, ১৯৫৭।
১১। যোগেশচন্দ্র বাগল, মুক্তির সন্ধানে ভারত
১২। The Englishman, August 21, 1907
১৩। The Englishman, July 6, 1907
১৪। The Englishman, July 23, 1907
১৫। The Englishman, July 26, 1907
১৬। অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, মুক্তি কোন পথে, প্রথম ভাগ, (৬৮ পৃষ্ঠা + ২ পৃঃ বিজ্ঞাপন, যুগান্তর, স্বদেশী আন্দোলন, ছাত্র ভাণ্ডার জাতীয় স্বাধীনতা ইত্যাদি প্রসঙ্গে সংবাদ ছাপা হয়েছিল)।
১৭। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, নিবেদিতা লোকমাতা, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৬৯৪।
১৮। Dr. Tarasankar Banerji (Visva-Bharati University), The Growth of the Press in Bengal vis-A-vis, The Rise of Indian Nationalism (1858- 1905), The Indian Press, Edited by Dr. S. P. Sen, Institute of Historical Studies (1967), page 51.
১৯। প্রফুল্লকুমার সরকার, জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ।
২০। প্রফুল্লকুমার সরকার, পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থ।
২১। ঐ ঐ
২২। James Campbell Ker, Political Trouble in India, 1907—1917
২৩। যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, বিপ্লবীজীবনের স্মৃতি, পৃঃ ২২৪।
২৪। ” ” পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থ।
২৫। প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া, পৃঃ ১০৩।
২৬। ” ” পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃঃ ১০৭।
২৭। প্রবোধচন্দ্র সিংহ, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, পৃঃ ৮১।
২৮। ” ” পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃঃ ৮৩।

২৯। প্রবোধচন্দ্র সিংহ, পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থ পৃঃ ৮৪।
৩০। ঐ ঐ
৩১। সুকুমার দত্ত নবজীবন।
৩২। বিপিনচন্দ্র পাল, চরিত্র-চিত্র পৃঃ ২০২।
৩৩। বিপিনচন্দ্র পাল পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থ পৃঃ ২১০।
৩৪। The Englishman. September 24, 1907
৩৫। সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বাঙালীর রাষ্ট্র চিন্তা, (১৯৬৮). পৃঃ ১৯২।
৩৬। S. Natarajan, A History of the Press in India, (1962), page 173
৩৭। বিজলী, চতুর্থ বর্ষ ৩৭ সংখ্যা, ১৬ই শ্রাবণ ১৩৩১।
৩৮। " পূর্বে উল্লিখিত সংখ্যা।
৩৯। " ৪র্থ বর্ষ ২৩শে শ্রাবণ, ১৩৩১ ৩৮শ সংখ্যা।
৪০। " " ৩৯শ সংখ্যা ৩০শে শ্রাবণ ১৩৩১।
৪১। " পূর্বে উল্লিখিত সংখ্যা।
৪২। " ঐ
৪৩। " ঐ
৪৪। " ৪র্থ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা, ১৩ই ভাদ্র ১৩৩১।
৪৫। " " ৪২ সংখ্যা ২০শে ভাদ্র, ১৩৩১
৪৬। " পূর্বে উল্লিখিত সংখ্যা।
৪৭। " ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা ৯ই অগ্রহায়ণ ১৩২৮, ২৫মে নভেম্বর ১৯২১।
৪৮। বিজলী, পূর্বে উল্লিখিত সংখ্যা।
৪৯। " ১৬ই অগ্রহায়ণ ১৩২৮, ২রা ডিসেম্বর ১৯২১।
৫০। " ১৮ই মাঘ ১৩৩০, ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯২৪।
৫১। " ৩রা ফাল্গুন ১৩৩০, ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৪।
৫২। " ১০ই " " ২২শে " "
৫৩। " পূর্বে উল্লিখিত সংখ্যা।
৫৪। " ৪র্থ বর্ষ, ১৮শ সংখ্যা, ১লা চৈত্র ১৩৩০, ১৪ই মার্চ, ১৯২৪।
৫৫। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, তরী হতে তীর, (১৯৭৪), পৃঃ ৩০৯।
৫৬। মুজফ্ফর আমেদ, কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতি কথা (১৯৬৭), পৃঃ ১৭৭।
৫৭। Compiled in the Intelligence Bureau, Home Department, Govt. of India (1937), Terrorism in India - 1917-1936, Preface—J. M. Ewart, Director, Intelligence Bureau, Reprinted— 1974, page 15.

৫৮। আত্মশক্তি, ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, শুক্রবার, ১৬ই বৈশাখ ১৩৩৪. ২৯শে এপ্রিল ১৯২৭।
৫৯। আত্মশক্তি, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ২৩শে বৈশাখ ১৩৩৪, ৬ই মে ১৯২৭।
৬০। " " ৭ম সংখ্যা, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ " ২৭মে "
৬১। " পূর্বে উল্লিখিত সংখ্যা।
৬২। " ২০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪, ৩রা জুন ১৯২৭, ২য় বর্ষ ৮ম সংখ্যা।
৬৩। " পূর্বে উল্লিখিত সংখ্যা।
৬৪। " ৬ই শ্রাবণ ১৩৩৭. ২২শে জুলাই ১৯২৭।
৬৫। " পূর্বে উল্লিখিত সংখ্যা।
৬৬। সারথি, (সাপ্তাহিক) ১ম বর্ষ. ৩৫শ সংখ্যা, ২৮শে চৈত্র, বৃহস্পতিবার ১৩৩০ ১০ই এপ্রিল ১৯২৪।
৬৭। Sir Cecil Kaye, Communism in India, with unpublished documents from National Archives of India (1919—1924), Compiled and edited by Subodh Ray, with an introduction and explanatory notes by Mahadevaprasad Saha (1971), page 15.
৬৮। Sir Cecil Kaye. পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃঃ ১৬।
৬৯। ঐ ঐ পৃঃ ১৪১।
৭০। S. Natarajan, A History of the Press in India (1962), page 177
৭১। S. Natarajan, পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃঃ ১৯০।
৭২। আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবার ৬-১২-১৯৩১।
৭৩। " ১৬-১-১৯৩২।
৭৪। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, তরী হতে তীর, (১৯৭৪) পৃঃ ৪৪।
৭৫। সুপ্রকাশ রায়, 'ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, পৃঃ ৩৯৫।
৭৬। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন, (সুপ্রকাশ রায় লিখিত—'ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস' গ্রন্থের ভূমিকা)।
৭৭। মুজফ্ফর আহমদ, কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতি কথা, পৃঃ ৩৫৩।
৭৮। " পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃঃ ৩৫৩।
৭৯। " আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, পৃঃ ৫২৭।
৮০। G. Adhikari, Documents of the History of the Communist Party of India, vol. 2, 1923-1925, page 625.
৮১। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যাত্রী, (১৩৫৭), পৃঃ ১২২।
৮২। " , ঐ পৃঃ ১২৫।

৮৩। সুকুমার মিত্র, হেমন্তকুমার সরকার' প্রকাশিত হয় লেখা ও রেখা' পত্রিকায়। এই কাগজের সম্পাদক ঃ ভাস্কর মুখোপাধ্যায় (শান্তিপুর), চতুর্দশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৭, পৃঃ ৪২৯।
৮৪। লাঙল, প্রথম খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা বৃহস্পতিবার ৩০শে পৌষ ১৩৩২, পৃঃ ১৩।
৮৫। লাঙল, প্রথম খণ্ড পঞ্চম সংখ্যা বৃহস্পতিবার ৭ই মাঘ ১৩৩২, পৃঃ ১৩।
৮৬। " বৃহস্পতিবার, প্রথম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা ১৩ই ফাল্গুন ১৩৩২।
৮৭। গণবাণী, ৭ই জুলাই ১৯২৭, পৃঃ ১৩।
৮৮। কাজী আবদুল ওদুদ, নজরুল প্রতিভা, (১৯৪৯) পৃঃ ৩৯।
৮৯। মুজফ্ফর আহমদ, আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, পৃঃ ২৩৭।
৯০। আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ই নভেম্বর ১৯২২।
৯১। বিদূষক, ২৭ মাঘ ১৩২৯।
৯২। ঐ (তারিখ লিখতে ভুলে গিয়েছিলাম, এই কারণে উল্লেখ করতে পারলাম না।—বী. ব.)
৯৩। ঐ
৯৪। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১ ডিসেম্বর ১৯২৩।
৯৫। বিদূষক, ১ম বর্ষ, ১৮শ হর্ষ ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০, শনিবার।
৯৬। ঐ (তারিখ লিখতে ভুলে গিয়েছিলাম, এই কারণে উল্লেখ করতে পারলাম না।—বী, ব,)

৩ ॥ দাদাঠাকুরের 'বিদূষক'

বাংলা ১২৮৮ সালে ১৩ই বৈশাখ তারিখে পশ্চিমবাংলার এক মহান প্রতিভাশালী পুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল। ইনি দাদাঠাকুর অর্থাৎ শরৎচন্দ্র পণ্ডিত। ইনি কোন দিন পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে চান নি। কারো কৃপার ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল হয়ে থাকেন নি। তিনি ছিলেন সরল আদর্শ চরিত্রের মানুষ। তাঁর জীবনযাত্রা ছিল অনাড়ম্বর। তিনি মাত্র কয়েকটি টাকা সম্বল করে একটি ছোট ছাপাখানা করেছিলেন এবং পরে সাপ্তাহিক পত্রিকাও বের করেছিলেন। আজকের দিনে ওই সব কথা চিন্তা করলে আশ্চর্য মনে হয়। দাদাঠাকুরের 'বিদূষক' পত্রিকা বাংলা ১৩২৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। 'বিদূষক' কাগজে উল্লেখ থাকতো,—'ধামাধরা ও উদরপন্থীদিগের মুখপত্র'। ওই সময় কলকাতায় বিদূষকের আস্তানা ছিল—১৯৫ নং মুক্তারামবাবু স্ট্রীট। আট পৃষ্ঠার কাগজ নিয়ে

দাদাঠাকুর কলকাতার পথে পথে ঘুরে বিক্রি করতেন। তাঁর কাগজে ছাপা হতো কবিতা, ছোটগল্প বিভিন্ন সংবাদ এবং ব্যঙ্গচিত্র। দাদাঠাকুর ছিলেন এই পত্রিকার লেখক, সম্পাদক, কম্পোজিটর, মুদ্রাকর, প্রকাশক এবং তিনিই বিদূষকের হকার। মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জে তাঁর পণ্ডিত প্রেসে কাগজ ছেপে তিনি কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বিক্রি করতেন। তাঁর রচিত রঙ্গ ব্যঙ্গাত্মক কবিতা বিদূষকে প্রকাশিত হতো। ব্যঙ্গ কবিতার জন্য তাঁর কাগজ যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছিল। দাদাঠাকুর রচিত অসংখ্য রঙ্গ ব্যঙ্গাত্মক কবিতা, হাসির গান তাঁর সম্পাদিত 'বিদূষক' এবং 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য তিনি স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন।

দাদাঠাকুর ছিলেন নির্ভিক মানুষ। সমাজের দোষ-ত্রুটি নিঃসংকোচে প্রকাশ করিতেন। অন্যায় ব্যবহার ও অনাচারের তীব্র সমালোচনা করতেও তিনি ভীত হতেন না। বিদূষকের পৃষ্ঠায় আজও সেকালের বহু ঘটনা ছড়িয়ে আছে। বিশ্বের মহান বিপ্লবী লেনিনের সংবাদও তাঁর 'বিদূষক' কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। বিদূষকের একটি সংখ্যায় দাদাঠাকুব কবিতায় লিখেছিলেন ঃ

খবর এসেছিল আগে লেনিন / এবার বাঁচবে না।
বোধহয় তাহার পাকা ঘুঁটি / এবার আর কাঁচবে না।
কোষ্ঠী কেহ দেখেছ তার ? / নাই তাহাতে মৃত্যু যোগ, / এ সপ্তাহে খবর এলো, / লেনিন এখন মুক্ত রোগ।

সেকালের বহু ঘটনার উল্লেখ আছে তাঁর কবিতাগুলির মধ্যে। 'বিদূষক' ছোট্ট পত্রিকা হলেও এই কাগজ মারফৎ দাদাঠাকুর বাংলার অসংখ্য পাঠকের মন জয় করেছিলেন। দাদাঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 'জঙ্গিপুর সংবাদ' (সাপ্তাহিক সংবাদপত্র) আজও নিয়মিতভাবে রঘুনাথগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয়। এই সাপ্তাহিক সংবাদপত্র মুর্শিদাবাদ জেলার বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হিসাবে পরিচিত।

মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকবার গিয়েছি। জঙ্গিপুরেও কয়েকদিন ছিলাম। সারাদিন বিভিন্ন অঞ্চলে ও গ্রামে ঘুরে রাতে ফিরে আসতাম রঘুনাথগঞ্জের বাজারপাড়ার 'শ্রীহোটেলে'। ওই হোটেলে রাত কাটাতাম। হোটেলের সন্ধান দিয়েছিলেন অধ্যাপক নুরুল ইসলাম মোল্লা। হোটেলের কাছে সাইকেল রিক্সাওয়ালারা গাড়ী নিয়ে দাঁড়াতো। আমি প্রায় প্রতিদিন একটি রিক্সায় ঘুরতাম। এমন অনেকদিন কেটেছে, প্রায় ৫।৬ ঘণ্টা সময় কাটিয়ে, বহু গ্রামে ঘুরে ওই রিক্সায় ফিরেছি। সাইকেল রিক্সাওয়ালার সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব হয়েছিল। চলার পথে মাঝে মাঝে দুজনে কোন দোকানে বসে চা-মিষ্টিও খেতাম। একদিন কথা প্রসঙ্গে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, জঙ্গিপুরের নামকরা লোক বলতে কার নাম শোনা যায় ? বেশ

মনে আছে, জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুর। ফুলতলার মোড়ে একটি চায়ের দোকানের সামনে বেঞ্চিতে বসে আমরা গল্প করছিলাম। দু-জনের হাতে ছিল চায়ের গেলাস। রিক্সাওয়ালা চায়ের গেলাসে একটা চুমুক দিয়ে বলেছিল, জঙ্গিপুরের নামকরা লোক বলতে তিনজনকে বোঝায়। এক—নবাব সিরাজ, দুই—দাদাঠাকুর, তিন—ওস্তাদ ঝাক্সু। সে দিন আর কোন কথা হয়নি। দূরে যেতে হবে বলে রিক্সায় উঠতে হলো। কিন্তু ওর কথা আজও ভুলতে পারিনি। শুধু তাই নয়, একজন সাধারণ রিকসাওয়ালার চোখে সারা জেলা থেকে তিনজন মানুষকে চিহ্নিত করে রেখেছে। কলকাতায় ফিরে এসে বারে বারে এই কথা মনে হয়েছে। সাধারণ মানুষের মুখে গল্পের ভেতর বেঁচে থাকে জনশ্রুতি বা কিংবদন্তী; সাধারণ মানুষ ভালোবাসার প্রিয়জনকে বাঁচিয়ে রাখে গল্পে ও কিংবদন্তীর মধ্যে।

মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন অঞ্চলে আজ দাদাঠাকুর কিংবদন্তীর নায়ক। দাদাঠাকুর ছিলেন সাধারণ মানুষের আপনজন। এই কারণে জঙ্গিপুরের সাধারণ রিক্সাওয়ালা তাঁকে ভুলে যায়নি। দাদাঠাকুরের জীবনের নানা কথা আজও ছড়িয়ে আছে জঙ্গিপুরের সাধারণ মানুষের মুখে। তাঁর জীবনের কাহিনী নিয়ে সিনেমায় দেখানো হয়েছে। আমি ওসব নিয়ে কিছু আলোচনা করতে চাই না। আমি শুধু উল্লেখ করতে চাই, যে সময় সারা-দেশে সাম্প্রদায়িক বিরোধ ঘটিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা বাধাবার জন্য একশ্রেণীর লোক উঠে পড়ে লেগেছিল, ঠিক সেই সময় দাদাঠাকুর অর্থাৎ শরৎচন্দ্র পণ্ডিত হিন্দু-মুসলমানের মিলনের চেষ্টা করেছিলেন। সহজ-সরল যুক্তির ভেতর দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে তিনি কবিতায় মিলনের কথা ব্যক্ত করেছিলেন। প্রায় ওই সময়ের সাম্প্রদায়িক বিরোধের একটি চিত্র পাওয়া যায় অধ্যাপক ডক্টর অমলেন্দু দে[১] লিখিত গ্রন্থে। ডক্টর দে লিখেছেন: 'সাম্প্রদায়িক বিরোধ—১৯২৪ খৃীষ্টাব্দ থেকেই মসজিদের সামনে বাজনা, প্রকাশ্য স্থানে গরু কোরবানি, নারী নিগ্রহ, নদীর চর দখল করা, জমিদার মহাজনদের অত্যাচার ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে ক্রমান্বয়ে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক জটিলরূপ ধারণ করে। এই সময়ে পূর্ব ও পশ্চিম-বঙ্গের কয়েকটি স্থানে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের অবনতি হয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯০৫ সালে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, ওই সময় হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে প্রচণ্ডভাবে বিরোধিতা করেছিল।'

বিরোধের চিত্র যেমন ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলনের কথা আছে সেকালের গানে, কবিতায় ও অসংখ্য লেখার মধ্যে। শহরের নেতারা একটা উদ্দেশ্য নিয়ে দেশপ্রীতি ও দেশাত্ম-বোধের জন্য সাম্প্রদায়িক মিলনের বাণী প্রচার করেছিলেন। কিন্তু গ্রামের

পল্লী-কবিরা, বাউল, ফকির, মুস্কিল-আসান প্রভৃতি ভবঘুরের দল তাঁরা ওই সময় গান গেয়ে বলেছিলেন, ধর্মের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এই সুর, এই গান আজও বেঁচে আছে পশ্চিমবাংলার পল্লী কবিদের কণ্ঠে কণ্ঠে।

আগে উল্লেখ করা হয়েছে বাংলার পল্লীকবি বাউল, ফকির প্রভৃতি কোন ধর্মমতকে অগ্রাহ্য করেনি। যেমন সেকালের বিখ্যাত কবিওয়ালা হেন্সমান এণ্টনি গেয়েছিলেন :

খৃষ্টে আর কৃষ্টে ভিন্ন নাইরে ভাই। / শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে, / এও কোথা শুনি নাই। / আমার খোদা যে হিন্দুর হরি সে, / ঐ দ্যাখ শ্যাম দাঁড়িয়ে আছে, / আমার মানব জনম সফল হবে / রাঙা চরণ যদি পাই।

দাদাঠাকুরের লেখার মধ্যেও মিলনের কথা আছে। দাদাঠাকুরের[২] একটি কবিতা এখানে উদ্ধৃত হলো :

বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক ক্ষীরোদবাবু ; / নিজে খুব বিষ্ণুভক্ত / ইঁহার এক কন্যা তবু, / ইসলামের ধর্মগ্রহণ / করেছেন স্ব ইচ্ছাতে, / যে যাহা বলবে বলুক / মোদের নাই, দুঃখ তাতে। / ভক্তি ত নারায়ণে / না হয় আ-ল্লা ভজিবে / মজিত গীতা পাঠে / কোরাণে আজ মজিবে। / যেতো বৈ কুণ্ঠ পুরে / না হয় বে হেস্তে যাবে। / খাইত দেবের প্রসাদ / না হয় আজ সিন্নী খাবে। / মন্দিরে করতো পুজো / মসজিদে করবে নামাজ। / প্রাণের টান আটকাইতে / পারে কি হিন্দু সমাজ ? / 'বাবা' ডাকিত আগে / ডাকিবে 'বাপজী' বলে, / সাদী করিবে না হয়— / পরিণয়ের বদলে। / আগে জল বলতো যাকে / এখন তা বলবে 'পানী', / দিদিমা' বলতো যাকে, / না হয় আজ বলবে 'নানী'। / যাকে পাপ বলতো আগে / এখন তা' বলবে গোণা। / ঘুচিল পুনর্জন্ম / বার বার আনা গোনা। / হিন্দুদের ধর্ম চেয়ে / মুসলমান ধর্ম সোজা, / এ ধর্মে নাইকো জানি, / ত্রিশ কোটী দেবতা ভজা। / ইসলাম জানে না কিছু / একা সেই খোদা বিনে / যান এঁরা গ্রাণ্ড কর্ডে / চলে না লুপ লাইনে। / এরা যা' প্রকাশ্যে খায়, / তোমরা খাও লুকিয়ে জানি, / হিন্দু কেউ মশ্লেম হলে / কেন এ ছটফটানি ? / করিছ যাতাযাতি / হিন্দু আর মুসলমানে, / বিবাদ কি আছে কিছু / খোদা আর ভগবানে ?

পরিশেষে শুধু বলবো, দাদাঠাকুর ছিলেন একজন আদর্শ বাঙালী। দাদাঠাকুরের কোন ধর্মমতকে অগ্রাহ্য না করে, সহজ সরলভাবে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথা সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরেছিলেন।

প্রসঙ্গপঞ্জী

১। অধ্যাপক অমলেন্দু দে, বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ।

২। বিদূষক (তারিখ লিখতে ভুলে গিয়েছিলাম এই কারণে উল্লেখ করতে পারলাম না।—বী. ব.)

৪ ॥ সে দিনের পত্র-পত্রিকা

পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙতে চেয়েছিলেন সেকালের বিপ্লবীরা এই কারণে বিপ্লবী ও বিপ্লববাদের সমর্থকরা সেদিন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করে স্বাধীনতার বাণী প্রচারের চেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন। এক দিকে দেশের অসংখ্য মানুষ সেদিন প্রচণ্ড দারিদ্র্যের গুরুতর ও দুরূহ সমস্যায় বিপর্যস্ত হয়ে দিন কাটাতো, অন্যদিকে বিদেশী শাসন ভেঙে দিয়ে সুখী-ভারত গড়ে তোলার জন্য দেশকর্মীরা পত্র-পত্রিকার সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সেদিনের অধিকাংশ কাগজ আজ হারিয়ে গেছে।

'ধূমকেতু' নিয়ে আগে আলোচনা করা হয়েছে। এই কাগজ ১৯২২ সালে দাম ছিল এক আনা। 'হপ্তায় দু'বার করে দেখা দেবে' এই কথা লেখা থাকতো। সারথি—কাজী নজরুল ইসলাম। ছাপা হতো মেটকাফ প্রেসে, ৭৯ নং বলরাম দে স্ট্রীট, কলকাতা। কাগজে আরও উল্লেখ থাকতো: 'কলকাতার সব কাগজের চেয়ে বেশী কাটতি'। Printed & Published by Md. Afzulal Huque, 7, Pratap Chatterjee Lane, Calcutta.

'ধূমকেতু'[১] পত্রিকায় প্রকাশিত একটি লেখার কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো:

'বাঙ্গালার সাহিত্য-গগনে ধূমকেতুর আবির্ভাব হইয়াছে। সাহিত্যাকাশে ইহা প্রথম ধূমকেতু নয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে অন্যূন ৪০ বৎসর পূর্বে ফরাসী চন্দননগরে একবার সাপ্তাহিক "ধূমকেতুর" উদয় হইয়াছিল এবং গগনবিহারী ধূমকেতুর মত সে ধূমকেতু কয়েক মাস লোক চক্ষুর গোচর হইয়া আবার অদৃশ্য হইয়া যায়। সম্প্রতি যে ধূমকেতু দেখা দিয়াছে, তাহা চন্দননগরের সেই ক্ষুদ্র ধূমকেতু নহে। ইহা সম্পূর্ণ পৃথক। সুকবি কাজী নজরুল ইসলাম এই ধূমকেতুর সারথি।—হিতবাদী'

ধূমকেতু[২] পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের লেখা। লেখাটি এখানে উদ্ধৃত হলো:

'কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু / আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু, / আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু, / দুর্দিনের এই দুর্গশিরে / উড়িয়ে দে তোর

বিজয় কেতন। / অলক্ষণের তিলক রেখা / রাতের ভালে হোকনা লেখা, / জাগিয়ে দেরে চমক মেরে / আছে যারা অর্দ্ধচেতন।'

ধূমকেতু পত্রিকার ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯২২ সালের সংখ্যায় লিখেছিলেন বলাই দেবশর্মা, সরসীবালা বসু, শৈলেন্দ্রনাথ রায়, অমিয়বালা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ধূমকেতু[৩] পত্রিকায় সেকালের 'দেশের বাণী' প্রসঙ্গে ছাপা হয়েছিল ঃ

'দেশের বাণী নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা আমরা পেয়েছি। এ কাগজখানা নোয়াখালী কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে বের হয়েছে।

সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেছেন শ্রীযুত সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র ও শ্রীযুত উপেন্দ্রমোহন ঘোষ। কাগজখানার ছাপা ও লেখা বেশ সুন্দর হয়েছে। আমরা যতদূর জানি, মফস্বলে ছাপা হয়ে এমন সুন্দর কাগজ আর একখানাও বার হয়নি। "দেশের বাণী" কংগ্রেসের নির্দ্ধারিত মতেরই অনুসরণ করবে, "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'। কিন্তু ভাই, কংগ্রেস যে স্বরাজ চায় সে যে নিতান্তই লজ্জাকর স্বরাজ। ইংলণ্ডের অধীনে স্বায়ত্ব-শাসন লাভ করার জন্যই কি দেশে এত আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে? "দেশের বাণী" যদি তাই চায়, তা হলে সে তার···প্রচার করুক না কেন, "দেশের বাণী" কখনো প্রচার করতে পারেনা। দেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যাধীনে স্বায়ত্বশাসন কিংবা দেশের অত্যাচারী অভিজাত শ্রেণীর শাসন চায় না,—দেশ চায় দেশ জনসাধারণের শাসন। "দেশের বাণী" এই বাণী প্রচার করিতে পারবে কি?'

ধূমকেতু[৪] পত্রিকায় উল্লেখ ছিল ঃ

'এ সংখ্যায় নোয়াখালীর বিখ্যাত দেশ সেবক হাজী আবদুর রসীদ খানের ত্রয়োদশ বর্ষীয়া কন্যা রাজিয়া বেগম-এর লিখিত "প্রকৃত মুক্তি" শীর্ষক একটি কবিতা বের হয়েছে। ঐটুকু মেয়ের লেখা কবিতাটি তার দীপ্ত প্রাণশিখা ও তেজদীপ্তি সুন্দর ফুটে উঠেছে বলে সেটি এখানে তুলে দিলাম ঃ

প্রকৃত মুক্তি / মনুষ্যত্ব চির সত্য / সে যে চির অক্ষয়, / তাহারে খর্ব্ব করিতে যে চায় / তারই মর্য্যাদা হইবে ক্ষয়; / মানুষ মানুষ চিরদিন ভবে / মানুষ ত পশু নয়। / সত্যের তরে ফিরে দ্বারে দ্বারে / নিগ্রহ সয় করেনা ভয়, / মরিলেও তার অমর আত্মা / চিরদিন ভবে লভিবে জয়; / মানুষ মানুষ চিরদিন ভবে / মানুষ ত পশু নয়। / ভৌতিক দেহটা বন্দী করিয়া / এতই গর্ব্ব হয়? / ওরে ও পাগল খেয়ালের দাস / আত্মা মুক্ত রয়, / মানুষ মানুষ চিরদিন ভবে / মানুষ ত পশু নয়। / মুক্তির তরে মৃত্যু বরণে / তাহাতে আছে কি ভয়? / বিজয় লক্ষ্মী বীরের ললাটে / লিখিবে মৃত্যুঞ্জয়।'

'বাংলার বাণী' সাপ্তাহিক পত্রিকারূপে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হতো। এই কাগজের দাম ছিল প্রতি সংখ্যা এক আনা। সম্পাদক ছিলেন—নলিনীকিশোর গুহ। এই কাগজের ২য় বর্ষ, ২৫ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ৫ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার ১৩৩৬ সালে। এই সংখ্যায় ইহাও উল্লেখ ছিল ঃ

'Printed & Publishd by Jamini Mohan Pat, at the Kashi Printing Works, Banglabazar, Dacca'.

বাংলার বাণী' (সাপ্তাহিক), ৩য় বর্ষ, ১১ই আগষ্ট ১৯৩২, ২৬এ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার ১৩৩৯ সাল। এই কাগজের প্রতি সংখ্যার দাম ছিল এক আনা। প্রকাশিত হতো—জনসন রোড, ঢাকা থেকে। এই কাগজে উল্লেখ থাকতো ঃ

'Edited, Printed & Published by Baiid Kanti Bose, at the Associated Printing & Publishing Co. Ltd., 40, Katabazar, Dacca'.

বাংলার বাণী, ১৮ই আগষ্ট ১৯৩২ সাল, পৃষ্ঠা ৯০৬, প্রবন্ধ লিখেছিলেন ঃ

শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার ও শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্তী। বিষয় ঃ ইবসেন ও গলসোয়ার্দি। গল্প লিখেছিলেন—যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী, কবিতা—মিহিরকুমার বসু।

বাংলার বাণী[৫] পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। সংবাদটি হলো এই ঃ

'কারামুক্ত—১লা সেপ্টেম্বর সিরাজগঞ্জের সৈয়দ আসাদ উদ্দৌল্লা শিরাজী সাহেব অসুস্থ অবস্থায় বিনা সর্ত্তে কারামুক্ত হইয়াছেন। বর্তমানে তিনি ডাক্তার শ্রীযুত নীলরতন সরকার ও শ্রীযুত বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়ের চিকিৎসাধীনে থাকবেন। হাইকোর্টের বিচারে শিরাজী সাহেব ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহাকে 'এ' শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছিল। জেলগেটে কলিকাতার বিশিষ্ট কর্ম্মীবৃন্দ ও বহু আত্মীয়স্বজন তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন। তিনি কঠিন হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।'

'বরিশাল' পত্রিকা ছিল সাপ্তাহিক কাগজ। এই কাগজ ছাপা হতো বরিশালের 'অভ্যুদয়' প্রেস থেকে। সম্পাদক ছিলেন সুধীরকুমার দাশগুপ্ত। ইনি ছিলেন বরিশাল জেলাকংগ্রেস কমিটির সম্পাদক, কয়েকবার কারাবরণ করেন। এই কাগজে থাকতো বিপ্লবের জয়গান।

বরিশালের আর একটি কাগজে স্বদেশী আন্দোলনের জয়গান করা হতো। এই কাগজের নাম—'বরিশাল হিতৈষী'। ইহা ছিল সাপ্তাহিক কাগজ। এই কাগজ ছাপা হতো বরিশালের 'ন্যাশানাল মেশিন প্রেস' থেকে। এই কাগজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন—ললিতমোহন সেন, দুর্গামোহন সেন এবং আরও কয়েকজন দেশপ্রেমিকরা।

'বিকাশ' ছিল মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক ছিলেন ঃ পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস, কাগজ ছাপা হতো, কলিকাতা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬৫ নং সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা থেকে। এই কাগজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন নলিনীকিশোর গুহ ৮

'বীরভূম বাণী' ছিল সাপ্তাহিক কাগজ। ছাপা হতো বীরভূমের সিউড়ি থেকে। যে প্রেস থেকে কাগজ ছাপা হতো, এই প্রেসের নাম ছিল—'বাণী প্রেস'। সম্পাদক ছিলেন সুধাকান্ত রায়চৌধুরী। সেকালে বীরভূম জেলার নানা সমস্যা এই কাগজে লেখা হতো।

'জাগরণ' ছিল সাপ্তাহিক কাগজ। ছাপা হতো—সাধনা প্রেস, কুষ্টিয়া নদীয়া থেকে। সম্পাদক ছিলেন হেমন্তকুমার সরকার। ১৯২৩ সালে রাজদ্রোহের অভিযোগে তাঁকে আদালতে যেতে হয়েছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনে কারাবরণ করেন। সেকালের বিপ্লবীদের সঙ্গে হেমন্তকুমার সরকারের যোগাযোগ ছিল। ইনি ছিলেন বিদগ্ধ পণ্ডিত মানুষ। সুকুমার মিত্র[৬] হেমন্তকুমার সরকার প্রসঙ্গে লিখেছেন :

'পণ্ডিত ও দেশপ্রেমিক হেমন্তকুমার সরকারকে (১৮৯৪-১৯৫২) আমরা আজ ভুলে গেছি অথচ আমাদের জাতীয় জীবনে নতুন চিন্তাধারার উদ্বোধন যাঁরা করেছিলেন হেমন্তকুমার তাঁদের অন্যতম। অকৃতদার এই মানুষটি সহজলভ্য খ্যাতি ও সম্মানের পথ বর্জন করে দীর্ঘকাল দেশ সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের কর্মী হয়েও মেহনতী জনগণকে সংগঠিত ও উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে কংগ্রেসের অনীহা তাঁকে পীড়া দিয়েছিল। এর ফলে তিনি সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কৃষক আন্দোলনে অগ্রণী হয়েছিলেন। সম্ভবত এই কারণেই কংগ্রেস তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দেয়নি। অপরদিকে পুরোপুরি বামপন্থী মতবাদ গ্রহণ করতে না পারার জন্য বামপন্থীরাও তাঁকে সহজেই বিস্মৃত হয়েছেন।'

সুকুমার মিত্র[৭] আরও উল্লেখ করেছেন :

'কংগ্রেস নেতাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জমতে জমতে একদিন ফেটে পড়ল। হেমন্তকুমার কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। এই সময় সাম্যবাদী ভাবধারা দেশে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল এবং বাংলা দেশে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মুজাফ্ফর আহমদ, ধরণী গোস্বামী, গোপেন চক্রবর্তী, আবদুর রজ্জাক খাঁ, কাজী নজরুল ইসলাম, খ্যাতনামা লেখক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবী অতুল গুপ্ত, কুতবুদ্দীন আহ্‌মদ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কৃষক ও শ্রমিক সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

১৯২৫ সালে বীরভূম, হাওড়া ও বগুড়া জেলার প্রজা সম্মিলন, পূর্ববঙ্গ রায়ত সম্মেলন, ময়মনসিংহ শ্রমিক ও কৃষক সম্মেলন এবং গোয়ালন্দে বঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মৎস্যজীবী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অধিকাংশ সম্মেলনেই সভাপতিত্ব করেন হেমন্তকুমার। হেমন্তকুমারের উদ্যোগে নিখিল বঙ্গ মৎস্যজীবী সমিতি গড়ে ওঠে। এ ছাড়া তিনি নিখিল বঙ্গ প্রজা সম্মিলনীরও অন্যতম সংগঠক ছিলেন।'

আগে উল্লেখ করা হয়েছে, 'জাগরণ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন : হেমন্ত-কুমার সরকার। ১৮ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৬, বুধবার ইং ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯২৯ সালের কাগজে উল্লেখ ছিল :

প্রধান কার্যালয়, ৯৭ মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা—কুষ্ঠিয়া (নদীয়া)। প্রতি সংখ্যার মূল্য তিন পয়সা। জাগরণে লেখা হতো : 'সর্ব্বমানব আমার ভাই, তিন ভুবন আমার স্বদেশ।'

'জাগরণ'[৮] পত্রিকায় প্রকাশিত একটি লেখার কিছু অংশ হলো এই :

'সাহিত্যে ছোটলোক

ইতিহাস যেমন জন কয়েক রাজ-রাজড়ার জীবন কথা নিয়ে আলোচনা করে—আমাদের সাহিত্যেও সেইরূপ সমাজের উচ্চ সম্প্রদায় সমূহের জীবন-কথার মধ্যেই আবদ্ধ আছে। বর্ত্তমানে প্রচলিত যে ধরন আছে, তাহাতে জাতীয় ইতিহাস লেখা হয় না। গোটাকতক রাজার নাম কিম্বা কয়েকটা তারিখের টুকরো এক জায়গায় গেঁথে দিলেই জাতির ইতিহাস হয় না।'

'দীপিকা' পত্রিকা প্রকাশিত হতো কুষ্ঠিয়া (নদীয়া) থেকে। এই কাগজের মলাটে লেখা থাকতো- 'নদীয়া জেলার শ্রেষ্ঠ সাপ্তাহিক পত্রিকা'। প্রতি সংখ্যার দাম ছিল দু-পয়সা। ২৩শে কার্ত্তিক, বুধবার ১৩৪৫, ৯ই নভেম্বর ১৯৩৮ সালের সংখ্যায় উল্লেখ ছিল : ৭ম বর্ষ, ২৯ সংখ্যা। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন গোপীপদ চট্টোপাধ্যায়। কাগজ ছাপা হতো—কুষ্ঠিয়া নিম্বসার প্রেসে। রমেশচন্দ্র বিশ্বাস কর্ত্তৃক কাগজ মুদ্রিত হতো।

'নারায়ণ' ছিল মাসিক পত্রিকা। ১৯২১ সালে সম্পাদক ছিলেন—চিত্তরঞ্জন দাশ। ওই সময় কাগজ প্রকাশিত হতো—৭৯ নং বলরাম দে স্ট্রীট, কলিকাতা থেকে।

'প্রবাসী' (মাসিক পত্রিকা) সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ১৯২১ সালে প্রকাশিত হতো—২১১ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট কলকাতা থেকে। প্রতি সংখ্যা কাগজের দাম ছিল ছয় আনা। কয়েক বছর পরে প্রবাসী অফিসের ঠিকানা : ৯১ নং আপার সার্কুলার রোড, কলকাতা। এই বাড়ীতে অফিস এবং প্রেস ছিল।

সেকালে বহু বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং দেশকর্মী প্রবাসী অফিসে যেতেন। শান্তাদেবী[৯] লিখেছেন :

'দাসী ও প্রদীপ ছেড়ে দেবার পর বাংলা ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসে এলাহবাদের ২।১ সাউথ রোডের বাসাবাড়ী হতে রামানন্দ প্রথম "প্রবাসী" প্রকাশ করেন।'

'প্রবাসী' পত্রিকা সম্বন্ধে অধ্যাপক হুমায়ুন কবির[১০] লিখেছেন :

'প্রবাসীর সে যুগের সম্পাদকীয় রচনায় সাহস ছাড়াও প্রতি ছত্রে স্বচ্ছ

বুদ্ধির পরিচয় মিলত। সংস্কার ও পূর্ব্ব-সিদ্ধান্ত থেকে মুক্ত হতে না পারলে বুদ্ধি স্বচ্ছ হতে পারে না। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যে যে প্রাঞ্জলতার পরিচয় মিলত, তারও মূলে তাঁর স্বচ্ছ বিচারবুদ্ধি।'

হুমায়ুন কবির[১১] আরও উল্লেখ করেছেন ঃ

'মাসিক হয়েও প্রবাসী সে যুগে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন প্রশ্নে যে ভাবে জনমত গঠন করেছে, বহুক্ষেত্রে বিদেশী সরকারকে অনুসৃত নীতি বদলাতে বাধ্য করেছে, সরকারের অন্যায় আদেশ অথবা জনতার হুজুগ এবং সাময়িক উত্তেজনার বিরুদ্ধে দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ করেছে, আজকাল তা বিশ্বাস করাও কঠিন। বোধহয় এই সমস্ত গুণের জন্যই রবীন্দ্রনাথ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে বন্ধু বলে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর পত্রিকায় নিজের শ্রেষ্ঠ রচনা প্রকাশ করে তাকে গৌরবান্বিত করেছিলেন।'

'বেণু' ছিল মাসিক পত্রিকা। ১৩৩৮ সালে সম্পাদক ছিলেন—প্রসন্নকুমার পাল। ওই সময় বেণু কার্যালয় ছিল ৪৬ নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা। প্রতি সংখ্যা 'বেণু' কাগজের দাম ছিল চোদ্দ পয়সা, বার্ষিক আড়াই টাকা। বেণু ছাপা হতো—বাসন্তী প্রেসে, ৪৩এ, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা। বেণু পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের—'বিপ্রদাস' প্রকাশিত হয়েছিল।

ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়[১২] লিখেছেন ঃ

'১৯২৬ সনের এক অপরাহ্ন। বোধ হয় শ্রাবণ মাস। আমি "বেণু" অপিসে বসে কাজ করছি। বেণু-অপিস তখন ৯৩।১।এফ, বৈঠকখানা রোড।'

ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়[১৩] আর এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন ঃ

'১৯২৭ সাল। "বেণু"-পত্রিকার আপিস তখন ৯৩।১।এফ, বৈঠকখানা রোডের ত্রিতল বাড়িতে। দীনেশ কলকাতা এসেছেন। মে কি জুন মাসের এক দুপুর। বন্ধুদের সেকালে কলকাতার শহরে জমাট আড্ডা জমত বেণু-অপিসে।'

১৯২৭ সালে একটি শ্রমিক ইউনিয়নের মুখপত্র রাজদ্রোহের অভিযোগে জড়িয়ে পড়েছিল। ওই সময়ের দৈনিক পত্রিকা 'বাঙ্গলার কথা'[১৪] থেকে সংবাদ উদ্ধৃত হলো ঃ

'লাল পল্টন—সম্পাদক গ্রেপ্তার

রাজদ্রোহের অভিযোগ

কলিকাতা সি. আই. ডি. ইনসপেক্টর গিরিজাশঙ্কর রায় মঙ্গলবার ই. আই. রেলওয়ে শ্রমিক সমিতির মুখপত্র "লাল পল্টন" অফিসে খানাতল্লাস এবং "লাল পল্টনে"র সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে রাজদ্রোহের অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করেন। গত ১৬ই ডিসেম্বর "লাল পল্টন" পত্রে প্রকাশিত "ধিক গভর্ণমেন্ট" শীর্ষক

এক প্রবন্ধ সম্পর্কে এই অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছে। সম্পাদককে এক শত টাকা জামিনে খালাস দেওয়া হইয়াছে।'

১৯২৯ সালে কুষ্টিয়া থেকে 'আজাদ' নামক একটি বাংলা সাপ্তাহিক কাগজ বের হতো। ওই কাগজ নিয়ে একটি সংবাদ সেকালের 'বাঙ্গলার কথা'[১৫] সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই লেখাটি হলো এই :

'আজাদ সম্পাদক গ্রেপ্তার

প্রেস ও অফিসে পুলিশের হানা, রাজদ্রোহের অভিযোগ।

কুষ্টিয়া, ৭ই এপ্রিল, গতকল্য অপরাহ্ন ৫টার সময় এক সঙ্গে "আজাদ" নামক একটি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্রের আফিস ও প্রেসে এবং সম্পাদক মৌলভী আফসার উদ্দীনের বাড়ীতে এবং ডাঃ সদরুদ্দিনের বাড়ীতে পুলিশ হানা দেয়। "বাঙ্গালা মুসলমান ও প্রাথমিক শিক্ষা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ সম্পর্কে ১২ই তারিখের কয়েকখানা "আজাদ" পুলিশে লইয়া গিয়াছে। সম্পাদককে ১২৪ক ধারা অনুযায়ী গ্রেপ্তার করিয়া জামিনে খালাস দেওয়া হইয়াছে। মুদ্রাকর কাবলুদ্দিন আহম্মদের উপরও ওয়ারেন্ট জারি হইয়াছে।'

কুষ্টিয়ার 'আজাদ' ছিল স্থানীয় মুসলমান সমাজের কাগজ। কুষ্টিয়ার 'আজাদ' কাগজ প্রসঙ্গে কলকাতার দৈনিক সংবাদ পত্র 'বাঙ্গলার কথা'[১৬] মন্তব্য করেছিল :

'আজাদ সম্পাদকের দুর্ভাগ্য। কুষ্টিয়ার মুসলমান সমাজের মুখপত্র "আজাদ" পত্রিকার সম্পাদক মৌলভী আফসার উদ্দীন আহম্মদকে পুলিশ গত শনিবার গ্রেপ্তার করে। তিনি জামিনে মুক্ত আছেন। "আজাদ" কার্য্যালয়ে এবং ডাঃ সদরউদ্দীন আহম্মদের কুষ্টিয়ার বাসাবাটীতে পুলিশ খানাতল্লাসী করে। ডাঃ সাহেব সম্পাদকের ভ্রাতা। প্রকাশ ১২০এ ধারায় পুলিশ কর্তৃক সম্পাদকের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচারের অভিযোগ আনা হইয়াছে। পক্ষান্তরে কোন পুলিশ কর্ম্মচারীর সরকারী কর্ত্তব্য বিষয়ে ব্যক্তিগত মানহানী জনক উক্তি করা না কি এই মামলা দায়ের হইয়াছে বলিয়া শুনা যাইতেছে।'

'বাঙ্গলার কথা'[১৭] সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল ওই কাগজের রাজদ্রোহ মামলার সংবাদ। সংবাদটি হলো এই :

'বাঙ্গলার কথা—রাজদ্রোহ মামলা

সোমবার রায় প্রকাশ হইবে

গত বৃহস্পতিবার "বাঙ্গলার কথা" রাজদ্রোহ মামলার শুনানী শেষ হইয়া গিয়াছে। আগামী সোমবার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট রায় প্রকাশ করিবেন।

"বাঙ্গলার কথা"র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুত সত্যরঞ্জন বক্সী ও মুদ্রাকর শ্রীযুত সত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৫ক ধারা অনুসারে

(রাজদ্রোহ) চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর নিকট লিখিত পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর একখানা চিঠির উপর মন্তব্য প্রকাশ করিয়া একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য লেখার জন্যই এই অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছিল।'

এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, 'বাঙ্গলার কথা' ছিল দৈনিক সংবাদ পত্র। সম্পাদক ছিলেন—গোপাললাল সান্যাল। ইহা ১৯২৯ সালের কথা। কাগজের দাম ছিল প্রতি সংখ্যা দুই পয়সা। ফরওয়ার্ড পাবলিশিং লিমি-টেডের পরিচালকরা কাগজ চালাতেন। ১৯ নং বৃটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট, কলকাতা থেকে কাগজ বের হতো। ওই সময় দৈনিক সংবাদ পত্র—'বঙ্গবাণী' প্রকাশিত হতো। 'বঙ্গবাণী' প্রকাশিত হতো ১৯ নং বৃটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট থেকে। এই সংবাদ পত্রেরও সম্পাদক ছিলেন—গোপাললাল সান্যাল। একই ঠিকানা থেকে সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি' প্রকাশিত হতো। 'আত্মশক্তি' পত্রিকার কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

সা'দত আলি আখন্দ স্বদেশী আন্দোলনের সময় কলকাতার পুলিশে চাকরি করতেন। তাঁর লেখায় সেকালের বিপ্লবীদের কথা এবং বিপ্লবী-দের পত্র-পত্রিকার নাম উল্লেখ আছে। সা'দত আলি আখন্দ[১৮] লিখেছেন :

'...ছুটিছাটার দিনে কলেজ-স্কোয়ারে বিকেল বেলা বেড়াতে যেতাম। কখনো কখনো খোকা সংগে যেত। ব্যারাক থেকে বেশীদূর নয় সর্ট বয়ে গেলে। ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটের উত্তর দিকে সরস্বতী প্রেসের দরজা ঘেঁসে রাস্তা। সরস্বতী প্রেসের নাম তেরো নম্বরের সকলের কাছেই সুপরিচিত। সে যুগের যুগান্তর পার্টির মিলন মন্দির, কতোবার যে সার্চ হয়েছে তার ইয়ত্তা নাই।'

সা'দত আলি আখন্দ[১৯] আর এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন :

'লোকটা বাউণ্ডুলে। খিদিরপুরের সারেং সুখানীদের মধ্যে থাকে। ওদের মধ্যে অনেক ভাই বেরাদের কাছে। কিছুদিন আগেই খিদিরপুর ডক্ ওয়ার্কর্স ইউনিয়ন গড়ে তুলে চেয়ারম্যান সেজেছে। লেখার অভ্যাস আছে। মেহনতি মজুরের দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখ নিয়ে প্রবন্ধ লেখে, কবিতাও ছাপায়। সারেং সুখানীরা পড়ে খুব আনন্দ পায়, তার কবিতা সুর করে পড়ে। সেগুলো ছাপা হয় পয়সা সংস্করণ সাপ্তাহিক "শ্রমিক সমাচার", "ম্যায় ভুখা হুঁ", "চাবুক" প্রভৃতি কাগজে। এই কাগজগুলোর পরিচালক হচ্ছে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেকার যুবকেরা। এরা কাগজে মে-ডে উপলক্ষে ব্যানার হেডিং দিয়ে ছাপায়—"দুনিয়ার মজুর এক হও", হপ্তায় হপ্তায় মনুমেণ্টের পদদেশে মজুরদের মিটিং ডাকে এবং গলা ফাটিয়ে বক্তৃতাও দেয়।'

প্রসঙ্গপঞ্জী

১। ধূমকেতু, প্রথম বর্ষ ১২শ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৯ই আশ্বিন ১৩২৯, ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯২২।
২। ধূমকেতু, পূর্বে উল্লিখিত সংখ্যা।
৩। ঐ ঐ
৪। ঐ ঐ
৫। বাংলার বাণী ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৩২।
৬। সুকুমার মিত্র, 'হেমন্তকুমার সরকার', লেখা ও রেখা' বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৭ পৃঃ ৪২০ এই কাগজের সম্পাদক: ভাস্কর মুখোপাধ্যায় (শান্তিপুর)।
৭। সুকুমার মিত্র, পূর্বে উল্লিখিত পত্রিকা, পৃঃ ৪২৮।
৮। জাগরণ, ১৮ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৬, ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯২৯।
৯। শান্তা দেবী প্রবাসীর কথা প্রবাসী ষষ্টি বার্ষিক স্মারক গ্রন্থ, ১৩৬৭, পৃঃ ৩২।
১০। হুমায়ুন কবির প্রবাসী ষাট বৎসর পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থ পৃঃ ২৩।
১১। ঐ পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থ।
১২। ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, সবার অলক্ষ্যে, দ্বিতীয় পর্ব পৃঃ ২৫০।
১৩। ঐ ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব ১৩৭৭ পৃঃ ৩২২।
১৪। বাঙ্গলার কথা ১০ এপ্রিল ১৯২৯।
১৫। ঐ ৯ ঐ
১৬। ঐ ১০ ঐ
১৭। ঐ ১৩ ঐ
১৮। সা'দত আলি আখন্দ তের নম্বরে পাঁচ বছর, পৃঃ ৬২।
১৯। ঐ পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃঃ ৮৯।

৫ ॥ স্বাধীনতা আন্দোলনে চট্টগ্রামের দু'টি সংবাদ পত্র

প্রতিদিনের ছোট ও বড় ঘটনা সংবাদ পত্রে এবং সাময়িক পত্রে ছাপা হয়। কিন্তু ওই সব বাস্তব জীবনের কাহিনী জড় করে লেখা হয় ইতিহাস। দেশের ইতিহাস ও দেশবাসীর ইতিহাস লেখার সময় প্রয়োজন হয় খবরের কাগজের এবং সাময়িক পত্রের। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় যে সব পত্র-পত্রিকার সম্পাদকেরা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে লেখনী ধরেছিলেন, তাঁদের অধিকাংশ কাগজ আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

যাঁরা সেদিন এগিয়ে চলার বাণী প্রকাশ করে ছিলেন, তাঁদের অনেকের কাগজ আজ হারিয়ে গেছে। যে সব সাংবাদিক সেদিন বিপ্লবীদের প্রাণের বার্তাকে দেশবাসীর কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন, সেই সব লেখা আজও অজ্ঞাত রয়ে গেছে।

পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙতে চেয়েছিলেন সেকালের বিপ্লবীরা। এই কারণে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হয়েছিল। বিপ্লবী ও বিপ্লববাদের সমর্থকরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করতে চেয়েছিলেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় চট্টগ্রামের ছাত্ররা কলেজের দেওয়ালে মুক্তির বাণী প্রচার করেছিলেন। তার পরিচয় পাওয়া যায় সেকালের একটি সাময়িক পত্রে। সাময়িক পত্রের নাম 'পঞ্চপুষ্প'[১]। ওই কাগজ থেকে সংবাদটি উদ্ধৃত হলো ঃ

'চট্টগ্রাম কলেজ

কলেজ গাত্রে বিপ্লবমূলক ছড়া লিখবার অপরাধে চট্টগ্রাম কলেজের প্রথম বার্ষিক "এ" বিভাগের ছাত্রগণের জন প্রতি তিন টাকা করিয়া জরিমানা করা হইয়াছে। অপরাধী বাহির করিতে পারে নাই বলিয়া ছাত্রদের এই দণ্ড!

ছাত্রগণ গোয়েন্দা নহে। কলেজে প্রতি শ্রেণীতে অসংখ্য ছাত্র রহিয়াছে। কে কি করে,, জানা অতি দুষ্কর! এই দণ্ডে নির্দোষ ছাত্রমাত্রেই কলেজ পরিচালকবর্গ তথা গভর্ণমেন্টের প্রতি ক্ষুব্ধ হইয়াছে। যাঁহাদের উপর কলেজ পরিচালনার ভার রহিয়াছে, তাঁহাদের ইহা ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল।'

চট্টগ্রাম থেকে বিভিন্ন সময়ে ছোট ছোট কয়েকটি কাগজ, স্বদেশী ইস্তাহার বেরিয়েছিল। ওই সব কাগজ কোন রকম ডিক্লারেশন না নিয়ে ছাপা হয়েছিল। গোপনে বিপ্লবীদের কাছে কাগজগুলি পাঠানো হতো। কাগজের নাম ছিল মশাল; ঝর্ণা, সংগ্রাম প্রভৃতি। 'সংগ্রাম' ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৩৯ সালের কাগজ ইংরেজ সরকারের চোখে ১৯৪০ সালে বে-আইনী কাগজরূপে রাজরোষে পড়েছিল।

১৯২৩ সালে চট্টগ্রাম থেকে ছাপা হতো 'জ্যোতি' পত্রিকা।

এই পত্রিকা অফিসে পুলিশের হামলা হয়েছিল। তার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতার দৈনিক সংবাদ পত্র 'বঙ্গবাণী'[২] কাগজে। সংবাদটি হলো এই ঃ

'জ্যোতিঃ' অফিসে খানাতল্লাস।

পুলিশ কর্তৃক পোষ্টার ও হ্যাণ্ডবিল গ্রহণ,

১২৪ (ক) ও প্রেস আইন মতে পরোয়ানা।

চট্টোগ্রাম ৫ই মে অদ্য অপরাহ্ন সাড়ে ৪ ঘটিকার সময় এক জন সার্জেন্ট ও ৫০ জন রেগুলেশন লাঠিধারী কনেষ্টবল সহ স্থানীয় পুলিশ দৈনিক

জ্যোতিঃ পত্রিকার অফিসে হানা দেয় এবং একখানা বাঙ্গালা পোষ্টার ও 'আসুন তরুণগণ" শীর্ষক একখানি হ্যাণ্ডবিল লইয়া যায়। পোষ্টার-খানিতে বৈদেশিক শাসনের বেদনার কথা লিখিত ছিল এবং তরুণদিগকে যুব সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল। সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দাস ইনি আগামী জেলা সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিও হইয়াছেন। অসুস্থ সত্ত্বেও খানাতল্লাসের সংবাদে অফিসে আইসেন। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারা এবং প্রেস ও পুস্তক রেজিস্ট্রেশন আইনের ৩ ১২ ধারা অনুসারে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট খানাতল্লাসী পরোয়ানা বাহির করিয়া ছিলেন। উক্ত পরোয়ানা বলেই এই খানাতল্লাস হইয়াছে। এখন পর্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

—এ. প্রেস।'

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, 'জ্যোতিঃ ছিল দৈনিক সংবাদ পত্র। শোনা যায়, ১৯২৪ সালে প্রায় দু-হাজার কপি বিক্রি হতো। সম্পাদক ছিলেন মহিমচন্দ্র দাস। ইনি যাত্রামোহন দাসের পুত্র। মহিমচন্দ্র দাস লিখেছিলেন 'জাতের বজ্জাতি' নামক একটি বই। বইয়ের দাম ছিলঃ চার আনা। এঁকে চট্টগ্রামবাসীরা বলতেনঃ চট্টলগৌরব মহিমচন্দ্র দাস। 'জ্যোতি' সংবাদ পত্র ছাপা হতো চট্টগ্রামের সদর ঘাটের 'দেবদূত' প্রেস থেকে। কাগজ ছাপতেন—বিপিনচন্দ্র দত্ত। প্রকাশক ছিলেনঃ জ্যোতিশচন্দ্র বর।

চট্টগ্রামের বহুল প্রচারিত সংবাদ পত্র ছিল 'পঞ্চজন্য'। এই কাগজ দৈনিক প্রকাশিত হতো। 'পঞ্চজন্য' ছিল বাংলার মফঃস্বলের একমাত্র দৈনিক সংবাদ পত্র। ১৯৩০ সালে নিয়মিতভাবে দৈনিক আত্মপ্রকাশ শুরু করে। সম্পাদক ছিলেনঃ অম্বিকাচরণ দাস। প্রতিদিনের 'পঞ্চজন্য' কাগজে থাকতো সারাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সংবাদ। বিপ্লবীদের কথা। দেশ নেতাদের ছবিও ছাপা হতো। মাঝে মাঝে প্রকাশিত হতো 'পঞ্চজন্য' বিশেষ সংখ্যা। পঞ্চজন্য[৩] বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল একটি কবিতা। কবিতা লিখেছিলেন—কুমারী মতিপ্রভা দেবী। কবিতাটি হলো এইঃ

॥ নয়নে জাগিল দু' ফোঁটা জল ॥

তুচ্ছ সুখের লাগিয়া— / ব্যথিত হিয়া, / মথিত করিয়া / অশ্রু রয়েছে জাগি। / জীবনের পথে কত অকারণে, / মিথ্যা ব্যথার অলীক স্বপনে / নিলাজ হৃদয় ব্যথার দহনে / জেগেছে সকাল সাঁঝ / (তাই) মনে পাই বড় লাজ। / দেশ জননীর দুর্ব্বার ব্যথা, / বুকের পাঁজরে হয়নিকো গাঁথা, / হয় নাই লিখা তাহাদের কথা— / (যারা) নিজেরে করিয়া নাশ— / বুকের তপ্ত শোণিতে লিখিল জাতির ইতিহাস। / তাই বুঝি আজ হৃদয় গগনে / সহসা জাগিল ব্যথায় বাদল / পরাণ উঠিল ব্যথায় গুমরি, / নয়নে জাগিল দু' ফোঁটা জল।'

'পঞ্চজন্য' কাগজের বিশেষ সংখ্যায় লিখেছিলেন—মহিমচন্দ্র দাস। তা' ছাড়া ওই বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল: 'চট্টোগ্রামের কাগজের কল',—করুণাকুমার সেন; 'রুষীয় ঋষি টলষ্টয়' প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—হরিকৃপা বর্ম্মচৌধুরী, 'বিশ্বশক্তির পূজা'—অক্ষয়চন্দ্র সরকারের লেখা, 'দরদী'—দয়ানন্দ চৌধুরী, 'অর্থকরী শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা',—নগেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত, 'শ্রমিক প্রশস্তি' কবিতা লিখেছিলেন—বিভূতি ভূষণ চৌধুরী, তা' ছাড়া ছাপা হয়েছিল: 'চট্টগ্রাম সরকারী অস্ত্রাগার আক্রমণের মামলার' সংবাদ। কাগজ ছাপা হয়েছিল: 'দি চিটাগং প্রিন্টিং এন্ড পাব্লিশিং হাউস লিঃ প্রেস থেকে। বিশেষ সংখ্যার দাম ছিল তিন আনা। বিপ্লবী অনন্ত সিংহ লিখিত গ্রন্থে 'পঞ্চজন্য' প্রেসের ওপর হামলার কথা উল্লেখ আছে। অনন্ত সিংহ[৪] লিখেছেন:

'...আসানুল্লা হত্যার সময়ে ওপরে সেখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন আমার কথা তাঁরা সমর্থন করবেন। এই ব্যাপার কতখানি গড়িয়াছিল তার বিবরণ আরো খানিকটা দিচ্ছি। উচ্চপদস্থ ইংরেজদল যখন পঞ্চজন্য প্রেস ও অফিস ধ্বংস-কার্যে ব্যস্ত তখন সারা শহরে অত্যাচার চালাবার জন্য এ্যাংলো ও ইংরেজ সার্জেন্টদের লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ভারতীয় গণতন্ত্রবাহিনীর প্রতি সহানুভূতিশীল বা যোগাযোগ আছে সন্দেহে তালিকাভুক্ত সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের প্রায় হাজারটি বাড়িতে ইন্সপেক্টার ও সাব-ইন্সপেক্টারদের দলকে সশস্ত্র সান্ত্রীদের সঙ্গে সংগঠিত ভাবে পাঠানো হয়েছিল। কাকেও বন্দী করা বা কোন বাড়িতে খানাতল্লাসীর উদ্দেশ্য তাদের একটুও ছিল না। গুলিবিদ্ধ ক্ষিপ্ত পশুর মত তারা প্রতি গৃহের আসবাবপত্র সব ভেঙেচুরে তছনছ করে অধিবাসীদের নির্বিচারে মারধোর করে বেড়ালো। বুটের লাথি, রাইফেলের গুঁতো, বেটনের আঘাত এবং ঘুষি ও চড়চাপড়ের হাত হতে স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে কেউই রেহাই পেল না। কেউ সামান্য বাধা দেবার চেষ্টা করলেই সঙ্গে সঙ্গে তাকে জ্ঞান হারাতে হয়েছে।'

সেকালে দেশের একদল নেতাকে ইংরেজের সঙ্গে আবেদন-নিবেদনের মধ্যে আপোষ করে কিছু ক্ষমতা লাভের জন্য চেষ্টা করতে দেখে বিপ্লবীরা উত্তেজিত হয়েছিলেন। তখনো সারা দেশের মানুষের মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য আত্মবিশ্বাসের দানা বেঁধে ওঠেনি। কিন্তু চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা সারা ভারতের মানুষকে মুক্তির নতুন পথ দেখিয়েছিলেন। পরাধীনতার লোহশৃঙ্খল ভেঙে ফেলার কঠিন পথে মুক্তির মশাল জেবলে ধরে ছিলেন;

প্রসঙ্গপঞ্জী

১। পঞ্চপুষ্প, ফাল্গুন ১৩৩৯, পৃষ্ঠা ৪২২।
২। বঙ্গবাণী, ২৩শে বৈশাখ ১৩৩৬ ৬ই মে ১৯২৯।
৩। পাঞ্চজন্য (চট্টগ্রাম), বিশেষ সংখ্যা, প্রথম বর্ষ, সোমবার ২৪শে কার্ত্তিক ১৩৩৭, ১০ই নভেম্বর ১৯৩০।
৪। অনন্ত সিংহ, চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা ৩৩০।

৬ ॥ স্বাধীনতা আন্দোলনে বর্ধমানের সাময়িক পত্র

বর্ধমানের খ্যাতনামা সাংবাদিক ও দেশকর্মী দাশরথি তা[১] লিখেছেন, 'ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় প্রথম সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয় বাঙলায়। তাহার পর ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়। বাঙলা-ভাষায় প্রথম সংবাদ পত্র প্রকাশের গৌরব অধিকার করেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। সংবাদ পত্রটি বাহির হয় সাপ্তাহিক, নাম ছিল "বাঙ্গাল-গেজেট", বোধহয় তৎকালীন ইংরেজীতে প্রকাশিত বেঙ্গল গেজেট-এর অনুকরণে ঐ নাম রাখা হয়। কলিকাতার ১৪৫ নম্বর চোরবাগান স্ট্রীট হইতে প্রতি শুক্রবার প্রকাশিত হইত ঃ উহার চাঁদা ছিল মাসিক দুই টাকা। ১৮১৮ সালের ১৪ মে প্রকাশিত ১২ মে তারিখ যুক্ত এবং ঐ সালের ৯ জুলাই-এর "গভর্ণমেণ্ট গেজেট"-এ গঙ্গাকিশোরের সহযোগী হরচন্দ্র রায় যে দুটি বিজ্ঞাপন প্রচার করেন তাহাতে এই বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছিল। চোরবাগানের ঐ ঠিকানায় প্রতিষ্ঠিত মুদ্রণ যন্ত্রটি পরিচালনা করিতেন গঙ্গাকিশোরের একান্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগী হরচন্দ্র রায়। ১৮১৮ সালের ২৩ মে হুগলী জেলার শ্রীরামপুরের ভাগীরথী তীরবর্তী খৃষ্টান মিশন হইতে পাদ্রী মার্শম্যান "সমাচার দর্পণ" নামে সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকাশ করেন। উহাকেই প্রথম বাঙলা সংবাদ পত্র বলিয়া দাবী করা হইত, কিন্তু প্রথম বাঙলা দৈনিক "সংবাদ প্রভাকর"-এর সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পত্রিকায় সংবাদ পত্রের ইতিবৃত্ত প্রকাশ করিয়া প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যই বাঙলা ভাষায় সংবাদ পত্রের প্রবর্ত্তক। "বাঙ্গাল গেজেট" প্রকাশিত হয় ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ১৫ মে শুক্রবার, অর্থাৎ "সমাচার দর্পণ" প্রকাশের আট দিন পূর্বে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ঐ প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ৮ মে'র "ইংলিশম্যান এণ্ড মিলিটারী ক্রণিকেল" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। পাদ্রী লঙ "দি ক্যালকাটা রিভিউ ফর ১৮৫০-এ" সমাচার দর্পণকে প্রথম বাঙলা সংবাদপত্র বলিয়াছিলেন, কিন্তু ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁর "লঙস ডেসক্রিপটিভ ক্যাটালগ অফ বেঙ্গলী

ওয়ার্কস" গ্রন্থে সে মত পরিবর্তন করিয়া গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য সম্পাদিত "বাঙ্গাল গেজেট"কেই প্রথম বাঙলা সংবাদপত্রের মর্যাদা দান করিয়া গিয়াছেন।'

যদিও আমাদের আলোচনার বিষয় গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য নয়। কিন্তু তবু তাঁর নাম এখানে উল্লেখ করা হলো। কেন না, বর্ধমানের পত্র-পত্রিকা এবং সংবাদপত্রের কথা নিয়ে আলোচনা করার সময় গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের নাম অবশ্য উল্লেখ করতে হবে। গঙ্গাকিশোরের ছাপাখানার নাম ছিল "বাঙ্গাল গেজেট যন্ত্রালয়"। ১৮১৯ সালে এই প্রেস তিনি বর্ধমানের গ্রামের বাড়িতে স্থানান্তরিত করেছিলেন। তা' ছাড়া আর একজনের নাম উল্লেখ করতে হবে, তাঁর নাম—দাশরথি তা।

১৯৩৬ সালে ২৫ মার্চ তারিখে বর্ধমান থেকে 'দামোদর' পাক্ষিক রূপে প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদক—বর্ধমানের খ্যাতনামা দেশকর্মী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী দাশরথি তা। দামোদর বন্যা প্রতিকার আন্দোলনের মুখপত্ররূপে ১৯৩৬ সালে মার্চের প্রথমে তৎকালীন বর্ধমানের ইংরেজ জেলা শাসকের কাছে দামোদরের নাম জারী করলে দুই হাজার টাকার জমানত চাওয়া হয়। পরে কলকাতা থেকে দামোদরের প্রকাশের অনুমতি লাভ করে। বর্ধমানে বাধা পেয়ে কলকাতা থেকে 'দামোদর' প্রকাশিত হলে বর্ধমানে বিশেষ আলোড়ন হয়। দামোদর[২] কাগজে ছাপা হয়েছিল নিয়মাবলী। নিয়মাবলী এখানে উল্লেখ করা হলো :

'দামোদর পাক্ষিকী—দুই সপ্তাহে একবার সোমবারে বাহির হইবে। বার্ষিক মূল্য সডাক এক টাকা ; প্রতি সংখ্যার মূল্য এক পয়সা। বর্ধমানের সর্ব্বত্র দামোদরের জন্য সংবাদদাতা ও বিক্রয়ের জন্য এজেন্ট আবশ্যক।

সংবাদ প্রভৃতি সংক্ষেপে কাগজের এক পৃষ্ঠায় ফাঁক ফাঁক করিয়া লিখিয়া সম্পাদক—"দামোদর", ৪৯ নং মধু রায় লেন, কলিকাতা এই ঠিকানায় এবং টাকাকড়ি, ম্যানেজার—দামোদর, ১৫৪ নং মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। মনিঅর্ডার কুপনে নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।'

দামোদরে[৩] প্রকাশিত একটি সংবাদের কিছু অংশ হলো এই :

'দামোদর বন্যার স্থায়ী প্রতিকার চেষ্টা

——— o ———

বন্যাপীড়িতদের তীব্র আন্দোলন

———

গ্রামে গ্রামে বিরাট সভা ও শোভাযাত্রা

———

খণ্ডঘোষ, রায়না ও জামালপুর থানায় ২৫০ গ্রাম দামোদরে প্রায় প্রতি বৎসর প্লাবিত হয়। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাহার কোন প্রতিকারের চেষ্টা না

হওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে বিপুল চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে এবং গ্রামে গ্রামে সভা-সমিতি শোভাযাত্রা প্রভৃতির দ্বারা ব্যাপক আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। সভাগুলির বিস্তৃত বিবরণ পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।...'

দামোদরের লেখা ইংরেজ সরকারের কাছে ভালো লাগতো না। মাত্র পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর প্রেসকে বাজেয়াপ্ত করা হয়। আবার অনুমতি গ্রহণের পরে, সরকার মুদ্রাকর ও প্রকাশকের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা হিসাবে দশ হাজার টাকা জমানত চেয়ে বসে। এর পর বেনামায় 'বর্ধমান বার্তা'র প্রকাশ হয়েছিল। তিন বছর একান্ত ক্লান্তিহীনতার সঙ্গে কাগজ বেরিয়েছিল। কাগজে লেখা হতো :

'জাতীয় সাপ্তাহিক বর্দ্ধমান' বার্ত্তা
সম্পাদক : শ্রীদাশরথি তা'

কাগজ প্রতি সংখ্যা এক পয়সা দামে বিক্রি হতো। এই কাগজে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু শুভেচ্ছা পাঠিয়েছিলেন। নেতাজীর শুভেচ্ছা এখানে উদ্ধৃত হলো :

'বর্দ্ধমান বার্ত্তার জন্য আমার শুভ ইচ্ছা জানাইতেছি। এই পত্রিকার সাহায্যে বর্দ্ধমান জেলাবাসীর আশা, আকাঙ্খা মুখরিত হউক এবং জাতীয়তার ক্রমবিকাশের সহায়তা হউক এই প্রার্থনা করি।

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু
২৮।৫।৩৮

সুভাষচন্দ্র বসুর একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল 'বর্দ্ধমান বার্ত্তা' কাগজে। সংবাদটি হলো এই :

'রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র ॥ কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন

ভারতের কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু গত বৃহস্পতিবার ইং ১০ই মার্চ সকাল ৭-৩০ মিনিটের ট্রেনে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য হাওড়া স্টেশনে বিপুল লোক সমাগম হইয়াছিল। স্টেশন হইতে শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহাকে প্রাদেশিক রাষ্ট্রসমিতির কার্যালয়ে লইয়া যাওয়া হয়।'

১৯৪০ সালে ২১ অক্টোবর তারিখের সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর তৎকালীন সরকার কর্তৃক কাগজের প্রকাশ বন্ধ করে এবং সম্পাদক ও প্রকাশকের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। ইহার পর বেনামায় 'পল্লীর কথা' সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়েছিল।

বর্ধমান থেকে প্রকাশিত একটি স্মারক গ্রন্থে বর্ধমানের বিভিন্ন সময়ের পত্র-পত্রিকার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এই স্মারক গ্রন্থের সম্পাদক ছিলেন দাশরথি তা। উক্ত গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হলো :

'...অতঃপর, ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনের পর..... স্বদেশী

প্রচারের জন্য ভোলানাথ ভঞ্জ (স্বামী শ্রদ্ধানন্দ) "বর্ধমান" নামে সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। মাত্র ৪ মাস প্রকাশের পর ইহা বন্ধ হইয়া যায়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ইহার পর তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের জন্য বর্ধমানে আসেন তখন বর্ধমানের জাতীয়তাবাদীদিগকে একটি জাতীয় পত্রিকা প্রকাশেও অনুরোধ করেন। সেই অনুপ্রেরণায় ১৩৩২ সালে জন্মাষ্টমীতে (১৯২৪) "শক্তি" পত্রিকা প্রকাশিত হইল। স্বর্গীয় দুর্লভ কিশোর মিত্র বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী যুবক ছিলেন। তাঁহার অর্থানুকূল্যে "শক্তি" প্রতিষ্ঠিত হয়। "শক্তির" প্রথম সম্পাদক হন স্বর্গীয় বলাই দেবশর্ম্মা। তাঁহার জ্বলন্ত লেখনীতে "শক্তি" শুধু বর্ধমানে নহে সমগ্র বঙ্গদেশে বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছিল। শক্তির পরবর্তী যুগ্ম-সম্পাদক হন শ্রীদেবকীকুমার বসু (বর্তমানে খ্যাতনামা চিত্রপরিচালক) ও শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্তী (বর্তমানে পুরুলিয়া রামচন্দ্রপুর আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী)। পরবর্তীকালে "শক্তি" বর্ধমান জেলা কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় আসে এবং সম্পাদক হন যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা মহাশয়। ১৯৩০ সালের প্রেস দমন আইনে উহা বন্ধ হইয়া যায়। "বর্ধমান সঞ্জীবনী"তে তখন নীলামের ইস্তাহার বাহির হইত। আমেদ সাহেব যখন বর্ধমানের জেলা জজ হইয়া আসিলেন. তাঁহার সাহায্যে নীলামী ইস্তাহার প্রকাশের সুযোগ পাইয়া বর্ধমানের তৎ-কালীন পাবলিক প্রসিকিউটার নজিরুদ্দিন আহম্মদ ১৯২৫ সালে "বর্ধমান বাণী" প্রকাশ করিলেন। "বর্ধমান সঞ্জীবনী" নীলাম ইস্তাহার না পাওয়ায় বন্ধ হইয়া গেল। খেলাফৎ আন্দোলনের সময় মৌলভী আবুল হায়াৎ "আলোক" নামে এক পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯৩০ ও ১৯৩২-এর আইন অমান্য আন্দোলনের পর দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের প্রয়াণের পর ১৯৩৪ খৃস্টাব্দে শ্রীবংশগোপাল চৌধুরী পূর্ণিমা প্রেস হইতে সাপ্তাহিক "দেশপ্রিয়" প্রকাশ করেন। শ্রীসুধাংশুমোহন ভট্টাচার্য উহা সম্পাদনা করিতেন। শ্রীদাশরথি তা-ও ঐ পত্রিকার সহিত যুক্ত ছিলেন। ঐ সময় "শান্তিজল" নামে এক মাসিক পত্রিকা শ্রীভুজঙ্গভূষণ সেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইত। তাহার পর ১৩৪২ সালের দামোদরের বিধ্বংসী বন্যার পর প্রবলভাবে দামোদর বন্যা প্রতিকার আন্দোলন সুরু হয়। উহারই মুখপত্ররূপে ১৯৩৬ সালে পাক্ষিক "দামোদর" প্রকাশের জন্য বর্ধমানের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট শ্রীদাশরথি তা নাম জারী করিলে তাঁহার নিকট ২০০০ দুই হাজার টাকা জমানত চাওয়া হয়।'

'দামোদর' পত্রিকার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এই কারণে উক্ত লেখা থেকে উদ্ধৃত করা হলো না।

দাশরথি তা[৭] সম্পাদিত গ্রন্থ থেকে আরও কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো:

'ইহার দীর্ঘ দুই বৎসর পরে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই মার্চ শ্রীগীত-গোবিন্দ বসুকে প্রকাশক ও বিডন স্ট্রীটের অধুনালুপ্ত প্রসিদ্ধ মেটকাফ প্রেসে বৃদ্ধ কম্পোজিটার শশীভূষণ পালকে মুদ্রাকর করিয়া সাপ্তাহিক 'বর্ধমান বার্তা' ৩৮, ভুবন ব্যানার্জী লেন হইতে প্রকাশিত হয়। শ্রীদাশরথী তা উহার সম্পাদনা করেন। প্রথম হইতেই "বর্ধমান বার্তা" বর্ধমানের অত্যন্ত জনপ্রিয় ও বহুল প্রচারিত হইয়া পড়ে। দুই বৎসর পরে স্বর্গীয় যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা, শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য, শ্রীদাশরথি তা, শ্রীরাধারমণ সেন, শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে লইয়া গঠিত ট্রাস্টবোর্ডের উপর উহার পরিচালনার ভার পড়ে। দাশরথি তা উহার সম্পাদনা করিতে থাকেন এবং উক্ত পত্রিকা কলিকাতা শক্তি প্রেস হইতে মুদ্রিত হইতে থাকে। বর্ধমানের তৎকালীন মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট কিউ এম. রহমানের বিরুদ্ধে এক সম্পাদকীয় প্রকাশের জন্য দামোদর সম্পাদক ও প্রকাশক শ্রীএককড়ি ভড়ের যথাক্রমে ৬ মাস ও ৪ মাস কারাদণ্ড হয়। তৎকালীন মন্ত্রীসভার তীব্র সমালোচনা ও কার্টুন প্রকাশের ফলে বর্ধমান বার্তা তৃতীয় বর্ষ চলিবার কালে পূজার ছুটির পর ১৯৪০ সালের ২১শে অক্টোবর ৩০ সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পর মন্ত্রীসভার দার্জিলিং অধিবেশনের সিদ্ধান্তমত তৎকালীন সরকার 'বর্ধমান বার্তা'র সমস্ত সংবাদ, সম্পাদকীয়. এমন কি বিজ্ঞাপন পর্যন্ত প্রকাশের পূর্বে বর্ধমানের প্রেস অফিসারকে (জেলা ম্যাজিস্ট্রেট) দেখাইয়া প্রকাশের আদেশ জারী করেন। তাহা সাংবাদিকতার পক্ষে একান্ত অপমানজনক বলিয়া তাহার প্রতিবাদে 'বর্ধমান বার্তা' বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী সংখ্যা হইতে শ্রীভবভূতি সোমকে সম্পাদক ও শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে মুদ্রাকর ও প্রকাশক করিয়া সাপ্তাহিক "পল্লীর কথা" ঐ শক্তি প্রেস হইতেই প্রকাশ করা হয়। ইতিমধ্যে মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনে শ্রীদাশরথি তা আত্মনিয়োগ করেন এবং ঐ অবস্থায় "বর্ধমান বার্তা" মামলায় কারারুদ্ধ হন। ১৯৪১ সালের ২৫শে অক্টোবর আলীপুর সেন্ট্রাল জেল হইতে তিনি মুক্তিলাভ করেন। তখন "পল্লীর কথার" দ্বিতীয় বর্ষ সুরু হইয়াছে। কারামুক্তির কয়েক মাস পর ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী তিনি "পল্লীর কথার" সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। ১৯৪২-এর জুলাইয়ের পর মহাত্মা গান্ধীর "ভারত ছাড়" আন্দোলনের পূর্বে ভারতরক্ষা আইনের প্রতিবাদে এবং "একমাত্র স্বাধীন-ভারতেই সংবাদপত্র প্রকাশিত হইবে—এখন সবলকে চলমান সংবাদপত্র হইতে হইবে।" মহাত্মা গান্ধীর এই নির্দেশে "পল্লীর কথার" শেষ সংখ্যায় "মসি ছাড়িয়া অসি ধরিলাম" প্রবন্ধ লিখিয়া আগষ্ট আন্দোলনে তিনি ঝাঁপিয়া পড়েন।'

১৯৪২ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনে সাংবাদিক দাশরথি তা লেখনি

রেখে বন্দুক ধরেছিলেন। সেই কাহিনী আজও বর্ধমানের অসংখ্য গ্রামের মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে ঘুরছে। বর্ধমানের সাধারণ ভূমিহীন কৃষক, জনমজুর ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। ইংরেজ সরকারকে বে-আইনী ঘোষণা করে, বর্ধমানে পাঁচটা স্বাধীন সরকার গঠিত হয়েছিল। ১৯৪২ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে জামালপুর পুলিশ থানা দখল করে সেখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত করা হয়। তা' ছাড়া ওই দিন জামালপুর থানা থেকে বিদ্রোহীরা একটি রাইফেল নিয়ে আসেন। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হবার পরে, স্বাধীন ভারতের বর্ধমানের প্রথম জেলা শাসক কুমার ওধিক্রম মজুমদারের হাতে জাতীয় সরকারের বর্ধমানের সর্বাধিনায়ক দাশরথি তা উহা অর্পণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল দৈনিক দামোদর[৮] কাগজে। আগষ্ট বিপ্লবে বিদ্রোহী বর্ধমানের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে রাইফেলের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল।

প্রসঙ্গপঞ্জী

১। দাশরথি তা, সারা ভারতের সাংবাদিক তীর্থ বর্ধমানের বহড়ু দৈনিক দামোদর, প্রথম বার্ষিক সংকলন, ১৩৮১ (বার্ষিক সংখ্যা)।

২। দামোদর, প্রথম বর্ষ, সংখ্যা ১ বুধবার, ১২ই চৈত্র ১৩৪২, ২৫শে মার্চ ১৯৩৬।

৩। দামোদর, পূর্বে উল্লিখিত সংখ্যা।

৪। বর্ধমান বার্ত্তা, প্রথম বর্ষ, ১৬শ সংখ্যা, সোমবার, ১২ই আষাঢ় ১৩৪৫, ২৭শে জুন ১৯৩৮।

৫। বর্ধমান বার্ত্তা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, সোমবার, ৩০শে ফাল্গুন ১৩৪৪, ১৪ই মার্চ ১৯৩৮।

৬। দাশরথি তা সম্পাদিত স্মারক গ্রন্থ, বর্ধমান পৌর-শতবার্ষিকী উৎসব সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত।

৭। দাশরথি তা সম্পাদিত স্মারক গ্রন্থ, পূর্বে উল্লিখিত সংখ্যা।

৮। দৈনিক দামোদর (বর্ধমান), ৯ই আগষ্ট ১৯৭৭।

৭ ॥ পুরুলিয়ার 'মুক্তি' পত্রিকা

পশ্চিম বাংলা ও বিহারের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে ঋষি নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্তের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। পুরুলিয়ার সাধারণ মানুষ আজও ঋষি নিবারণচন্দ্রকে পিতা বলে শ্রদ্ধা জানায়। পুরুলিয়ার চকবাজার, বরাকর রোড, প্রভৃতি কয়েকটি রাস্তার প্রায় সংযোগ স্থলে ঋষি নিবারণ পার্ক। ছোট্ট একটুকরো জমিতে নিবারণচন্দ্রের মর্ম্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে শহরবাসী পুরুলিয়ার গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। পুরুলিয়াবাসী এজন্য গর্ব অনুভব করেন। ঋষি নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত এবং সর্বত্যাগী অতুলচন্দ্র ঘোষ ছিলেন সেকালের মানভূমের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম প্রধান ঋত্বিক। এঁদের ত্যাগব্রত, দেশপ্রেমের কাহিনী পুরুলিয়াবাসীর গর্বের বস্তু। 'মুক্তি' পত্রিকা কিভাবে প্রকাশিত হয়েছিল তার ইতিহাস ছাপা হয়েছিল মুক্তি[1] কাগজে। কিছু অংশ হলো এই ঃ

'মুক্তির ইতিহাস মানভূম জেলার রাজনৈতিক ও জনজীবনের ইতিহাসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্বন্ধ যুক্ত। খুবই সংক্ষেপে এর আরম্ভ ও চলার পরিচয়টা দেওয়া হল। কারণ বর্তমানে যে মত ও যে পথেরই যে রাজনৈতিক কর্মী বা নেতাই এ জেলায় হন না—তাঁরা যা কিছুই স্বীকার বা অস্বীকার করুন না কেন, ১৯২১ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত মানভূম জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদান এবং সেই সংগ্রামে জনচেতনায় "মুক্তির" অবদান কেউই অস্বীকার করতে পারবে না।

ইং ১৯২৫ সালে ঋষি নিবারণচন্দ্র দেশবন্ধু প্রেসের প্রতিষ্ঠা ও "মুক্তির" প্রকাশ—তার সম্পাদনায় প্রকাশ করেন। ১৯৩০ সালে যখন কংগ্রেস বে-আইনী ঘোষিত হয় এবং লবণ সত্যাগ্রহ সুরু হয়—তখন সরকার "দেশবন্ধু প্রেস" বাজেয়াপ্ত করে ও মুক্তির প্রকাশ বন্ধ করে দেয়।'

'মুক্তি' পত্রিকা এবং 'দেশবন্ধু প্রেস' গড়ে উঠেছিল সাধারণ মানুষের দানে। এই কারণে পুরুলিয়ার সাধারণ মানুষ আজও মুক্তি প্রেস এবং মুক্তি পত্রিকা ভালোবাসে। 'মুক্তি' পত্রিকার গোড়ার কথা উল্লেখ আছে অতুলচন্দ্র ঘোষ[2] সম্পাদিত পুস্তিকায়। ওই পুস্তিকা থেকে কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

'১৯২৫ সালে পুরুলিয়ায় বিহার প্রাদেশিক সম্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশন হয়। মহাত্মা গান্ধী আগমন করেন। ঐ অধিবেশনের পরেই নিবারণচন্দ্র কর্মীগণকে লইয়া জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থ সাহায্য সংগ্রহ করিয়া দেশবন্ধু প্রেস ও মুক্তি পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন।'

পুরুলিয়া শহরে এই মহান পুরুষের স্নেহধন্য কর্মীদের কাছে শুনেছি,-

ঋষি নিবারণচন্দ্র মুক্তির সম্পাদকীয় যেমন লিখতেন, তা' ছাড়া বিভিন্ন সংবাদ ও প্রবন্ধ তাঁকে লিখতে হতো।

১৯২৮ সালে হরিপদ দাঁ তেলকল পাড়ায় শিল্পাশ্রমের জন্য জমি দান করে গৃহ নির্মাণ করিয়ে দেন।

১৯২৯ সালে 'মুক্তি' কাগজে 'বিপ্লব' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধের জন্য সম্পাদকরূপে তাঁর এক বছর কারাদণ্ড হয়। ওই সময় তাঁকে হাজারিবাগ জেলে কাটাতে হয়েছিল। ১৯৩০ সালে মানভূম জেলা রাজনৈতিক সম্মেলনের ধানবাদ অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত। ওই বছর মে মাসে প্রেস অর্ডিনান্সের ফলে দেশবন্ধু প্রেস ও তৎসঙ্গে 'মুক্তি' পত্রিকা বন্ধ করতে হয়। ১৯৩০ সালে পুনরায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু হলে নিবারণচন্দ্র ছয় মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। বারেবারে ইংরেজ সরকার তাঁকে কারাগারে রেখে মানভূমের গণ আন্দোলন স্তব্ধ করতে চেয়েছিল। ১৯৩২ সালে আবার বন্দী হয়ে দেড় বছর হাজারিবাগ জেলে কাটিয়ে ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'শিল্পাশ্রম' সরকার কর্তৃক বে-আইনি ঘোষিত হয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে 'মুক্তির' ওপর দিয়ে নানা বাধার ঝড় বয়ে গেছে। কিন্তু বহু সংগ্রামের ইতিহাস নিয়ে আজও বেঁচে আছে 'মুক্তি' পত্রিকা।

নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত এবং অতুলচন্দ্র ঘোষ ছিলেন অহিংসার পূজারী। মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ ও আন্দোলনকে দেশের মুক্তির পথ বলে তাঁরা বিশ্বাস করতেন। সেদিন মহাত্মা গান্ধীর অহিংসানীতির প্রতি যাঁদের কোন আস্থা ছিল না, সেইসব বিপ্লবীরাও নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত এবং অতুলচন্দ্র ঘোষের মধুর ব্যবহার ও আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। বিভিন্ন পথের ও মতের বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিল মধুর। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, বিপ্লবী প্রমথনাথ ঘোষের কথা। প্রমথনাথ ঘোষ ছিলেন বাঁকুড়া জেলার অধিবাসী। বাঁকুড়ার শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনে তাঁর অবদান ছিল বিরাট। ১৯৩৩ সালে এক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁকে দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল। তিনি আন্দামানের কারাগারেও ছিলেন। বাঁকুড়ায় প্রমথনাথ ঘোষের কাছে শুনেছিলাম, সেকালের বিপ্লবীদের বিভিন্ন আন্দোলনের পথ নিয়ে মুক্তি পত্রিকার কর্মকর্তা নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত, বিভূতি-ভূষণ দাসগুপ্ত, অতুলচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে প্রচুর বিরোধ থাকা সত্ত্বেও বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিল মধুর। প্রমথনাথ ঘোষ বলতেন, আমরা অনেক সময় বাঁকুড়া থেকে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পুরুলিয়ার শিল্পাশ্রমে কিংবা মুক্তি অফিসে রাত কাটাতাম। আমাদের খাওয়া ও থাকার কোন অসুবিধা হতো না। ১৯৪০ সালে প্রমথনাথ ঘোষের লেখা 'ভারতে শ্রমিক আন্দোলন' (১৩৫ পৃষ্ঠার বই) প্রকাশিত হয়েছিল। বইটির প্রকাশক : মুক্তি পাবলিশিং,

পুরুলিয়া। মানভূম ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড প্রেস, পুরুলিয়া থেকে পূর্ণেন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বইটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। এই বইয়ের ভূমিকা লিখেছিলেন—বিভূতিভূষণ দাসগুপ্ত। শুনেছিলাম, প্রচার বন্ধ করার জন্য এই বইটির ওপর সেকালে সরকারী নিষেধাজ্ঞাজারী করা হয়েছিল।

নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত লিখিত 'মুক্তি'র প্রথম সম্পাদকীয় প্রবন্ধের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হলো ঃ

'বন্ধন দশায়—মুক্তির কথা ছাড়া আর কি কথা বলিবার আছে ? পরাধীন দেশে স্বাধীনতার চেষ্টা ব্যতীত আর কি করিবার আছে ? পরনির্ভরশীল জাতির পক্ষে স্বরাজ লাভের উপায় চিন্তন ব্যতীত আর কি ভাবিবার আছে ?

বর্ত্তমান ভারতে নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিবার মুক্ত কণ্ঠে প্রচার করিবার এবং প্রাণ দিয়া অনুষ্ঠান করিবার একটি মাত্র বিষয় আছে ; তাহা আর কিছু নয়, ত্রিশ কোটী মানবের জন্মভূমি সর্ব্ব প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি, এই বিশাল ভারতবর্ষ কি সে পুনরায় আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে, কেমন করিয়া এই শৃঙ্খলিত, নিষ্পেষিত, নির্য্যাতিত দেশটি তাহার সমস্ত দৈন্য দুর্দ্দশা হইতে বিমুক্ত হইয়া পূর্ব্ব গৌরবে অধিষ্ঠিত হইবে, কি উপায় অবলম্বন করিলে মোক্ষ ধর্ম্মের প্রচার ক্ষেত্র এই মুক্তি ক্ষেত্র দাসত্বের বন্ধন হইতে মুক্তি-লাভ করিবে, তাহাই ভাবিয়া দেখা, নির্ভীকভাবে তাহারই প্রচার করা এবং সমগ্র শক্তি ঐ একই উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা। শৃঙ্খলাবদ্ধ জননীর বন্ধন চিন্তা ব্যতীত সন্তানের হৃদয়ে আর কি ভাবনা স্থান লাভ করিবে ? ইহাই আমাদের মুক্তির কল্পনা। সালোক্য, সাযুজ্য প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত মুক্তির কথা ভাবিবার প্রথম সময় নাই।

যে দেশ মোহগ্রস্ত হইয়া দাসত্বের বন্ধনকে বরণ করিয়া লইয়াছে, সহস্রাধিক বৎসরের অকথ্য অত্যাচারে নিষ্পেষিত হইয়াও যে হতভাগ্য দেশের সন্তানগণের চৈতন্য সঞ্চার হইল না, বিচার বুদ্ধি রহিত হইয়া যে দেশের অধিবাসীগণ বিমূঢ়বৎ আত্মকলহে প্রবৃত্ত হইয়া নিজেদের রক্ত নিজেরাই পান করিয়া তৃপ্তি অনুভব করিতেছে, শক্তিহীন, সামর্থহীন, সহায় সম্বল শূন্য সে দেশের বন্ধন বিমুক্তি কি কখনও সম্ভব হইবে ? মুক্তির যাহাদের আকাঙ্খা নাই, স্বাধীনতালাভের যাহাদের ইচ্ছা নাই, স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করিবার যাহাদের যোগ্যতা নাই, তাহাদের নিকট বন্ধন বিমুক্তির যাবতীয় প্রচেষ্টা নিস্ফল আস্ফালন মাত্র নয় কি ? জরা জীর্ণ এই প্রাচীন জাতির পূর্ব্ব গৌরব যতই কেন মহিমান্বিত থাকুক না, এখন ইহা মরণোন্মুখ হইয়া ধ্বংসের দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছে, স্বরূপ ভ্রষ্ট হইয়া নিজের বিশেষত্ব পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব গৌরব বিস্মৃত হইয়া ভূতাবিষ্ট পথিকের ন্যায় আলেয়ার পিছনে পিছনে ছুটিয়াছে, কে ইহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে ?...'

অতুলচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত পত্রিকা থেকে নিবারণচন্দ্রের জীবনের কয়েকটি কথা এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ ১২৮৩ সালের ১২ই বৈশাখ ঋষি নিবারণ-চন্দ্র ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের গাউপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ থেকে ১৮৯৫ সালে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বরিশালে তিনি মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের এবং জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসেন। ১৯০০ সালে বি. এ. পরীক্ষা এবং ১৯১১ সালে বি. টি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

কর্মজীবনে ইস্কুলের সাব-ইনসপেক্টর, শিক্ষক প্রভৃতি পদ গ্রহণ করে-ছিলেন। ১৯১৪ সালে তিনি পুরুলিয়া জিলা স্কুলের সহকারী শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। ১৯১৬ সালে কর্মকুশলতায় তিনি ওই উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরূপে অধিষ্ঠিত হন। তারপর ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। ১৯২২ সালে ২৩ বছরের সরকারী চাকরী বিসর্জন দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে অবতীর্ণ হন। তৎকালীন সরকার তাঁকে আংশিক পেন্সন দিতে চাইলেও তিনি তা' গ্রহণ করেন নি। ১৯৩৫ সালে ১৭ই জুলাই বেলা ৩ ঘটিকায় পুরুলিয়া শিল্পাশ্রমে তাঁর জীবনের অবসান হয়ে যায়।

'মুক্তি' পত্রিকা ১৯৩৯ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখের সংখ্যায় সম্পাদক ছিলেন অতুলচন্দ্র ঘোষ। কাগজ ছাপা হতো মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া থেকে। কাগজের দাম ছিল প্রতি সংখ্যা দু' পয়সা।

মুক্তি[৪] পত্রিকায় সম্পাদকীয় কলমে প্রকাশিত লেখাব কিছু অংশ হলো এই ঃ

'পঞ্চম বর্ষের ১৮শ সংখ্যা "মুক্তি" প্রতিষ্ঠাতা ৺নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ের নির্দেশ ক্রমে মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটি "মুক্তি" প্রকাশিত করা স্থগিত রাখেন। ১৯৩০ সালের সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সূচনাতে তদানীন্তন জেলা কর্তৃপক্ষ "মুক্তি"র প্রচার কার্য্য ব্যাহত করিবার উদ্দেশ্যেই "দেশবন্ধু প্রেসের" নিকট হইতে জামিন আদায়ের হুকুম জারি করেন। ৺নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় এবং জেলা কংগ্রেস কমিটি এই অবমাননাকর সর্ত্ত মানিয়া লইতে অস্বীকার করিয়া প্রেসের কাজ এবং সঙ্গে সঙ্গে "মুক্তি" প্রকাশ বন্ধ করেন।

আজ ৮ বৎসর পরে "মুক্তি" নব কলেবরে আবার দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে। এই দীর্ঘকাল ধরিয়া দেশের উপর দিয়া বহু ঝড়-ঝঞ্জা বহিয়া গিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে "মুক্তি"র প্রতিষ্ঠাতা মানভূমের স্বাধীনতা যজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক ঋষি নিবারণচন্দ্র তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের অবসানে মহাশান্তির ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম

বিভিন্ন অবস্থা অতিক্রম করিয়া নূতন রূপে দেশবাসীর সহায়তার প্রতীক্ষা করিতেছে। পরিবর্ত্তন অনেক হইয়াছে, দেশ কিছু যে অগ্রসর হয় নাই, এ কথাও বলা চলে না কিন্তু চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বে যে বাণী প্রচারের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া নিবারণচন্দ্র "মুক্তি" প্রকাশের সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই বাণী প্রচারের প্রয়োজনীয়তা আজও সমভাবেই বিদ্যমান রহিয়াছে।

'নিবারণচন্দ্র আমলাতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতা, বিশেষ করিয়া সংবাদপত্রের মতামত ব্যক্ত করিবার স্বাধীনতা হরণে আমলাতন্ত্রের আগ্রহাতিশয্যের কথা ভাবিয়াই "মুক্তি" প্রকাশ স্থগিত রাখা স্থির করিয়াছিলেন। দেশ আজও স্বাধীন হয় নাই; বৃটিশ সরকারের স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় যে আর আমাদের পাইতে হইবে না, এ কথাও প্রকৃতিস্থ কোনও ব্যক্তি কল্পনা করিতে পারেন না, তবুও কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল পরিচালিত কয়েকটি প্রদেশে রাষ্ট্রীয় আবহাওয়ার কিছু পরিবর্ত্তন যে হইয়াছে—একথা অস্বীকার করা চলে না। অন্ততঃপক্ষে এই সব প্রদেশগুলিতে জনমণ্ডলীর সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলের উদ্দেশ্যে ন্যায্য ও সঙ্গত ভাবে নির্ভীক মতামত প্রকাশের স্বাধীনতায় প্রাদেশিক সরকার হস্তক্ষেপ করিবেনা—এইরূপ আশা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। ইহাই পুনরায় "মুক্তি" প্রকাশ করিবার নব আয়োজনের একমাত্র যৌক্তিকতা।...'

মুক্তি[৫] পত্রিকায় আরও বলা হয়েছিল:

'...কংগ্রেস কর্তৃক মন্ত্রীত্বগ্রহণের প্রস্তাব স্বীকৃত হইবার পর হইতে দেশে নানা জটিল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। তাহার পূর্বে যতদিন পর্যন্ত বৃটিশ সরকারের সহিত কংগ্রেসের সংঘর্ষ প্রত্যক্ষভাবে চলিতেছিল ততদিন রাষ্ট্রীয় সমস্যা কঠিন হইলেও তাহাতে জটিলতা কম ছিল। কিন্তু মন্ত্রিত্ব গ্রহণের ফলে একটা অবাস্তব নিরাপত্তা ও সংগ্রাম বিরতির আবহাওয়া সৃষ্টি হওয়ায়, প্রগতি বিরোধী চিন্তাধারার দূষিত বাষ্পে দেশ বিষাক্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা, স্বার্থমূলক দলাদলি এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব অশোভন কোলাহলে আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া দেশবাসীকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে বসিয়াছে। সংগ্রাম যতদিন প্রকট ছিল বিষধরের দল নিশ্চিন্ত মনে আপন বিবরে সুষুপ্তির ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছিল। বিষোদ্গারের সুযোগ বা প্রয়োজন তাহাদের হয় নাই। এখন সংগ্রামের রূপান্তরে নিরাপত্তার সন্ধান পাইয়া তাহারা আসরে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং বিষোদ্গারে রাষ্ট্রীয় আবহাওয়া দূষিত করিবার হীন প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত হইয়াছে।'

পুরুলিয়া শহরের আমলাপাড়া, বরাকর রোড, নীলকুঠিডাঙ্গা, নডিহা প্রভৃতি অঞ্চলের অনেকের কাছে শুনেছি যে, ১৯৩০ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত মানভূম অঞ্চলে স্বাধীনতা আন্দোলন নানাভাবে চলেছিল। '১৯৩৭ সালে সর্বত্যাগী অতুলচন্দ্র ঘোষের উদ্যোগে এবং প্রচেষ্টায় নতুন করে "মুক্তি"

পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই সময় 'মুক্তি প্রেস' নাম দিয়ে প্রেস করা হয়েছিল। ১৯৪২ সালের ভারত ছাড় আন্দোলনের সময় মুক্তি প্রেস ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করে নেয় এবং 'মুক্তি'র প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

অতুলচন্দ্র ঘোষ ১৮৮১ সালের ২রা মার্চ তারিখে বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ওকালতি পাশ করার পর তিনি ১৯০৮ সালে পুরুলিয়া শহরে ওকালতি শুরু করেন। ১৯০৮ সালে তিনি শিক্ষাব্রতী অঘোরচন্দ্র রায়ের কন্যা শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দেবীর সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। ঋষি নিবারণ ও অতুলচন্দ্র মহাত্মা গান্ধীর আদর্শকে জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেছিলেন। বিভূতিভূষণ দাসগুপ্ত[৬] লিখেছেন:

'স্বাধীনতা লাভের পর বিহার আমলের দীর্ঘ নয় বৎসর বাংলাভাষার অধিকার রক্ষার সংগ্রামের মধ্য দিয়া ব্যাপক জন মুক্তি আন্দোলন, বিরাট টুসু সত্যাগ্রহ আন্দোলন, নিরাপত্তা আইন বিরোধী আন্দোলন প্রভৃতি যে সকল সংগ্রামাত্মক ঐতিহাসিক আন্দোলন দেখা দেয়—অতুলচন্দ্র সেই সকল আন্দোলনের পুরোভাগে থাকিয়া নেতৃত্ব করেন। কংগ্রেস পরিত্যাগের অব্যবহিত পরে, গান্ধী জয়ন্তীর দিনে জনমুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্ব করিবার সময় অতুলচন্দ্র বিহার সরকারের নিয়োজিত গুণ্ডাদের দ্বারা লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হন এবং পরে দীর্ঘ কারাদণ্ড ভোগ করেন। কারাবাসের সময় অসুস্থতার ফলে মরণাপন্ন অবস্থার মধ্যে তাঁহাকে কারাবদলীর লাঞ্ছনা ও অমানুষিকতা সহ্য করতে হয়।

ভাষা সমস্যার সমাধানকল্পে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার একীকরণের এক উদ্ভট পরিকল্পনা দেখা দিলে তাহার বিরুদ্ধে তথা বিহারের বাংলাভাষী জনগণের দাবীর প্রতি সর্বভারতীয় দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়োজনে অতুলচন্দ্রের নেতৃত্বে এক সহস্রাধিক কর্মী ১৯৫৬ সালের ২২শে এপ্রিল তারিখে পুরুলিয়া হইতে বঙ্গ সত্যাগ্রহে যাত্রা করে। যাত্রাপথে বাংলার গ্রামে গ্রামে ও সহরে সহরে অতুলচন্দ্র ও তাঁহার বাহিনী জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত ও আন্তরিক অভ্যর্থনার দ্বারা বিপুলভাবে অভিনন্দিত হন। লোক সেবক সংঘ মানভূম সহ বিহারের অন্যান্য বাংলাভাষী অঞ্চলের বঙ্গ ভুক্তির দাবীর আন্দোলনকেও সাধ্যমত সহায়তা দান করে। অবশেষে এই ব্যাপক আন্দোলনের ফলে মানভূম জেলার কিয়দংশ পুরুলিয়া জেলারূপে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়।'

প্রসঙ্গপঞ্জী

১। মুক্তি, ১৭ই পৌষ ১৩৭৯, ১লা জানুয়ারী, ১৯৭৩।
২। অতুলচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত, নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্তের জীবন কথা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪০।

৩। মুক্তি, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩৩২ সাল।
৪। মুক্তি, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১২ই মাঘ ১৩৪৫, ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৩৯।
৫। মুক্তি পূর্বে উল্লিখিত সংখ্যা।
৬। বিভূতিভূষণ দাসগুপ্ত সর্বত্যাগী অতুলচন্দ্র ঘোষের সংক্ষিপ্ত জীবনী, পুরুলিয়া মুক্তি প্রেসে মুদ্রিত ও বিভূতিভূষণ দাসগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৮০ সাল।

৮। কয়েকটি রাজনীতি ও সংস্কৃতিমূলক পত্র-পত্রিকা

১৯৪১ সালে ২২শে আগষ্ট তারিখে কলকতার ১২২নং বহুবাজার স্ট্রীট থেকে প্রকাশিত হয়েছিল 'অরণি' পত্রিকা। 'অরণি' ছিল সাপ্তাহিক কাগজ। সম্পাদক ছিলেন—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ২২শে আগষ্ট, ১৯৪১ সালে। এই সংখ্যায় লিখেছিলেনঃ সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদাব, সরোজ দত্ত (কবিতা), সুভাষ মুখোপাধ্যায় (কবিতা), বিনয় ঘোষ, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শান্তি দেবী এবং আরও অনেকে।

'অরণি' পত্রিকায় সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদাব[১] লিখেছিলেন ঃ

'অরণি' বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমার মনে কোন মোহ নাই। আকৈশোর যে আদর্শের ধ্যান করিয়াছি, যে অতৃপ্ত কামনার বহ্নিজ্বালা লইয়া জাতীয় জীবনেব অভ্যুদয়ের স্বপ্ন দেখিয়াছি তাহা ছাড়া আর নূতন কোন সঞ্চয় ও সঞ্চিত আমার নাই যাহা দেশবাসীকে দিতে পারি। বহু ক্ষত চিহ্ন লাঞ্ছিত ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী বলিবার কিছুই নাই। এই ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, পরাধীন জাতীর জীবনে বেদনা প্রচুর, অপচয় অধিক। তাই আমার মুখে নাহি অভিশাপ, মনে নাই অভিমান। বাংলার রাষ্ট্রবীর, জ্ঞানবীর, কর্ম্মবীর ও আদর্শবাদী দেশ সেবকদের চিন্তা ও কর্ম্মকে জাতির সম্মুখে নিত্য তুলিয়া ধরা সাংবাদিকদের পবিত্র ব্রত। সেই ব্রত হইতে যেন ভ্রষ্ট না হই, দেশবাসীর নিকট এই আশীর্ব্বাদ ছাড়া আমার আর কোন প্রার্থনা নাই।

কতিপয় হিতৈষী বন্ধুর অর্থানুকূল্যে এবং আমার তরুণ সহকর্মীদের উৎসাহে এই সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিলাম। ইঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অনাবশ্যক। ইঁহারা যে বিশ্বাস ও প্রীতি প্রদর্শন করিয়াছেন তার মর্য্যাদা আমি প্রাণপণে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিব। বলা বাহুল্য, "অরণি" বাজার চলন কোন ধারাকে অনুসরণ করিবে না। ছবি, রঙচঙ ও প্রসাধন নৈপুণ্যে পাঠক-পাঠিকাদের মন ভুলাইবার পথ আমি পরিহার করিয়াই চলিব।

ফাটকা বাজার ও সিনেমা, ঘোড়দৌড় ও খেলার মাঠের ক্ষণিক উত্তেজনা ও আত্মবিস্মৃতির অনুকরণ করা "অরণির" উদ্দেশ্য নহে। সাহিত্য, রাজনীতি, শিল্পকলা, সামাজিক উন্নতি, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি জীবনের বিভিন্ন বিভাগে বাঙ্গালীর অভ্যুদয় উন্নতির পথের অতি স্বল্প পরিমাণ বাধাও যদি "অরণি" অপসারণ করিতে পারে, তাহা হইলেই "অরণির" ব্রত সার্থক হইবে।

আমি জানি এই শ্রেণীর সাময়িক পত্র ব্যবসায়ের দিক দিয়া কদাচিৎ সাফল্য লাভ করিয়া থাকে। আদর্শবাদের প্রতি যাঁহাদের নিষ্ঠা আছে; নির্ভীক ও স্বাধীন মতবাদের প্রতি যাঁহারা শ্রদ্ধা পোষণ করেন, তাঁহাদের সহানুভূতি ও সাহায্য ব্যতীত এই শ্রেণীর সাপ্তাহিক কিছুতেই টিকিয়া থাকিতে পারে না। আমার ভরসা আছে, উন্নত রুচি, হৃদয়বান স্বদেশ প্রেমিকদের সহানুভূতি হইতে আমি বঞ্চিত হইব না।

সকল কথা একবারে বা একদিনে বলা যায় না। সাংবাদিক বৃত্তির মধ্য দিয়া অতি সামান্য পরিমাণ দেশ সেবার বিনিময়ে আমি স্নেহ-ভালবাসা প্রীতি প্রচুর পাইয়াছি। দেশবাসীর সেই উদার অনুকম্পা আমার চিত্তকে সতেজ ও নবীন রাখিবে। স্বদেশ ও বিদেশে আজ দুর্দ্দিনের দুর্য্যোগ নামিয়াছে। অতীত বর্ত্তমানের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বনিয়াদ আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কোন প্রাচীন ও পরিচিত ব্যবস্থার মধ্যে এই পুরাতন পৃথিবীতে আমরা মাথা গুঁজিবার ঠাঁই খুঁজিয়া পাইতেছি না। সমষ্টি মুক্তির দুরাকাঙ্খা লইয়া যে রাষ্ট্রীয় সাধনায় বাঙ্গালী দুর্গম পথের যাত্রী হইয়াছিল, সেই সাধনা আজ বিপর্য্যস্ত, ছত্রভঙ্গ। জাতীয় ঐক্যের উপর সে আর বিশ্বাস রাখিতে পারিতেছে না। বিদ্বেষ কলুষিত সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার দিকে সে অসংযত ভাবে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। ইহার বেদনা ও গ্লানিতে যাঁহাদের চিত্ত আলোড়িত, সম্ভ্রম ভরে আমি তাঁহাদিগকে "অরণির" এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আহ্বান করিতেছি। তাঁহারা আসুন। অদ্যকার এই অন্ধকারে আশার আলোক বর্ত্তিকা তুলিয়া ধরুন। বজ্র হইতে ধ্বনি কাড়িয়া লইয়া এই দুর্ভাগা ও বিপথগামী জাতিকে মেঘমন্দ্রে আহ্বান করুন—শ্রেয়ের পথে, কল্যাণের পথে, অভ্যুদয়ের পথে। দুর্দ্দিনের দুরূহ দায়িত্ববোধ জাগ্রত করুন, প্রত্যেকের চিত্তে অদ্যকার কলঙ্কমলিন পরাভবকে আমরা কিছুতেই চরম বলিয়া স্বীকার করিব না। নিশ্চয় করিয়া বিশ্বাস করিব অদ্যকার অন্ধকারের পরপারে আলোকিত প্রভাত বাঙ্গালীর জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ধ্বংসের পর নবীন-জগতের নির্ম্মাণশালার আহ্বান সেদিন ধ্বনিত হইবে, সেদিন বিশ্বমানবের সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া বাঙ্গালীও যাত্রা করিবে তাহার প্রাণশক্তির অফুরন্ত পাথেয় লইয়া। সর্ব্বমানবের সেই সুনিশ্চিত মহৎ কর্ম্মের মধ্যে মহান মুক্তিলাভের অনাগত সুখ দিনকে আসুন আমরা বন্দনা করি।'

অরণি[২] পত্রিকায় আর একটি সংখ্যায় কলকাতার ফুটপাতের কথা লেখা হয়েছিল। কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো :

'এই ফুটপাতই ফেরীওয়ালাদের বিপণী। সস্তা মনিহারী হইতে কাপড়, সাবান, ফল কত কি বেসাতী লইয়া ইহারা ফুটপাত দখল করিয়া বসিয়া থাকে। থইনি খাইবার তহবিলে ঘাটতি পড়িলে মাঝে মাঝে কনেস্টবল বাবুরা ইহাদের তাড়া করেন—এই পর্য্যন্ত। তারপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সূত্রে ফুটপাতের আসল মালিক হইল পানওয়ালা, বিড়ীওয়ালা এবং খাবারের দোকানদারেরা। ইহাদের ক্ষুদ্র দোকানের পরিসর বাড়াইবার জন্য হুকে লাগান কাঠের তক্তা ফুটপাতের উপর প্রসারিত। ইহাদের তোলা উনুনগুলি দুই বেলা ফুটপাতেই প্রচুর ধূম উদ্গীরণ করিয়া জ্বলিতে থাকে। রন্ধন, আহার ফুটপাতেই সারে। ঘটি লোটা তৈজসপত্র ইহারা ফুটপাতের উপরই মাজে ঘষে। পদাতিকদের সুবিধা অসুবিধা ইহারা ভ্রুক্ষেপও করে না। তাহা ছাড়া আজ পর্য্যন্ত সহরবাসী আবর্জনা ফেলিবার কর্পোরেশন-নির্দ্দিষ্ট নিয়ম প্রতিপালন করিতে পারিল না, শিখিল না। এই সকল পায়ে দলিয়া পথিকদের চলিতে হয় এবং কলের খোসায় পা দিয়া অনেকে ধরণী আশ্রয় করে। হাত-পা ভাঙ্গিলে হাসপাতালে যাইতে হয়। পদাতিকদের এই দুঃখের...........অসুবিধার হাত হইতে কি নিস্তার নাই?'

অরণি[৩] পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত "নবযুগ" পত্রিকার কথা। অরণি প্রকাশিত সংবাদ হলো এই :

'বাংলার সর্বজন প্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সম্পাদনায় শীঘ্রই কলিকাতায় "নবযুগ" নামে একখানি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। প্রধানমন্ত্রী হক সাহেব এই পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক। তাঁহারই চেষ্টা ও উদ্যমে এই কাগজখানি প্রকাশিত হইতেছে। প্রতিষ্ঠা দিবসের সভায় হক সাহেব বলিয়াছেন, তাঁহার প্রতিপক্ষেরা তাঁহার বিরুদ্ধে বহু মিথ্যা গুজব প্রচার করিয়া বাঙ্গালী মুসলমানদিগকে বিভ্রান্ত করিতেছে। "নবযুগ" সেই ভ্রান্তি অপনোদনের চেষ্টা করিবে। "নবযুগ" সর্ব্বদাই মুস্লিম স্বার্থ ন্যায় সঙ্গতভাবে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবে, তবে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দিবে না। আমরা এই নবীন দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের সাফল্য কামনা করিতেছি।'

নবযুগ (নব পর্যায়) প্রকাশিত হতো লোয়ার সার্কুলার রোডের ওপর, ক্যাম্বেল হাসপাতালের (বর্তমানে নীলরতন সরকার হাসপাতাল) সামনে একটি বাড়ি থেকে। আমাদের ছেলেবেলায় ইণ্টালি থেকে হেঁটে শিয়ালদহ যাবার সময় ফুটপাতে দাঁড়িয়ে প্রায় নবযুগ পড়তাম। ওই সময় সমস্ত দৈনিক বাংলা কাগজের অফিসের দেওয়ালে তাঁদের কাগজ আঠা দিয়ে লাগিয়ে দেওয়া হতো। অসংখ্য মানুষ বিনা পয়সায় কাগজ পড়তো। সেকালে কাগজের

দাম ছিল অল্প। কিন্তু অসংখ্য মানুষ সস্তার কাগজ ক্রয় করার ক্ষমতা ছিল না। অনেকে ঘুরে ঘুরে রোদে দাঁড়িয়ে কাগজ পড়তেন। প্রায় সব কাগজে পড়ার মতো খবর, এবং নানারকম লেখা থাকতো প্রচুর পরিমাণে।

'নবযুগ' পত্রিকার গোড়ার কথা প্রসঙ্গে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ লিখেছেন ঃ

'দৈনিক কাগজ বা'র করার নূতন প্রস্তাব নিয়ে ফজলুল হক সাহেবের সঙ্গে আমাদের দু'-তিন দিন বৈঠক হলো। ঠিক হলো ২০" ইঞ্চি × ২৬" ইঞ্চি সাইজের ছোট্ট একখানা সান্ধ্য দৈনিক আমরা বার করব। গোল বাধিল কাগজের নাম নিয়ে। ফজলুল হক সাহেব মৌলবী আবদুল করীম সাহেবের মতো একটি মুসলমানী নামের জন্য জিদ ধরলেন। তাঁর যুক্তি এই যে "হিন্দুরা তোমাদের কাগজ কিনবেন না। পক্ষান্তরে মুসলমানেরাও বুঝতে পারবেন না যে কাগজখানা মুসলমানদের। দু' দিক থেকেই তোমরা মার খাবে।" আমরা বললাম, মুসলমানী নামে আমরা কিছুতেই রাজী নয়। আর, বর্তমানে দেশের যে অবস্থা তাতে কাগজ দু' সম্প্রদায়ের লোকই কিনবেন। তাঁরা কাগজের লেখা কিনবেন, কাগজখানা চালাচ্ছেন, হিন্দু, না, মুসলিম, তা তাঁরা দেখবেন না। শেষ পর্যন্ত ফজলুল হক সাহেব আমাদের প্রস্তাব মেনে নিলেন। কাগজের নাম স্থির হলো "নবযুগ'। ফজলুল হক সেলবসী, মুহম্মদ ওয়াজিদ আলী, নজরুল ইসলাম ও আমি স্থায়িভাবে কাজ করব, একথা ফজলুল হক সাহেবকে বললাম, আর মঈনুদ্দীন হুসয়ন সাহেব যে প্রতিদিনই কিছু কিছু সাহায্য করবেন একথাও তাঁকে জানানো হলো। পরে আরও লোকের জোগাড় হবে সে খবরও তাঁকে দিলাম। ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে এক হাজার টাকা জমা দিয়ে মুহম্মদ ওয়াজিদ আলী সাহেবের নামে ডিক্লারেশন নেওয়া হলো।'

মুজফ্‌ফর আহমদ[৫] লিখেছেন ঃ

'১৯২০ সালের মে মাসে "নবযুগ" প্রথম বা'র হয়েছিল।......'

মুজফ্‌ফর আহমদ[৬] আরও লিখেছেন ঃ '...আমার হাতের "নবযুগ" বন্ধ হয়েছিল ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসে।'

মুজফ্‌ফর আহমদ[৭] লিখিত গ্রন্থে "নবযুগ" (নব পর্যায়) প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

'১৯৪২ সালের জুলাই মাসে দৈনিক "নবযুগে" কাজ করেন এমন একজন বন্ধু আমার গোপন বাসস্থানে খবর পাঠালেন যে "কাজী নজরুল ইসলাম হঠাৎ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছেন। কথা বলার সময়ে তাঁর জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে তাঁকে মধুপুরে বিশ্রাম ও বায়ু পরিবর্তনের জন্য পাঠানো হয়েছে।" নজরুল এই সময়ে দৈনিক "নবযুগের" সম্পাদক ছিল।'

খোন্দকার আবদুল খালেক[৮] "নবযুগ" পত্রিকা প্রকাশ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন ঃ

'নজরুলের অতুলনীয় হেডিং ও জোরালো লেখার গুণে এবং কমরেড আহম্মদ সাহেবের আন্তরিক প্রচেষ্টায় একটা সাড়া তুললো পত্রিকা। এডিটরিয়াল ও অন্যান্য খবর পরিবেশনে বিদেশী বৃটিশ সরকারের তীব্র বিরোধিতা করা এবং এদেশের নির্যাতিত মজুর কৃষকদের দাবী দাওয়া পাশাপাশি সমান ভাবে প্রতিফলিত হতে লাগলো। হিন্দু-মুসলমান সকলেই সাগ্রহে কেনে কাগজখানা। উপযুক্ত প্রেসের অভাবে তখন কাগজের চাহিদা মেটানোই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। হক সাহেবের নিকট আসতে লাগলো সম্প্রদায় নির্বিশেষে অনেকের অভিনন্দন পত্র।'

খোন্দকার আবদুল খালেক[৯] লিখিত গ্রন্থে আরও উল্লেখ আছে ঃ

'সরকার বেশীদিন "নবযুগকে" সহ্য করতে পারলেন না। দু' একটা সাবধানী নোটিশ জারি করেই পত্রিকার জামিনের টাকাটা বাজেয়াপ্ত করে নিল। পত্রিকা বা'র করতে হলে এবার দু' হাজার টাকা জমা দিতে হবে। তথাস্তু। দু' হাজার টাকা জমা দিয়ে আবার "নবযুগ" বার করলেন হক সাহেব।'

চিন্মোহন সেহানবীশ লিখিত পুস্তিকায় বহু পত্র-পত্রিকার খোঁজ পাওয়া যায়। বইটির নাম ঃ 'Fifty years of Communist Press' by Chinmohan Sehanavis. বইটিতে উল্লেখ ছিল ঃ 'Communist Party Publication, No 35, October 1975.' উক্ত বই থেকে কিছু কিছু অংশ উল্লেখ করা হলো ঃ

Chinmohan Sehanavis[১০] লিখেছেন ঃ

'1931

Chasi-Majur, Bengali weekly, Calcutta, edited by Baidyanath Mukherji, first issue—24 December 1931.

1932

Din-Majur, Bengali weekly, Calcutta, edited by Swadesh Ranjan Das, first issue—1 September 1932.

1933

Marxvadi, Bengali monthly, Calcutta, edited by Abani Chaudhury ; period of publication—October 1933 to October 1934.

Marxpanthi, a Bengali monthly, Calcutta, first issue—November 1933.

1934

Naya Majdur, Bengali journal.

1935

Ganashakti, Bengali weekly, Calcutta.

1938

Age Chalo, Bengali weekly, Calcutta, edited by Abdul Halim (?) ; Published in 1938 (?).

Ganashakti, Bengali monthly (new series), Calcutta ; period of publication—August 1938 to April 1939.

1942

Janayuddha, Bengali weekly, Calcutta

1945

Swadhinata, Bengali daily, Calcutta, edited by Somnath Lahiri ; first issue 25 December 1945, suppressed on 26 March 1948, but revived in 1951 ; finally closed down in early 1963.'

'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় উল্লেখ থাকতো, 'জনসাধারণের রাজনৈতিক সাপ্তাহিক'। সম্পাদক ঃ বঙ্কিম মুখার্জি, কাগজের দাম ছিল—এক আনা। ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, প্রকাশিত হয়েছিল ঃ 'শনিবার ১৬ই মে, ১৯৪২, ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯ সালে। ২৩নং ডিক্সন লেন, কলকাতা, মণ্ডল প্রেসে কাগজ ছাপা হতো। ২৪৯ নং বৌবাজার স্ট্রীট, কলকাতা থেকে বঙ্কিম মুখার্জি দ্বারা প্রকাশিত হতো। আট পৃষ্ঠা কাগজে গোটা বাংলার বিভিন্ন গ্রামের প্রচুর খবর থাকতো। সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ, নানা সমস্যা দশের সামনে প্রচার করা হতো।

জনযুদ্ধ[১১] পত্রিকায় প্রকাশিত একটি লেখার কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

'পত্রিকার রাজনীতি

আমাদের পত্রিকার এই মুহূর্তের একমাত্র রাজনীতি কি? তা হচ্ছে ফ্যাসিস্ট দস্যুদের আসন্ন আক্রমণ থেকে আমাদের দেশকে বাঁচানোর জন্যে দেশেব সমস্ত নরনারীকে ভয়হীন প্রতিরোধ উদ্দীপিত করা, পৃথিবী ব্যাপী জনযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে সবল হস্তে আমাদের স্বাধীনতা অর্জ্জন করা।

আগের দিনে আমাদের সাহিত্য আমাদের দুর্ব্বল অবস্থার জন্য আত্মরক্ষা ও আত্মশিক্ষার গণ্ডীর মধ্যে বন্ধ থাকতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু ধীর গতিতে অগ্রসর হয়ে রাজনীতি পূরণ করবার সময় আজ আমাদের নেই, জাপানী দস্যুদের আক্রমণের বজ্র এখনই আমাদের দেশের মাথায় ভেঙ্গে পড়েছে। কাজেই আজকে আমাদের পত্রিকাকে আর বর্ম হলে চলবে না, তাকে হতে হবে আক্রমণের ধারালো তলোয়ার—যা সবলে পথ কেটে জনতার মধ্যে পৌঁছবে, তাদেরকে শত্রুর বুক লক্ষ্য করে ছুটবার দুর্দ্দম আগ্রহ ও দুর্ব্বার বেগ এনে দেবে।'

'জনযুদ্ধ' পত্রিকার ওপর ইংরেজ সরকারের সাবধানী পরোয়ানা জারি হয়েছিল। তার সংবাদ এখানে উল্লেখ করা হলো। জনযুদ্ধ[১২] পত্রিকার প্রকাশিত লেখাটি হলো এই ঃ

'দমনের তীব্রতা

দুঃখের হইলেও একথা সত্য যে এদেশের বেশীর ভাগ লোক এ যুদ্ধকে নিজেদের যুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে আজও উৎসাহিত হয় নাই। তাহা করিতে হইলে তাহাদের খণ্ড খণ্ড দাবীকে মানিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় গভর্ণমেন্টের অধিকার দিয়া দেশের বিরাট জাতীয়তাকে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী জাতীয়তায় পরিণত করিতে হইবে। অন্যপক্ষে বাধা বা দমননীতি তাহা-দিগকে যুদ্ধের বিরোধীই করিয়া তুলিবে। কিন্তু কিছুদিন হইতে মনে হইতেছে সরকার যেন স্থির করিয়া লইয়াছেন যে দমননীতিই যুদ্ধকে আগাইবার শ্রেষ্ঠ পন্থা। এ. আই. সি. সি. অফিসে খানাতল্লাস, ন্যাশনাল হেরাল্ডের জামিন দাবী, ইউ-পি তে কয়েকজন কংগ্রেস নেতার গ্রেপ্তার সম্প্রতি হইয়াছে। ৩১শে মে হইতে ৬ই জুন এই ৭ দিনের মধ্যে কাগজের মোটামুটি হিসাবে বাংলাদেশেই মোট ২২টি খানাতল্লাসী, ২৬ জন গ্রেপ্তার, ১ জন দণ্ডিত। শুধু তাই নয়, এই যুদ্ধের স্বপক্ষে প্রচারে ও আন্দোলনে যাহারা অগ্রণী তাহাদের উপরেও গত সপ্তাহে দমন ঘনীভূত হইয়াছে। ছাত্র ফেডারেশন অফিস সার্চ হইয়াছে, তিনজন ছাত্র কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, ঢাকার জনযুদ্ধের কর্ম্মী জিতেন ঘোষকে ডেটিনিউ করা হইয়াছে, "জনযুদ্ধ" পত্রিকার উপর সরকারের সাবধানী পরোয়ানা জারি হইয়াছে।'

'জনযুদ্ধ' পত্রিকা সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সমস্যার কথা লিখতো। যুদ্ধের সময় এক শ্রেণী অসৎ ব্যবসায়ী, চোরা কারবারীর দল গোটা বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ এবং ঘরে ঘরে বস্ত্রের অভাব সৃষ্টি করেছিল। জনযুদ্ধ[১৩] পত্রিকা আগে থেকে সরকারকে সতর্ক করেছিল। জনযুদ্ধের সম্পাদকীয় লেখার কিছু অংশ হলো এই ঃ

'শুধু দর বাঁধাই যথেষ্ঠ নয়

কলিকাতা ও শহরতলীতে সরকার চাউলের দর বাঁধিয়া দিয়াছেন। ১লা জুলাই হইতে দোকানীদের মোটা চাউল খুচরা প্রতি মণ ছ' টাকা চার আনা এবং মাঝারি ধরণের চাল ছ' টাকা বারো আনা হিসাবে বিক্রয় করিতে হইবে হুকুম হইয়াছে। কলিকাতা ও শহরতলীতে এই হুকুম চালু হইবার পর দেখাদেখি মফঃস্বলেও কর্তৃপক্ষ খুব সম্ভব দর বাঁধিয়া দিতে থাকিবেন।

দর বাঁধিয়া দেওয়া বাংলা সরকারের এই প্রথম নয়। চিনি, লবণ, কেরোসিন, কয়লা প্রভৃতি অনেক জিনিষের দর তাঁহারা বাঁধিয়া দিয়াছেন ইহা ভাল কথা। কিন্তু বাঁধা দরে দোকান হইতে জিনিষ কিনিতে পাওয়া যায় কি ?' বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় না।...'

জনযুদ্ধ পত্রিকায় নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হতো পুলিশের হামলায়

কথা। কোথায় কোন দেশকর্মী, শ্রমিক ও ছাত্রনেতার ওপর পুলিশের হামলা হলো, তা' নিয়ে সংবাদ ছাপা হতো। বাঁকুড়ার একটি সংবাদ জনযুদ্ধ[১৪] কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। সংবাদটি হলো এই:

'বাঁকুড়া

গত ১৯শে জুলাই ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি কমরেড অজিত সিংহ ও সম্পাদক কমরেড শিশির মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে এবং বাঁকুড়া শ্রমিক সংঘের অফিসে পুলিস খানাতল্লাস করে। ইহার ৫/৬ দিন আগে কমরেড উদয়ভানু ঘোষ, নন্দদুলাল চট্টোপাধ্যায় ও ক্ষেত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী খানাতল্লাসী হয়। কোথাও কোন আপত্তিকর কাগজ পাওয়া যায় নাই। স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ অথবা ফ্যাসিস্ট বিরোধী কমীদের হয়রাণ করিয়া তাহাদের কাজে বাধা জন্মাইতেছেন।'

জনযুদ্ধ[১৫] পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় লেখার কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো:

'একবার আন্দোলন শক্তিশালী কর

বর্ষা শেষ হইয়া আসিল। ফ্যাসিস্ট আক্রমণ আসন্ন। কিন্তু আমলাতন্ত্রের সে দিকে হুঁশ নাই। ক্রোধে অন্ধ আমলাতন্ত্র তাহার তূণের শেষ হাতিয়ার জনসাধারণের উপর হানিয়াছে। ঘুণে-ধরা সাম্রাজ্যবাদ আজও তাহার পুরাণো হাতিয়ার—ভেদনীতি ও দমননীতির জোরেই দেশ শাসন করিতে চায়। দেশের দুয়ারে যে ফ্যাসিস্ট দস্যু দাঁড়াইয়া সেদিকে তাহার লক্ষ্য নাই।'

'নবীন বাংলা' ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা। সম্পাদক: জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়, পরিচালক সম্পাদক: সদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। মুদ্রাকর ও প্রকাশক: ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সি, এম, এইচ, প্রেস, ২১৬ বহুবাজার স্ট্রীট, কলকাতা। কাগজের প্রতি সংখ্যার দাম ছিল—তিন পয়সা। ৩য় বর্ষ, ৫০শ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল—২১শে ডিসেম্বর, ১৯৪১ সাল। রবিবার, ৬ই পৌষ, ১৩৪৮ সাল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, 'নবীন বাংলা' পত্রিকায় বিভিন্ন সংখ্যায় ছাপা হতো মানবেন্দ্রনাথ রায়ের কথা এবং র‍্যাডিক্যাল পার্টির সংবাদ।

'জনতা' ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা। সম্পাদক: হরিকুমার চক্রবর্তী। কাগজ ছাপা হতো আর্ট প্রেস, ২০ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট, কলকাতা। কাগজের অফিসের ঠিকানা ছিল—১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা। কাগজ প্রতি সংখ্যার দাম ছিল—এক আনা। ৩য় বর্ষ, ৪৭শ সংখ্যা, রবিবার, ১৫ই মাঘ, ১৩৫১, ২৮শে জানুয়ারী ১৯৪৫ সালের সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল: বোম্বাই পরিকল্পনার ২য় অংশ সম্বন্ধে মানবেন্দ্রনাথের অভিমত ও অন্যান্য লেখা।

জনতা[১৬] পত্রিকায় প্রকাশিত একটি লেখার কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

'আমরা পরাধীন জাতি, তাই স্বাধীনতা পাওয়াই আমাদের সমস্যা এ কথা সবাই বলে। সত্যই স্বাধীনতা কি করে লাভ করা যায় এ নিয়ে সভা-সমিতিতে বাক-বিতণ্ডার আর অন্ত নাই। দলবদ্ধ ভাবে এই স্বাধীনতা পাবার জন্য চেষ্টা চলছে আজ ২৫ বছর। কত বরেণ্য নেতা কত রকম করেই না এই স্বাধীনতার বাণী প্রচার করে আসছেন। দেশবাসী, সশ্রদ্ধ অন্তরে সে সব বাণীর নিগূঢ় তাৎপর্য্য যতটুকু গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে তার যথার্থ অর্থ যদি করা যায় তবে নির্ভয়ে বলা যায় যে, বিদেশী-বিদ্বেষ প্রচারই তার মুখ্য উদ্দেশ্য। দেশভক্তির মূল্য ততখানিই ধার্য্য হয় যতখানি এই বিদেশী বিদ্বেষ প্রচার সাফল্য লাভ করে। সে জন্য স্বাধীনতা বলতে মুখ্যতঃ এই বিদেশীর অধীনতা পাশ হতেই যে মুক্তি বোঝায় তা বলাই বাহুল্য। আজ ২৫ বছর ধরে আমাদের নেতাদের কাছ থেকে আমরা এই শিক্ষাই পেয়ে এসেছি। কারণ আমরা আজ ঠিক বুঝে ফেলেছি যে আমাদের সর্ব্ববিধ দুঃখ-দৈন্যের মূলেই রয়েছে বিদেশীর অধীনতা।

পরাধীনতা আমাদের দুঃখ-দৈন্যের একটা মস্ত বড় কারণ তাতে কোনও সন্দেহ নাই। রাষ্ট্রশক্তিহীন জাতি মানব-সমাজে জাতি বলে বিবেচিত হয় না। জগৎসভায় পদ-মর্য্যাদায় হীনস্তরে তাদের স্থান। কারণ মনুষ্যোচিত গুণ গরিমায় হীন না হলে কোন জাতি পরাধীন হতে পারে না, ইহা স্বতঃ-সিদ্ধ। সেজন্য পরাধীনতা হীনতার লক্ষণ। কিন্তু পরাধীনতাই যে আমাদের দুঃখ-দৈন্যের একমাত্র কারণ এ কথা বলতে একটু মনে দ্বিধা আসে। সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেই কি এমন কিছু প্রচ্ছন্ন নাই যা বহাল রেখে সমাজের মধ্যে যুগে যুগে দুঃখ-দৈন্যের পাষাণ ভার ক্রমেই বৃদ্ধি করে তোলা হচ্ছে? আমাদের রাষ্ট্রশক্তি আজ বিদেশী ইংরাজের কবলগত। সেই পরহস্তগত রাষ্ট্রশক্তিকে উদ্ধার করাই কি আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের চরম লক্ষ্য? সমাজ-জীবনের শ্রেষ্ঠ শক্তি রাষ্ট্রশক্তি; এই শক্তি সংহত ও সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে রাষ্ট্রের রূপেই দেখা দেয়। বিদেশীর হস্ত থেকে শক্তিলাভ করাই কি একমাত্র উদ্দেশ্য? শক্তিলাভের জন্যই কেহ শক্তিলাভে প্রয়াসী হয় না, যদি না সেই শক্তিকে লাভ করে জীবনের প্রয়োজনে লাগানোর প্রয়োজন থাকে। নিষ্প্রয়োজনে শক্তিলাভ করবার প্রচেষ্টা কোনও মনুষ্য-সমাজ কোন দিন করে নাই। জীবনের প্রয়োজন সাধন করতে সত্যই শক্তির প্রয়োজন। ভারত আজ রাষ্ট্রশক্তিহীন; সমগ্র ভারত-সমাজের প্রয়োজনেই আজ সেই পরহস্তগত রাষ্ট্রশক্তিকে উদ্ধারের জন্য এত আয়োজন, এত আন্দোলন, এত ত্যাগ, এত নির্য্যাতন ভোগ। তা না হলে ত সবই পণ্ডশ্রম ও সবই ভস্মে ঘী ঢালা।'

প্রসঙ্গপঞ্জী

১। অরণি, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, ২২শে আগস্ট ১৯৪১।
২। ঐ ঐ ৩য় সংখ্যা ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৪১।
৩। ঐ ঐ ৮ম সংখ্যা ১৭ই অক্টোবর ১৯৪১।
৪। মুজফ্ফর আহমদ, কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতি কথা পৃঃ ৭২।
৫। ঐ পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃঃ ১০২।
৬। ঐ ঐ
৭। ঐ ঐ পৃঃ ৪৬১।
৮। খোন্দকার আবদুল খালেক, এক শতাব্দী, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারা সম্বলিত শেষে বাংলার ধারাবাহিক জীবন কাহিনী ঢাকা, ১৩৬৯।
৯। খোন্দকার আবদুল খালেক, পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থ।
১০। Chinmohan Sehanavis, Fifty years of Communist Press.
১১। জনযুদ্ধ, ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা ১৬ই মে ১৯৪২, ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৯৪৯।
১২। ঐ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, বুধবার, ১০ই জুন ১৯৪২, ২৭শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯।
১৩। ঐ ১ম সংখ্যা, ১লা জুলাই ১৯৪২, ১৬ই আষাঢ় ১৩৪৯।
১৪। ঐ ১৫শ সংখ্যা ১২ই আগস্ট ১৯৪২, ২৭শে শ্রাবণ ১৩৪৯।
১৫। ঐ ২২শ সংখ্যা ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৪২, ১৩ই আগস্ট, ১৩৪৯।
১৬। জনতা, ৩য় বর্ষ ৪২শ সংখ্যা রবিবার, ১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩৫১, ৩রা ডিসেম্বর ১৯৪৪।

৯। বাংলা পত্র-পত্রিকা পরিচালনায় বঙ্গনারী

খ্যাতনামা লেখক যোগেশচন্দ্র বাগল[১] লিখেছেন :

'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলনে বঙ্গনারীর কৃতিত্ব অসাধারণ। তাঁহারা প্রথমে প্রকাশ্যভাবে পুরুষের সঙ্গে রাজনীতিতে যোগ দেন নাই বটে, কিন্তু নিরালায় বসিয়া নানাভাবে ইহার রসদ জোগাইতে সচেষ্ট ছিলেন।'

যোগেশচন্দ্র বাগল[২] আরও উল্লেখ করেছেন : 'বৃটিশরাজ তিলে তিলে এদেশবাসীদের অকথ্যভাবে শোষণ করিতেছিলেন, শাসনেও তাঁহাদের অনাচার প্রকট হইয়া পড়িতেছিল। এই পুঞ্জীভূত অনাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে 'শিক্ষিত' সমাজ যে সার্থক আন্দোলন পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিয়া দেন তাহাতে ঐকান্তিকভাবে সাহায্য করেন।'

দেশের উচ্চ বিত্ত সমাজের অনেক মেয়েরা ঘরে থেকে দেশকর্মীদের নানাভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে উৎসাহিত করেছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে বহু আদিবাসী মেয়েরা পুরুষদের পাশে টাঙ্গি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আদিবাসী মেয়েরা বিভিন্ন আন্দোলনে পুরুষদের সঙ্গে তীর-ধনুক নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন অত্যাচারীর সঙ্গে মোকাবিলা করতে। আমাদের আলোচনার বিষয় বাংলা পত্র-পত্রিকা পরিচালনায় বঙ্গনারী। এই কারণে আদিবাসী মেয়েদের শ্রদ্ধা জানিয়ে আমাদের বিষয়ে ফিরে আসা যাক।

স্বাধীনতার জন্য সাধারণ মানুষকে ইংরেজের বিরুদ্ধে নিয়ে যাওয়া, আর এক দিকে সামাজিক ব্যাপারে নানাভাবে দেশবাসীর স্বদেশী মনোভাব গড়ে তোলার জন্য বঙ্গনারীর দান কম নয়। বিভিন্ন সময় বাংলার মহিলা কবি, সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক কর্মীরা পত্র-পত্রিকা বের করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯২৩-২৪ সালে, ৯ নং সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা থেকে 'বন্দেমাতরম' দৈনিক বাংলা সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। এই কাগজ প্রায় এক হাজার ছাপা হতো। শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার এই কাগজ বের করতেন।

প্রায় ওই সময় কলকাতার ২৫ নং বাদুড়বাগান লেন থেকে প্রকাশিত হতো বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র—'বঙ্গনারী'। প্রেসের নামও ছিল 'বঙ্গনারী প্রেস'। বঙ্গনারী পরিচালনা করতেন শ্রীমতী মনোরমা মজুমদার। এই কাগজ মাত্র তিনশো ছাপা হতো।

১৯২৪ সালে উত্তর কলকাতার ৬৫ নং সারপেনটাইন লেনের—'ক্যালকাটা প্রিন্টিং ওয়ার্কস' থেকে ছাপা হতো—'নবভারত পত্রিকা'। নবভারত ছিল মাসিক কাগজ। এই কাগজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন শ্রীমতী কুমুদনলিনী রায়চৌধুরী। শ্রীমতী রায়চৌধুরীর বাড়ির ঠিকানা ছিল—২১০/৫ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা।

কমলা দাশগুপ্তা[৩] লিখেছেন ঃ

'বাসন্তী দেবীকে গ্রেপ্তারের তিনদিন পরেই ১০ই ডিসেম্বর গ্রেপ্তার করা হয় দেশবন্ধুকে। দেশবন্ধুর গ্রেপ্তারের পর "বাঙ্গলার কথা" পত্রিকা বাসন্তী দেবীকেই সম্পাদনা করতে হয়।'

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'বাঙ্গলার কথা' প্রকাশিত হতো ৭ নং ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা থেকে। কাগজ ছাপা হতো—মেটকাফ প্রেস, ৭৯ নং বলরাম দে স্ট্রীট, কলকাতা। এই কাগজ নিয়ে আগেও উল্লেখ করা হয়েছে। তবু আবার উল্লেখ করা হলো।

'বাঙ্গলার কথা' প্রথম ভাগ, ৯২শ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ৮ই পৌষ ১৩২৮, ২৩ ডিসেম্বর ১৯২১ সাল। কাগজ প্রতি সংখ্যার দাম ছিল—এক আনা। এই সংখ্যার সম্পাদিকা ঃ শ্রীমতী বাসন্তী দেবী।

কমলা দাশগুপ্তা[8] লিখেছেন ঃ

'১৯৩০ সালে লীলা নাগের সম্পাদনায় "জয়শ্রী" নামে মহিলাদের একটি মুখপত্র রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী নিয়ে প্রকাশিত হয়। এটি মহিলাদের স্বারাই পরিচালিত ছিল এবং এব লেখকগোষ্ঠীও গঠিত ছিল প্রধানতঃ মহিলাদেব স্বারাই।

বিভিন্ন সময়ে "জয়শ্রী"র সম্পাদিকা ছিলেন ঃ লীলা নাগ (রায়)—বৈশাখ ১৩৩৮—চৈত্র ১৩৩৮ ; আষাঢ় ১৩৪৫—চৈত্র ১৩৪৮ ; ফাল্গুন ১৩৫৩—মাঘ ১৩৫৬ ; বৈশাখ ১৩৫৭-১৩৬৯ পর্যন্ত।

শকুন্তলা দেবী (রায়)—বৈশাখ—১৩৩৯—আশ্বিন ১৩৪০ পর্যন্ত।

বীণাপাণি রায়—কার্তিক ১৩৪০—চৈত্র—১৩৪০ পর্যন্ত।

উষারাণী রায়—বৈশাখ—১৩৪১—চৈত্র—১৩৪২ পর্যন্ত।

(লীলা নাগ জেলে ছিলেন সে সময়ে এঁরা তিনজন সম্পাদিকা ছিলেন।)

বৈশাখ—১৩৪৩—জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ পর্যন্ত এবং বৈশাখ ১৩৪৯—মাঘ ১৩৫৩ পর্যন্ত সরকার কর্তৃক জয়শ্রী প্রচাব বন্ধ ছিল।

'মন্দিরা' পত্রিকার প্রথম সম্পাদিকা শ্রীমতী কমলা (চট্টোপাধ্যায়) মুখোপাধ্যায়েব কাছে শুনেছি ঃ মন্দিরা পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল শ্রীমতী কল্যাণী (দাস) ভট্টাচার্য-এর চেষ্টা ও অর্থ সাহায্যে। শ্রীমতী কল্যাণী ভট্টাচার্য কটকে জন্মগ্রহণ কবেন। পিতা—বেণীমাধব দাস, মাতা সরলা দাস, ছোট ভগ্নী বীণা দাস। পিতৃভূমি—চট্টগ্রাম। ভারতেব স্বাধীনতা আন্দোলনে এই পরিবারের দান বিরাট। কমলা (চট্টোপাধ্যায়) মুখোপাধ্যায় সম্পাদিকা হয়েছিল, ১৯৩৮ সালে। মন্দিরা মাসিক পত্রিকা রূপে প্রকাশিত হতো। কাগজ ছাপা হতো—কলকাতার শ্রীসরস্বতী প্রেস থেকে। প্রায় এক বছর তিনি সম্পাদিকা ছিলেন। হ্যারিসন রোডে একটি বাড়ির দোতলায় কাগজের অফিস হয়েছিল। কমলা দেবী আরও জানিয়েছিলেন, কল্যাণী ভট্টাচার্য চেয়েছিলেন দলমত নির্বিশেষে সকল মেয়েদের কাগজরূপে যেন 'মন্দিরা' প্রকাশিত হয়।

মন্দিরা প্রসঙ্গে কমলা দাশগুপ্তা[৫] লিখেছেন ঃ

'১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে (বাংলা ১৩৪৫ সালের ১লা বৈশাখ) তিনি মহিলা রাজনৈতিক কর্মীদের মুখপত্র "মন্দিরা" প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাতে তিনি নিজে সম্পাদিকার পদ গ্রহণ না করলেও, পত্রিকা প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভিক সমস্ত সংগঠনই তিনি করেন।'

কমলা দাশগুপ্ত[৬] আরও উল্লেখ করেছেন ঃ 'মন্দিরা মাসিক পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন ঃ কমলা চ্যাটার্জী—বৈশাখ ১৩৪৫ থেকে কার্তিক ১৩৪৫ পর্যন্ত। কমলা দাশগুপ্ত—অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ থেকে শ্রাবণ—১৩৪৯ ;

পৌষ ১৩৫২ থেকে চৈত্র ১৩৫৪ পর্যন্ত ; স্নেহলতা সেন—ভাদ্র ১৩৪৯ থেকে অগ্রহায়ণ ১৩৫২ পর্যন্ত।'

কমলা দাশগুপ্তা[৭] ভারতের মুক্তিযুদ্ধে বাংলার মেয়েদের কথা বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন কয়েকটি সাময়িক পত্রের কথা :

'এদেশের নারী তখন প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ। শান্তি, সুনীতি ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সকে নিহত করেছেন। বীণা দাস কলিকাতা সেনেট হলে গভর্ণর জ্যাকসনকে গুলী করেছেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার শহীদ হয়েছেন। ওদিকে "বেণু", 'স্বাধীনতা পত্রিকা' এবং "চলার পথে" প্রভৃতি পুস্তক বিপ্লবের পথে আত্মাহুতি দেবার জন্য যুব বাংলাকে আহ্বান জানাচ্ছিল। সেই আহ্বান সেই যুগে তরুণ তরুণীদের চিত্তে বার বার ধ্বনিত হচ্ছিল।'

কমলা দাশগুপ্ত[৮], কমলা (চট্টোপাধ্যায়) মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গে লিখেছেন—'কমলা চট্টোপাধ্যায় ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত হিজলী ও অন্যান্য জেলে রাজবন্দী ছিলেন। তিনি ময়মনসিংহের যুগান্তর বিপ্লবীদলের বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন।'

সেকালের আর একটি নামকরা সচিত্র মাসিক পত্র—'বঙ্গলক্ষ্মী'। এই কাগজের সম্পাদিকা ছিলেন— হেমলতা দেবী। কাগজ ছাপা হতো—ক্লাসিক প্রেস, ২১, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা। কাগজ প্রকাশিত হতো—৬০বি মির্জাপুর স্ট্রীট, কলকাতা থেকে। কাগজ প্রতি সংখ্যার দাম ছিল—চার আনা। 'বঙ্গলক্ষ্মী' কাগজে বিভিন্ন সময়ে লিখতেন : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরোজনলিনী দত্ত, মায়া বসু, লেডী নিরুপমা সিংহ, শিবরতন মিত্র, পরিমল গোস্বামী, শান্তি পাল, মনুজ সর্বাধিকারী, বন্দেআলী মিয়া, ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, লতিকা ঘোষ, অখিল নিয়োগী, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর কালিদাস নাগ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নিরুপমা দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী, শান্তা দেবী এবং আরও অনেকে।

বঙ্গলক্ষ্মী কাগজে বিভিন্ন স্থানের মহিলা সমিতির সংবাদ ছাপা হতো।

লাবণ্যপ্রভা দত্ত বিভিন্ন সময়ে স্বদেশী ইস্তাহার প্রকাশিত করেছিলেন। ইস্তাহার প্রকাশিত করার আগে কোন রকম সরকারী নির্দেশ গ্রহণ করতেন না। 'দেশবাসীর প্রতি নিবেদন' একটি ইস্তাহার লাবণ্যপ্রভা দত্ত প্রকাশিত করেন। এই ইস্তাহার প্রকাশিত হয়েছিল ২৪ পরগণা জেলা কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে। ১৯৩২ সালে ইংরেজ সরকার কর্তৃক ইহা নিষিদ্ধ ইস্তাহার রূপে ঘোষিত হয়েছিল।

প্রসঙ্গপঞ্জী

১। যোগেশচন্দ্র বাগল, জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী, ভূমিকা।
২। যোগেশচন্দ্র বাগল, পূর্বে উল্লিখিত বই, ভূমিকা।
৩। কমলা দাশগুপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী পৃষ্ঠা ৪৯।
৪। কমলা দাশগুপ্ত পূর্বে উল্লিখিত বই, পৃষ্ঠা ৮৪
৫। কমলা দাশগুপ্ত ঐ পৃষ্ঠা ৯৩
৬। কমলা দাশগুপ্ত ঐ পৃষ্ঠা ১২৩
৭। কমলা দাশগুপ্ত ঐ পৃষ্ঠা ১৩৭
৮। কমলা দাশগুপ্ত ঐ পৃষ্ঠা ২৭৮

১০ ॥ পত্র-পত্রিকা স্বাধীনতার ইতিহাস রচনার দলিল

বিভিন্ন সময়ে গোটা বাংলাদেশের ওপর দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের ঝড় বয়ে গেছে। ওই সব রাজনৈতিক ঝড়ের আঘাতে শক্তিশালী ইংরেজ সরকারের বিরাট শক্তিকেও নাড়া দিয়েছিল। বারে বারে ঝড়ের মতো জেগে উঠেছিল দেশের মানুষ। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে এক নতুন ধরনের জাগরণ দেখা দিয়েছিল। জাগরণের প্রভাব পড়েছিল বাংলা কাব্যে-সাহিত্যে, সংবাদপত্রে। ওই সময় অসংখ্য স্বদেশী গান রচিত হয়েছিল। তারপর শুরু হলো বিপ্লবী-আন্দোলন। বিপ্লবীদের বোমার কারখানা স্থাপনের ভেতর দিয়ে সশস্ত্র বিদ্রোহের দিকে যুব সমাজকে আকৃষ্ট করেছিল বেশী করে। একদিকে অসহযোগ আন্দোলন অপরদিকে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় শুরু হয়েছিল দেশের দিকে দিকে স্বদেশী ডাকাতি। সে দিনের বিপ্লবীরা অনেক হত্যা মামলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। এখানে কয়েকটি মামলার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন ঃ চাঁদপুর পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টর হত্যা মামলা (ত্রিপুরা), আশানুল্লা হত্যা মামলা (চট্টগ্রাম), ওয়াটসন হত্যা-প্রচেষ্টা মামলা (কলকাতা), কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট গুলি চালনা মামলা (কলকাতা), গ্রাসবী হত্যা প্রচেষ্টা মামলা (ঢাকা), বার্জ হত্যা মামলা (মেদিনীপুর), আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা (কলকাতা), টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা (২৪ পরগণা) হিলি ষড়যন্ত্র মামলা (দিনাজপুর), চরমুগরিয়া ডাক-লুঠের মামলা (ফরিদপুর), আর্মেনিয়ান স্ট্রীট মামলা (কলকাতা), কুমিল্লা গুপ্তচর হত্যার ষড়যন্ত্র ও ইটাখোলা ট্রেন-লুঠ মামলা,

ঢাকা গুপ্তচর হত্যা মামলা, ফরিদপুর গোয়েন্দা পুলিশ হত্যা মামলা, গভর্ণর হত্যা মামলা (লেবং-দার্জিলিং), দাসপুর দারোগা হত্যা মামলা (মেদিনীপুর), রংপুর ষড়যন্ত্র মামলা, বাথুয়া ষড়যন্ত্র মামলা (চট্টগ্রাম), চট্টগ্রাম গুপ্তচর হত্যা প্রচেষ্টা মামলা, বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইন ভঙ্গের মামলা (চট্টগ্রাম), মেছুয়াবাজার বোমার মামলা (কলকাতা), এ রকম আরও অনেক মামলা সেদিন হয়েছিল। এই সব ঘটনা ও মামলার জন্য ইংরেজ শাসকদের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন সেদিনের বিপ্লবীরা। বিভিন্ন আন্দোলনে অসংখ্য দেশ-প্রেমিকরা প্রাণ দিয়েছিলেন। এই সব ঘটনার সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন সেদিনের পত্র-পত্রিকা। পত্র-পত্রিকা স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস রচনার দলিল।

বিপ্লববাদ কি ভাবে গোটা বাংলায় দেখা দিয়েছিল এই প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের[১] লেখার কিছু অংশ হলো এই:

'স্বাধীনতা আন্দোলনের উৎপত্তি

বাঙ্গালার বিপ্লবপন্থা জনকতক অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত যুবকদের হুজুগের দ্বারা সৃষ্টি হয় নাই। বিপ্লববাদের ইতিহাসের উৎপত্তির কথা জানিতে হইলে, বাঙ্গালার বিগত ৮০ বৎসরের ইতিহাসের চর্চা করিতে হইবে। বাঙ্গালার বিপ্লববাদের ইতিহাস বর্তমান বাঙ্গালার ইতিহাস হইতে বাদ দেওয়া যায় না; কারণ ইহা exotic নহে। ইহা বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের ক্রমবিকাশের একটি স্তর মাত্র। (১) রামগোপাল ঘোষের সময় (নব্য বঙ্গের) ইয়ং বেঙ্গলের অভ্যুদয়। তৎপরে ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব ও বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের চিন্তার উপর তাহার প্রভাব; রাজনারায়ণ বসুর (২) বৈপ্লবিক মত ও নবগোপাল মিত্রের জাতীয় বা হিন্দুমহামেলা, (৩) "নেশানেল পেপারের" সংস্থাপনা; "নেশানেল থিয়েটার" স্বদেশ প্রেমমূলক নাটকসমূহের অভিনয়; তৎপরে হিন্দুধর্ম্ম পুনরুত্থানকারীদের অভ্যুদয়; বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতির বৈপ্লবিক চেষ্টা ও তদনুসারে হুগলীর চারিদিকে লাঠিখেলার আখড়া স্থাপনা; শিবনাথ শাস্ত্রীর দেশসেবার উদ্যম, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসুর বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা ও "ষ্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশান" স্থাপনা ও শেষে "ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশান" ও কংগ্রেসের কার্য্য; শিশিরকুমার ঘোষের বৈপ্লবিক কল্পনা-জল্পনা; তৎপরে স্বামী বিবেকানন্দের আক্রমণশীল হিন্দুধর্ম্মের (Aggressive Hinduism) মতবাদ এবং শেষে বিপ্লববাদীদের দলস্থাপনা ও কর্ম্ম—এই গুলি বাঙ্গালার জাতীয় জীবনের ক্রমবিকাশের পরপর স্তর।'

১৯০৬ সালে বিপ্লবীদের মুখপত্র 'যুগান্তর' প্রকাশিত হয়েছিল। একথা

আগে আলোচনা করা হয়েছে। তারপর থেকে শুরু হলো সশস্ত্র বিপ্লবের জয়গান। বিপ্লবী সাংবাদিকরা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে লিখতে শুরু করলেন। বিপ্লবী কর্মীরা বেরিয়ে পড়লেন বোমা আর পিস্তল নিয়ে। গড়ে উঠেছিল কলকাতায় মুরারীপুকুরে সশস্ত্র বিপ্লবের ঘাঁটি। ফুলার সাহেবকে হত্যার জন্য বিপ্লবীরা আক্রমণ করেছিলেন। ঢাকার ম্যাজিস্টেট অ্যালেনকে গুলী করেছিলেন বিপ্লবীরা। এ-রকম বহু ঘটনা ঘটেছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর সহ-কর্মীরা বালেশ্বরে পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। ১৯৩০ সালে সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগারের অস্ত্র লুটের এক অঘটনীয় কাজ করেছিলেন বিপ্লবীরা। তার পর তাঁরা করলেন যুদ্ধ। অনেক বিপ্লবী যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছিলেন। সন্ত্রাসবাদীর পথ বহু দেশকর্মীর মনে দাগ কেটেছিল। সেদিন অনেকে মনে করতেন যে সন্ত্রাসবাদের মধ্য দিয়ে বিদেশীর অত্যাচার দূর হবে। পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে দেশবাসী মুক্তি পাবে। কিন্তু তা' সফল হয় নি। সেদিনের সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ[২] লিখেছেন ; কিছু অংশ হলো এই ঃ

'সন্ত্রাসবাদীরা তর্ক তুলে বলতে পারেন যে, তাঁদের পন্থাকে সন্ত্রাসবাদ নাম দেওয়া শাসকদের রাগের কথা ; আসলে তাঁরা বিপ্লববাদী, তাঁদের আছে সুস্পষ্ট পথ ও প্রোগ্রাম, এলোমেলো ধ্বংসের দূত সন্ত্রাসবাদী তাঁরা নন। বেশ তো, আমার পূর্ব সহযাত্রী বন্ধুদের যাঁরা বন্দীশালায় আজ ব্যর্থতার মাঝে জীবনের লহরী গুনছেন আর যাঁরা পালিয়ে বনে বাদাড়ে আছেন, তাঁদের যে কেউ আমাকে বুঝিয়ে দিন, যে, স্বরাজ-লাভের সুস্পষ্ট সুগম পন্থা ধরে দেশে তাঁরা একতাবদ্ধ সংহত এক দল গড়তে আজও পেরেছেন। আমরা যুগান্তরের দল গোড়ায় ছোট হলেও সংহত এক প্রাণ এমনি একটি দল গড়ে সুস্পষ্ট প্রোগ্রাম নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। ঘটনাচক্রে এবং অসম্ভব বলে তা' টিকে নাই, দেশের শুধু আংশিক জাগরণ এনে নিভে গিয়েছিল। তখন যা' হয় নাই, এখন তা' আরও অসম্ভব।'

দৈনিক বসুমতী, ১৬৬ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতো। ১৯২০ সালে ইংরেজ সরকার একটি লেখা ছাপার জন্য সতর্ক করে দেয়।

'জনসেবক' ছিল মাসিক পত্রিকা। এই পত্রিকা ১৯২৪ সালে ৫ নং সুকিয়া স্ট্রীট, কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতো। সম্পাদক ছিলেন শৈলেশনাথ বিশী। এই মাসিক পত্রিকায় স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা ছাপা হতো।

'কাঙাল' ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা। সম্পাদক—খন্দকার নাজিরুদ্দিন আহম্মদ, পাংশা, জেলা ঃ ফরিদপুর।

'খুলনাবাণী' ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা। সম্পাদক—ভোলানাথ স্মৃতিরত্ন। খুলনা থেকে এই কাগজ প্রকাশিত হতো। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এক সময় এই কাগজের সম্পাদক ছিলেন গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ১৯১১ সালে রাজদ্রোহ কবিতা লেখার জন্য গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একশো টাকা অর্থদণ্ড হয়েছিল।

'নবসংঘ' (সাপ্তাহিক), প্রকাশিত হতো চন্দননগর (হুগলী) থেকে। সম্পাদক ছিলেন অরুণচন্দ্র দত্ত। এই পত্রিকার সঙ্গে জড়িত ছিলেন মোতিলাল রায়।

বাংলা ১৩৮২ সালে ১৩ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে দেশপ্রেমিক লেখক ও সাংবাদিক বিধুভূষণ বসু জন্মগ্রহণ করেন। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বিধুভূষণ বসুর অগ্নিবর্ষী লেখনী সেকালের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রেরণা দিয়েছিল। ১৯০৯ সালে বিধুভূষণকে 'প্রতিকার' নামে একখানি রাজনৈতিক গল্প লেখার জন্য রাজদ্রোহের অভিযোগে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল। তাঁর অসংখ্য কবিতা, গান, গল্প ও অন্যান্য রচনা এক সময় অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। বিদেশী শাসন ও শোষণ থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য তিনি স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে বহু গান ও উপন্যাস লিখেছিলেন।

সেকালের স্বাধীনতা আন্দোলনের যাঁরা ছিলেন কর্ণধার, তাঁদের অনেকের সঙ্গে বিধুভূষণ বসুর ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচয় ছিল। তিনি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্ভীক তেজস্বী সাংবাদিক ও কর্মনায়ক ব্রহ্ম-বান্ধব উপাধ্যায়, বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পালের সহকর্মী ছিলেন।

বঙ্গচ্ছেদ সরকারী ভাবে যে দিন কার্যকরী হয়েছিল অর্থাৎ ১৬ অক্টোবর ১৯০৫ সাল অর্থাৎ ৩০শে আশ্বিন ১৩১২ সাল। এই কারণে সেকালে ৩০শে আশ্বিন স্মরণীয় আন্দোলনের দিন হিসাবে গণ্য হতো। রাখী-বন্ধনের দ্বারা এই দিনটি উদ্‌যাপিত করা হত। অনেকে সেদিন অরন্ধনও করতেন। সেদিন সারা বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলন ব্যাপক ভাবে চলছিল। গ্রামে-শহরে-বন্দরে-রেল স্টেশনে বিলাতী বস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী বর্জনের জন্য দেশকর্মীরা প্রচারে নেমেছিলেন। পূর্ববঙ্গ—আসাম তখন পৃথক প্রদেশ। স্যার ব্যামফীল্‌ড ফুলার নতুন প্রদেশে ছোটলাট হয়ে দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজ্য শাসন করছিলেন। তাঁর আদেশে প্রকাশ্য স্থলে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ পর্যন্ত নিষিদ্ধ হয়েছিল। বিধুভূষণ এই সময় গান লিখেছিলেন :

ফুলার আর কি দেখাও ভয়, / দেহতো মোর অধীন বটে, / মন তো স্বাধীন রয়।

এই গান সেকালে অনেক দেশকর্মীদের কণ্ঠে কণ্ঠে ঘুরতো।

James Campbell Ker ও লিখেছেন :

'Bidhu Bhusan Bose, Born about 1875, Son of Jadunath Bose of Bistupur, Khulna District. In March 1910, he was sentenced to two years imprisonment in the Pallichitra sedition case.'

পল্লীচিত্র[৪] (মাসিক পত্র) থেকে একটি লেখার কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

'১৩১৪ সালের ভাদ্র মাসে আমাদের স্বনামধন্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসু 'পল্লীচিত্র' প্রথম প্রকাশ করেন। পাঁচ মাস প্রকাশিত হইবার পর মুদ্রাযন্ত্রের গোলযোগের প্রায় ৫।৬ মাস পল্লীচিত্র বন্ধ থাকে। এই সময় বহু চেষ্টায় এবং বহু হিতৈষীবর্গের অনুগ্রহে ও সাহায্যে পল্লীচিত্র মেসিন প্রেস স্থাপিত হয় ও ১৩১৫ সালের আষাঢ় মাসে স্বীয় প্রেসে স্বাধীনভাবে প্রকাশিত হয়। পরে ক্রমশঃ অন্যান্য সংখ্যা প্রকাশিত হইতে থাকে। ৩য় বর্ষের ২য় সংখ্যা পর্য্যন্ত পল্লীচিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। ৩য় সংখ্যা প্রকাশিত হইতে যাইতেছিল এমন সময় দৈব দুর্ব্বিপাকে পুলিস কর্তৃক প্রেস বন্ধ করিয়া যাওয়ায় প্রেস ও পত্রিকা বন্ধ থাকে।...'

'পল্লীচিত্র' প্রথমে মাসিক পত্রিকা রূপে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে 'পল্লীচিত্র' সাপ্তাহিক পত্রিকা রূপে প্রকাশিত হতো। সম্পাদক ছিলেন—বিধুভূষণ বসু। কাগজ ছাপা হতো পল্লীচিত্র প্রেস বাগেরহাট থেকে। ওই সময় কাগজের প্রকাশক ছিলেন এ. বক্সী। কাগজ প্রতি সংখ্যার দাম ছিল এক আনা।

পল্লীচিত্র[৫] কাগজে প্রকাশিত একটি লেখা এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

'অতীতের নির্মম অত্যাচারই দুনিয়ার যুব আন্দোলনের সৃষ্টির একমাত্র কারণ। ইহার পিছনে ছিল রাজশক্তির দুর্ব্বিসহ অবিচারের মর্ম্মন্তুদ ব্যথা ; এর মূলে ছিল ধন ও আভিজাত্যের কদর্য্য বিভীষিকা। নেতৃত্বের অযোগ্যতার জন্য যখন সমাজ রাষ্ট্র বা জাতি বিপন্ন হয়েছে, তখনই বিদ্রোহী হয়েছে, সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে, আত্মদান করে জাতিকে মুক্ত করেছে।

জীবনের যৌবনের এবং দেশপ্রেমের প্রাচুর্য্য নিয়ে দাঁড়াও, লক্ষ্য—পরিপূর্ণ স্বাধীনতা, পরিপূর্ণ শান্তি। কর্মক্ষেত্র কৃষক ও শ্রমিকদিগের মধ্যে। পুরস্কার দেশবাসীর বিদ্রূপ ও রাজশক্তির আক্রোশ। সকল অবসাদে একমাত্র স্বাধীনতার চিন্তাই হবে শান্তিদায়িনী সুধা।'

বিধুভূষণ বসু[৬] আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন ঃ 'গান্ধীজীর আইন অমান্য আন্দোলনে না নেমে পারলাম না। "কাজের কথা" নামে ধারাবাহিক পুস্তিকা প্রকাশ করি এবং ত্রিশ সালে ৬ মাস জেল ও ২০০ টাকা জরিমানা দন্ড লাভ করি।'

বিধুভূষণ বসু[৭] আরও উল্লেখ করেছেন ঃ '...স্বাধীনতা আন্দোলনের

বিরুদ্ধবাদী এক এম, এল, এ, পদপ্রার্থী জমিদারের বিরুদ্ধে "ভোটরঙ্গ" লিখে মানহানির দায়ে পড়ি। তারপর ঐ জমিদার বন্ধু আমায় হত্যা করবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন।…'

বিধুভূষণ অধুনা বাংলাদেশের খুলনা জেলার বাগেরহাটের কাঁঠাল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম যদুনাথ বসু। ১৮ বছর বয়সে তিনি সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করেছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় একজন স্বাধীনতার সৈনিক হিসাবে স্বদেশী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তিনি এক সময় 'সঞ্জীবনী' কাগজে সাংবাদিকতা করতেন। 'সঞ্জীবনী' ছিল সাপ্তাহিক কাগজ। ১৮৮৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। কৃষ্ণকুমার মিত্র এই সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের পরিচালক ছিলেন।

বিধুভূষণের লেখা 'সতীলক্ষ্মী' বই ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল। তিনি রাজনৈতিক জীবনে চিত্তরঞ্জন দাশ, জে. এম. সেনগুপ্ত, মুকুন্দ দাস এবং সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত ছিলেন। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে এবং ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে বিধুভূষণ যোগদান করেন।

বিধুভূষণ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পাদিত 'সন্ধ্যা' কাগজেও লিখতেন। তাঁর লেখা 'বঙ্গবাসীর সোনার স্বপন' লেখাটি বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। বিধুভূষণের লেখা 'মীরকাশিম' নাটক খুলনা শহরে একরাত্রে অভিনয় চলাকালে পুলিশ উক্ত নাটকটির পাণ্ডুলিপি কেড়ে নিয়ে যায়। তাঁর লেখা কয়েকটি পুস্তকের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো; উপন্যাস: ১. লক্ষ্মী মেয়ে, ২. লক্ষ্মী মা, ৩. লক্ষ্মী বৌ, ৪. সতীলক্ষ্মী (ইংরেজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল), ৫. অমৃতে গরল, ৬. চারুচন্দ্র, ৭. স্বয়ম্বরা, ৮. দীপাবলীর বাজি, ৯. বিষের বাতাস, ১০. প্রখরা, ১১. কুলের বলি, ১২. জ্যাঠাইমা, ১৩. নন্টোম্বার, ১৪. পাপিষ্ঠা, ১৫. পৌত্রান্ত, ১৬. পরিণাম, ১৭. কামিনী কাঞ্চন। কয়েকটি বই হিন্দী ও গুজরাটীতে অনুদিত হয়েছিল। ছোট গল্প: ১. বনমালা, ২. কালির বনরঙ্গ, ৩. সুভদ্রা, ৪. কাজের কথা, ৫. গোধন। জীবনী: ১. দেশবন্ধু চরিত্র মহিমা, ২. মহাত্মা গান্ধীর জীবন চরিত, ৩. স্মৃতি কথা। নাটক: ১. দাদা, ২. বিমাতা, ৩. বাপের ভিটা, ৪. সত্যানন্দ, ৫. রক্তযজ্ঞ, ৬. মীরকাশিম এবং আরও কয়েকটি বই বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৩৭৮ সালের মাঘ মাসে ৯৮ বছর বয়সে প্রবীণ সাহিত্যিক বিধুভূষণ বসু কলকাতা শহরে পরলোক গমন করেন।

'ছাত্রদল' ছিল মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক: দেবাংশু সেনগুপ্ত। কাগজ ছাপা হতো শ্রীসরস্বতী প্রেস, কলকাতা থেকে। ওই সময় শ্রীসরস্বতী

প্রেস ছিল কলকাতা, ১নং রমানাথ মজুমদার স্ট্রীটে। 'ছাত্রদল' প্রকাশিত হতো—৪৬, গিরিশ মুখার্জী রোড ভবানীপুর, কলকাতা থেকে। কাগজ প্রতি সংখ্যার দাম ছয় আনা, বার্ষিক সডাক—এক টাকা। ৪০ পৃষ্ঠার কাগজ, মলাটে বিজ্ঞাপন থাকতো।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখ করা দরকার, সেকালে কলকাতায় বিপ্লবীদেব দুটি কেন্দ্র ছিল। একটি 'সরস্বতী লাইব্রেবী', আর একটি 'শ্রীসবস্বতী প্রেস'। শ্রীসরস্বতী প্রেস থেকে সেকালে বহু বিপ্লবীদের পত্র-পত্রিকা ছাপা হয়েছিল। এই দুটি প্রতিষ্ঠানেব গোড়াব কথা উল্লেখ কবেছেন মনোবঞ্জন গুপ্ত[৮]। সরস্বতী লাইব্রেবী প্রসঙ্গে লিখেছেন :

'সরস্বতী লাইব্রেরী স্থাপন হাজারীবাগ জেলে একসঙ্গে থাকাকালে আমি ও অরুণচন্দ্র গুহ আমবা দুজনে স্থির করি যে জেলের বাইরে গিয়ে আমরা বৃত্তি রোজগারের জন্য একটা বইয়েব দোকান খুলবো। আমার খালাসের পূর্বেই অরুণ খালাস পেয়েছিল। অরুণ আমায় লিখলো 'পূজাব সময় দোকান না খুললে, সবাই বলছে, পাঠ্য পুস্তক বিক্রীব মরশুমের সুযোগটা কাজে লাগানো যাবে না।' আমি লিখলাম—'তুমি আরম্ভ করে দেও—মায়ের শ্রাদ্ধের পরই গিয়ে আমি পৌঁছাবো।' তদনুসারে ১৯২০ সালের দুর্গা পূজাব সময়ে অরুণ কলকাতায় আমাদের দলনেতা স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতীর নাম অনুসারে সরস্বতী লাইব্রেবী নাম দিয়ে হ্যারিসন রোডে একটি বইয়ের দোকান খুলে দেয়। কিরণদাকে (কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে) দোকানে বসানো হলো বই বিক্রয়েব জন্যে। পূজার পরে কলকাতায় এসে আমি দোকানের কাজে যোগ দিই।'

মনোরঞ্জন গুপ্ত[৯] শ্রীসরস্বতী প্রেস প্রসঙ্গে লিখেছেন :

'শ্রীসরস্বতী প্রেস স্থাপন সরস্বতী লাইব্রেরী করার সময় থেকেই একটা প্রেস করবার উদগ্র আকাঙ্খা আমার মনে জাগে। অনেক জায়গায় চেষ্টা করেছি—টাকার জন্যে অনেকের কাছে হাত পেতেছি। কিন্তু কোথাও সুবিধা করে উঠতে পারিনি। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে কোনো রকমে তিন হাজার টাকা সংগ্রহ করে কেবলমাত্র দুঃসাহসের উপর নির্ভর করেই শ্রীসরস্বতী প্রেস আরম্ভ করি। আমিই ছিলাম প্রথম ম্যানেজার। বরিশাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বন্ধুবর শৈলেশ বিশ্বাসের সাগ্রহ আনুকূল্যে বরিশাল ব্যাঙ্ক থেকে দু হাজার টাকা ধার করি এবং শৈলেন গুহরায়ের কাকা হেমেন্দ্র গুহরায়ের কাছ থেকে এক হাজার টাকা চেয়ে নেই। হেমেন্দ্র-বাবু প্রথমে অবাক হয়ে বললেন—'মাত্র তিন হাজার টাকায় প্রেস করবেন কেমন করে?' আমি বললাম—"নানা যোগাযোগের ফলে আমি তিন হাজার টাকায় আরম্ভ করে দিতে পারবো। টাকা তো আরো লাগবে নিশ্চয়ই। কিন্তু আরম্ভ করে দিতে পারলে আর আমি ঠেকবো না। যেমন হোক

প্রয়োজন মতো টাকা জোগাড় আমি করবোই। মুস্কিল আগে ঘাড়ে করে নিয়ে, তার পরে মুস্কিল আসান।" হেমেন্দ্রবাবু বললেন—"আপনার সম্বন্ধে আমি যা ভাবি, আপনি তার উপযুক্ত উত্তরটাই দিয়েছেন। আমি ভাবি—you can create something out of nothing. অর্থাৎ কিছু না থেকে আপনি একটা কিছু গড়ে তুলতে পারেন। এক হাজার টাকা এমন আর কি? নিয়ে যান টাকা—সাফল্য অর্জন করুন। আপনি পারবেন—আমার বিশ্বাস আছে। আপনার নামেই চেকটা দিচ্ছি।" সেইদিন হেমেন্দ্রবাবুর এই কথা ভবিষ্যৎ জীবনে নানা ব্যাপারে আমার মনে উৎসাহ জুগিয়েছে। এখানে প্রেসের সাফল্য অর্জনের দীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনা করে আমার এই কাহিনী আরো দীর্ঘ করতে চাইনে।'

'ছাত্রদল' কাগজ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শ্রীসরস্বতী প্রেসের কথা উল্লেখ করা হলো। এবার 'ছাত্রদল' কাগজ প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। ছাত্রদল[১০] কাগজে জাতীয় আন্দোলন ও ছাত্রদল শীর্ষক একটি লেখা ছাপা হয়েছিল। ওই লেখার কিছু অংশ হলো এই ঃ

'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (জমিদারী প্রথার) প্রস্তাবের জন্য প্রার্থনা করিতেছি ভারতের শ্রমিক ও কৃষক সমাজের প্রতিনিধি (?) ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতিরূপে ঐ 'বাণী' দিয়েছিলেন। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয় একদল লোকের হুজুগের উপর নির্ভর করে নয়, প্রতিষ্ঠিত হয় একদল লোকের কোন একটি বিশেষ মনোভাবের (Common ideologyর) উপর নির্ভর করে ও তাকে ভিত্তি করে। এই রকম জমিদারী ও ধনবাদী মনোভাব নিয়ে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়, আর এই কংগ্রেস আজ পর্য্যন্ত ঐ মনোভাবকে যে কাটিয়ে উঠতে পারিনি তা আমরা বুঝতে পেরেছি গত করাচী কংগ্রেসে তাদের কংগ্রেসী-স্বরাজের রূপ কি হবে এবং তাদের পূর্ণ স্বাধীনতার অর্থ কি তার বর্ণনা দেখে। তাইতো সেই গোড়া থেকেই দেখতে পাচ্ছি যে, যেই কেউ গিয়ে কংগ্রেসকে সত্য সত্য গণমনোভাবের উপর নির্ভর করে এবং তাদের দাবীকে ভিত্তি করে কোন প্রোগ্রাম দিতে গেছে তাকে তারা কংগ্রেসের মধ্যে টিকতেই দেয় নি। এর জন্যে কত রকম উপায় যে অবলম্বিত হয়েছে তাও আমাদের জানা আছে।

ভারতের ছাত্রদল ঐ গণ-শ্রেণীর দাবীকে গোড়া থেকেই বুকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে, তাই তারা স্বাধীনতার স্বেচ্ছাকৃত বিশ্বাসঘাতী বিকৃত অর্থ দেখে ক্ষেপে গেল। তাই যখন তারা দেখল যে স্বাধীনতার অর্থে ভারতের অভিজাত শ্রেণীর মুখপাত্র গান্ধীর ১১টি সর্ত্তকে কংগ্রেস তাদের স্বাধীনতার মর্ম্ম বলে গ্রহণ করেছে তখন তারা বুঝতে পারল ঐ কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধি করার অর্থ আর কিছুই নয় ভারতের চির পদানত নির্য্যাতিত শোষিত

শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা। যে কংগ্রেস জনগণের স্বার্থের জন্য যুদ্ধ করেছে বলে ঘোষণা করছে, সে কংগ্রেস যদি পূর্ণস্বাধীনতাকে এগারটি সর্ত্তে মাত্র পর্য্যাবসিত করে তবে তার উদ্দেশ্য কি তা' আমরা বুঝতে পারব তার দাবীর রূপ এবং এগারটি সর্ত্তের রূপ কি তা দেখে। এই সর্ত্তগুলো—যেমন equal partnership with Britain, Control of the army, foreign affairs, tariff walls for the protection of Indian industries, monopoly of Coastal traffic, fixation of the exchange of rupee, the abolition of the C. I D., the reduction of the expenditure of the army by half, modification of the Arms act etc. সবই যেন শ্রমিক ও কৃষক—যাদের সংখ্যা ভারতের জন সংখ্যার শতকরা ৯৫ জন—এদের স্বার্থে।

ঐ সম্বন্ধে বলবার কিছুই নেই। যে ভারতবাসীর গড়ে দৈনিক আয় ছয় পয়সা তাদের tariff walls, monopoly of Coastal traffic, rupee ratio এসব কিসে লাগবে? যে শ্রমিকরা কারখানায় খেটে মরছে তাদের স্বার্থে tariff walls for the safeguards of Indian industry কি সে লাগবে? যে কৃষকরা কেবল মাটির বুক চিরে সোনাই বার করছে আর ভোগ করতে পারছে না তাদের স্বার্থে monopoly of Coastal traffic, rupee ratio এসব কি কাজে লাগবে?'

ছাত্রদল[১১] কাগজে ছাপা হয়েছিল 'জাতীয় আন্দোলন ও শ্রেণী সংগ্রাম' শীর্ষক একটি লেখা। ওই লেখার কিছু অংশ হলো এই :

'যতদিন ভারতে অস্পৃশ্য থাকবে ততদিন স্বরাজ অসম্ভব। ভারতবর্ষ প্রকৃতই অপরাধী। আমাদের পাপ অপেক্ষা গুরুতর কোন পাপ ইংরাজ করে নাই। আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য, দুর্ব্বলকে রক্ষা করা'—তের বছর আগে গান্ধী এই ঘোষণা করেন, আর এই উক্তি তিনি কাজে লাগাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। এর পেছনে আসল মতলবটা কি? গান্ধীর 'স্বরাজ' চিরদিনই অসম্ভব। তিনি "জাতীয়" আন্দোলনের নেতা হয়ে স্বরাজ বা পূর্ণ স্বরাজের মাঝে মাঝে যা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে তো আমাদের মত সাধারণ লোকের মনে হয় না যে ইহলোকে সেই স্বরাজ কোন দিন আসতে পারে। বরঞ্চ আমরা দেখেছি যখনই "হীনজন" মজুর চাষীরা স্বরাজের সোজা বাংলা অর্থ করেছে,—যেমন মজুর ভেবেছে স্বরাজ এলে পর মজুরী বাড়বে, মিলের মালিকের লাথি ঝাঁটা খেতে হবে না, কিংবা চাষী ভেবেছে স্বরাজের অর্থ জমির খাজনা দিতে হবে না, মহাজনের সুদ জোগাতে হবে না, তখনই আমরা গান্ধীর "আত্মশুদ্ধির" বাণী শুনতে পেয়েছি। তাই আজ আবার যখন গান্ধী উপবাস ইত্যাদি Stunt দেখিয়ে হরিজনদের শুদ্ধি করিয়ে নিয়ে (অর্থাৎ মদ-মাংস ত্যাগ করে বলে) সমাজে "চল" করে নিতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, এবং স্বরাজের নতুন অর্থ

করছেন অস্পৃশ্যতা বর্জন, তখন আমাদের দারুণ সন্দেহ হচ্ছে পেছনে মতলব কিছু একটা আছেই।

কংগ্রেসী কাগজওয়ালারা আজ সজোরে হরিজন আন্দোলনের ঢাক পিটোতে আরম্ভ করেছে। কাগজ খুলেই দেখা যায় অমুক গ্রামে হরিজনরা "জলচল" হয়েছে, অমুক জেলায় হরিজনরা "ভাতচল" হয়েছে, অমুক জায়গায় হরিজনরা "ছোঁওয়াচল" হয়েছে। সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় ছাত্রদল ও যুবজনেরাই হরিজন আন্দোলনে খুব বেশী মেতে গেছে। আমাদের মেরুদণ্ডে কি এক বিন্দু জোর নেই যে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হরিজন আন্দোলনটাকে তলিয়ে দেখবার মত ক্ষমতাও আমাদের চলে গেছে? কতবার তো কংগ্রেসী নেতাদের হাতে ঠকেছি, এখনও কি শিক্ষা হয় নি? সেই নন্-কো-অপারেশনের যুগ থেকে আরম্ভ করে আজ আইন অমান্য আন্দোলনের যুগ পর্য্যন্ত কংগ্রেসী "স্বরাজের" জন্য কত রকম দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা সহ্য করেছি। নিজেরা কংগ্রেসী ধাপ্পায় পড়ে কত ঘাটেই না জল খেয়েছি। আজ আবার কংগ্রেসের নেতাদের কাছ থেকে "বিউগ্‌ল কল্" এসেছে—হরিজন আন্দোলন কর। "মহামানবের" একুশ দিন ব্যাপী Vichy water, olive oil massage, Ultra violet ray ইত্যাদি সমন্বিত অতি আধুনিক "মহা-উপবাস" দেখে ছাত্রদল লেগে গেছে "হরিজন" উত্তোলন করবার জন্য। তাই খুব দুঃখের সঙ্গেই জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে ছাত্রদলের মেরুদণ্ড কি ভেঙে গেছে?

"অস্পৃশ্যতা না গেলে স্বরাজ আসবে না"—কথাটার অর্থ খুবই সোজা। হীনজন চাষী মজুরদের মধ্যে নানা জাতের লোক আছে—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন, নানা রকমের Tribe ইত্যাদি। হরিজনরা এই হীনজনদেরই একটা অংশ।'

'মার্ক্সপন্থী' ছিল মাসিক পত্রিকা। এই কাগজের সম্পাদক ছিলেন—আবদুল হালিম। কার্য্যালয়—গণশক্তি পাবলিশিং হাউস, ৪১ নং জাকেরিয়া স্ট্রীট, কলকাতা। মূল্য প্রতি সংখ্যা এক আনা।

মার্ক্সপন্থী[১২] কাগজে ছাপা হয়েছিল লেনিনের বাণী:

'কোনো বিপ্লব সম্বন্ধে লেখার অপেক্ষা বিপ্লবের অভিজ্ঞতার মধ্যে বাস করিয়া আসা অনেক বেশী আনন্দদায়ক ও অনেক বেশী কার্য্যকরী।'

—লেনিন

'মার্ক্সপন্থী' কাগজে এই সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল: নভেম্বর বিপ্লব, বেকার কেন হয়? বর্তমান সমাজ শ্রমিক সংঘ, সোভিয়েট সংবাদ, ভারতে শ্রেণী সংগ্রাম, বার্ণস্টাইন ও হিটলার প্রভৃতি রচনা।

'গণশক্তি' প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল—আশ্বিন, ১৩৪১ সালে। সম্পাদক—সরোজ মুখার্জী। কার্য্যালয়: গণশক্তি পাবলিশিং হাউস, ৪১, জাকেরিয়া স্ট্রীট, কলকাতা। মূল্য—প্রতি সংখ্যা এক আনা।

'গণশক্তি'[১৩] কাগজে প্রকাশিত একটি সংবাদ এখানে উল্লেখ করা হলো :

'মজুরদের স্প্রাট অভিনন্দন

মেটিয়াবুরুজে গত ২৪শে সেপ্টেম্বর কারবালা ময়দানে রেড ট্রেড ইউ-নিয়ন কংগ্রেসের উদ্যোগে দুই হাজার মজুর সমবেত হইয়া সদ্যমুক্ত শ্রমিক নেতা কমরেড স্প্রাটকে অভিনন্দিত করে। স্থানীয় ইয়ং ওয়ার্কার্স লীগের পক্ষ হইতে স্প্রাটকে একটি কাস্তে-হাতুড়ী চিহ্নিত লাল ব্যাজ পরাইয়া অভিনন্দন জানান হয়। সভায় বোম্বাই-এর কমরেড মিরাজকর মজুরদের সংগ্রামশীল হইবার জন্য ও লেবার পার্টি, কংগ্রেস সোশালিষ্ট পার্টি প্রভৃতি সরমায়দারী পার্টি হইতে সাবধান থাকিবার জন্য একটি মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দেন। সভায় ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করায় সরকারের কার্য্যে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া ও এই ঘোষণা প্রত্যাহারের দাবী জানাইয়া একটি প্রস্তাব পাশ হয়।'

'সঙ্ঘবাণী', সম্পাদক—নলিনী রায় সম্পাদক মণ্ডলীতে ছিলেন : রামানন্দ গোস্বামী, সচ্চিদানন্দ সেনগুপ্ত, দেবতোষ দাসগুপ্ত, ভূপালধন বসু। ভূপালধন বসু কলকাতা। নর্থ ব্রিটিশ প্রেস' থেকে কাগজ ছাপাতেন এবং প্রকাশ করতেন। এই পত্রিকা ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ২৪শে চৈত্র ১৩৩৯ সালে। আমি যে সংখ্যা দেখেছিলাম, ওই সংখ্যায় উক্ত ছাপা তারিখ কেটে হাতে লেখা ছিল : ১লা বৈশাখ ১৩৪০ সাল।

'সঙ্ঘবাণী' পত্রিকার প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল : শুক্রবার ২৯শে বৈশাখ, ১৩৪০ সাল। প্রতি সংখ্যার দাম—এক আনা। কাগজ প্রকাশিত হতো : ১০, ১১, আপার সার্কুলার রোড, কলকাতা থেকে। এই সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল : 'কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন' নিয়ে লেখা। তা'ছাড়া, 'ই, আই, রেলওয়ে কর্মীদের প্রতি আবেদন', 'বাংলার বেকার' প্রসঙ্গে লেখা ছাপা হয়েছিল।

'গণবাণী', সম্পাদক সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, প্রকাশিত হয়েছিল—১৭ই শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪১ সালে। কাগজের দাম প্রতি সংখ্যা এক আনা।

'গণবাণী' কাগজে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর[১৪] লিখেছিলেন :

'১লা আগষ্ট

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ হবার আগেই ইম্পিরিয়ালিষ্ট শক্তিগুলি এশিয়া ও আফ্রিকা আপনাদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছে। সেই ভাগাভাগির সময় ইম্পিরিয়ালিষ্ট শক্তিগুলি কিন্তু প্রত্যেকে সমান ভাবে উপনিবেশের ভাগ পায়নি। যে সব রাষ্ট্র ছলে বলে কৌশলে অন্যদের আগে অধিক সংখ্যক দেশ দখল করে নিতে পেরেছিল সেই রাষ্ট্রগুলিই ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপন করে অন্যদের চেয়ে অধিক বেশী সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে। ক্যাপিটালিষ্ট উৎপাদন

প্রণালীর উন্নতির দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে সেই ইম্পিরিয়ালিস্ট শক্তিগুলি সবাই এক শ্রেণীর নয়। এদের মধ্যে যে ফার্স্ট, সেকেণ্ড, থার্ড আছে সেটা সহজেই চোখে পড়ে। ক্যাপিটালিস্ট উৎপাদন-প্রণালীর ঔৎকর্ষ্যের দিক থেকে বিচার করে দেখলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জার্মানীর তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। গত চল্লিশ বৎসর ধরে ইম্পিরিয়ালিস্ট রাষ্ট্র জার্মানীর ক্যাপিটালিস্ট উৎপাদন-প্রণালীর আশ্চর্য্য রকম উন্নতি সাধন করেছে। এ বিষয়ে জার্মান ইম্পিরিয়ালিজম্ ব্রিটিশ ও ফরাসী ইম্পিরিয়ালিজমকে পরাজিত করে পঞ্চাশ বৎসর এগিয়ে গেছে। কিন্তু শুধু উৎপাদন-প্রণালীর উন্নতি সাধন করলেই তো আর ক্যাপিটালিস্টদের পকেট ভরে না। উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রী করতে হবে। কিন্তু যে দিকে তাকানো যায় সেই দিকেই প্রাচীর তুলে অন্য ইম্পিরিয়ালিস্ট শক্তিগুলি ঘাঁটি আগলে বসে। এশিয়া ও আফ্রিকা বনেদী ইম্পিরিয়ালিস্ট শক্তিদের অধীনস্থ। উৎপন্ন করবার ক্ষমতার অসীম বৃদ্ধি হয়েছে, পণ্যদ্রব্য পর্বতাকারে জমে উঠেছে অথচ সেগুলি বেচবার উপায় নেই। ক্যাপিটালিস্ট-দের পক্ষে এর চেয়ে দুঃখের অবস্থা আর কি হতে পারে? অথচ উৎপাদনের ঔৎকর্ষ্যে খুবই পড়ে আছে এমন সব দেশ যথা হল্যাণ্ডে সেও জার্ম্মানীর চেয়ে অনেক বৃহৎ আয়তনের উপনিবেশের অধিকারী। বাজার বাড়াতেই হবে অথচ ইয়োরোপে পরস্পরের দেশকে গ্রাস করা সম্ভব নয়। তাহলে একমাত্র উপনিবেশগুলির পুনর্ব্বার ভাগ বাটরা দ্বারাই বাজারের সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব। কিন্তু যে সব শক্তিগুলি পূর্ব্ব থেকে উপনিবেশগুলিকে পরম সুখে চিবিয়ে আসছে তারাই বা তাদের দাঁতের সুখ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করবে কেন কিংবা অন্যকে তাদের বঞ্চিত করতে দিতে রাজী হবে কেন? কত ভালবাসার কথা, কত আধ্যাত্মিক যুক্তি, কত হুমকি এরা পরস্পরকে দিলো কিছুতেই কিছু হলো না। যারা উপনিবেশগুলিকে আকের মত করে চিবিয়ে রজত-রসে উদর ভরছিলো তারা না গললো ভালবাসার বুলিতে, না টললো হুমকিতে। অগত্যা তাল ঠুকে রণং দেহি করা ছাড়া আর উপায় কি? পৃথিবীর বাজার নিয়ে ইম্পিরিয়ালিস্ট শক্তিগুলির মধ্যে যে ভীষণ রেষারেষি ও দ্বন্দ্ব বরাবর চলে আসছিলো সেই দ্বন্দ্বের শেষ বোঝাপড়া হলো মেশিনগান, ট্যাঙ্ক ও বিষাক্ত গ্যাস দিয়ে। এই হলো ইম্পিরিয়ালিস্ট যুদ্ধের আসল মর্ম্ম।

বিশ বৎসর আগে, ১৯১৪ সালের ৪ঠা আগষ্ট তারিখে বিশ্বব্যাপী ইম্পিরিয়ালিস্ট যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল। পৃথিবীর প্রায় সব ক'টি ইম্পিরিয়ালিস্ট শক্তি এই যুদ্ধে যোগদান করেছিলো। পৃথিবীটাকে আর একবার নতুন করে ভাগাভাগি করে নেওয়াই ছিলো এদের উদ্দেশ্য। প্রায় পাঁচ বৎসর ধরে এই বীভৎস জবাই চলেছিলো। কারা মরেছিলো? যারা প্রত্যেক যুদ্ধে প্রাণ দিয়ে থাকে তারাই অর্থাৎ এই ইম্পিরিয়ালিস্ট দেশগুলির

কোটি কোটি চাষী ও মজুর। ক্যাপিটালিস্টদের পকেট ভরাবার জন্যে যে যুদ্ধ সেই যুদ্ধে প্রাণ দিলো সেই চাষী ও মজুরদের দল যাদের শোষণ করে ক্যাপিটালিস্টরা নির্ব্বিবাদে কালচারের চর্চ্চা করে আসছে। এই ইম্পিরিয়ালিস্ট যুদ্ধের ফলে একটি জিনিস কিন্তু পরিষ্কার বোঝা গেল। ইম্পিরিয়ালিস্ট দেশগুলির সোসালিস্ট নেতারা বহু বৎসর থেকে বলে আসছিলো যে ইম্পিরিয়ালিস্ট শক্তিগুলি যুদ্ধ সুরু করতে চাইলে প্রত্যেক দেশে সোসালিস্ট দল আপন দেশের ইম্পিরিয়ালিস্ট গভর্ণমেণ্টকে যুদ্ধ করতে বাধা দেবার জন্যে জেনারেল স্ট্রাইক শুরু করবে এবং এমন কি ঘরোয়া যুদ্ধ শুরু করতে তারা পশ্চাৎপদ হবে না। যুদ্ধের সময় দেখা গেল যে এই সোসালিস্ট নেতারা তাদের স্ব স্ব দেশের ইম্পিরিয়ালিস্ট গভর্ণমেণ্টকে পূর্ণ সমর্থন করেছে। যুদ্ধের ঠিক পূর্ব্বে দ্বিতীয় ইনটারন্যাশন্যালের এক বৈঠকে বিভিন্ন দেশের সোসালিস্ট নেতারা যুদ্ধের জন্য পরস্পরের দেশকে দায়ী করে মাথা ফাটাফাটি করতে বাকী রেখেছিলো। এক কথায় এই সোসালিস্টরা যে বুর্জ্জোয়া ন্যাশনালিস্ট আর এরা যে তাদের ইম্পিরিয়ালিস্ট প্রভুদের আজ্ঞাবহ ভৃত্য সেটা এই যুদ্ধে প্রমাণ করে দিলে এই সঙ্গে দ্বিতীয় ইনটারন্যাশন্যালের নৌকাডুবি হলো। এই সোসালিস্ট নেতাদের জঘন্য প্রতারণার ফলে ইম্পিরিয়ালিস্ট দেশগুলির লক্ষ লক্ষ কৃষক ও শ্রমিক ইম্পিরিয়ালিস্টদের স্বার্থ পুষ্টি করবার জন্যে আপনাদের খুন করতে দিয়েছিলো। শ্রমিক-আন্দোলনের এই দুঃসময়ে লেনিন, কার্ল লিবক্রেথট, রোজা লুক্সেমবুর্গ, ক্লারা সেৎটাকিন প্রভৃতি মুষ্টিমেয় সোসালিস্ট নেতৃবৃন্দ সোসালিজমের আন্তর্জাতিক আদর্শ অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। এঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের আপন আপন দেশের শ্রমিকদের স্ব স্ব দেশের ইম্পিরিয়ালিস্ট গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ঘরোয়া যুদ্ধ শুরু করবার জন্যে আহ্বান করেন। লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক দল জারের গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ঘরোয়া যুদ্ধ করবার জন্যে গণসাধারণের মধ্যে প্রবল আন্দোলন চালান। তারি ফলে জারের গভর্ণমেণ্টের পতন হয় ও কালে ঘরোয়া যুদ্ধ দ্বারা রাশিয়ার ক্যাপিটালিস্টদের গভর্ণমেণ্টকে ধ্বংস করে সোভিয়েট রাষ্ট্রের পত্তন করা হয়।

যুদ্ধের পর থেকে ইয়োরোপে ও আমেরিকায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে নানা ধরনের আন্দোলন শুরু হয়েছে। গির্জ্জের পাণ্ডার দল, স্বাধীন-চিন্তাবাদীর দল, মানুষের অধিকারবাদীর দল, শান্তিবাদীর দল প্রভৃতি হরেক রকমের দল যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে দেয়। আর কিছুতেই যুদ্ধে যোগ করবে না। এই হচ্ছে এদের সঙ্কল্প। এই সঙ্কল্প যতই সাধু হোক না কেন এই দলগুলি ক্যাপিটালিজম, ইম্পিরিয়ালিজম ও উপনিবেশ-গুলির শোষণ সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য না করে পরিষ্কার প্রমাণ করে দিয়েছে যে এই সমস্ত দলগুলিই হচ্ছে ক্যাপিটালিস্টদের দল। এই বুর্জ্জোয়া

অনুষ্ঠানগুলির কাজ হচ্ছে ইম্পিরিয়ালিষ্ট যুদ্ধের বিরুদ্ধে যথার্থ কার্য্যকরী বিরুদ্ধতা যাতে কেন্দ্রীভূত না হয় তার চেষ্টা করা। যে দল ক্যাপিটালিজমের বিরোধী নয় সেই দল কখনো সত্যি করে ইম্পিরিয়ালিষ্ট যুদ্ধের বিরোধী হতে পারে না। যতদিন না শ্রমিক আন্দোলনের ফলে ক্যাপিটালিজম্ ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে ততদিন ইম্পিরিয়ালিষ্ট যুদ্ধের সম্ভাবনা ক্যাপিটালিষ্ট সমাজের মধ্যে প্রচ্ছন্ন তো থাকবেই এমন কি ইম্পিরিয়ালিষ্ট যুদ্ধ অনিবার্য্য।

যতদিন পৃথিবীর বাজার নিয়ে এক দেশের ক্যাপিটালিষ্টদের অন্য দেশের ক্যাপিটালিষ্টদের দ্বন্দ্ব থাকবে ততদিন শুধু যে যুদ্ধের আশঙ্কা থাকবে তা নয় যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। ক্যাপিটালিজম্, ইম্পিরিয়ালিজম্, ন্যাশান্যালিজম্ ও ইম্পিরিয়ালিষ্ট যুদ্ধ অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত। অতএব যে যথার্থ ইম্পিরিয়ালিষ্ট যুদ্ধের বিরোধী—তাকে ক্যাপিটালিজমের বিরোধী হতে হবে এবং সোসালিজমের জন্য সংগ্রাম করতে হবে। যে সব দলের কথা আমি পূর্ব্বে উল্লেখ করেছি সেই দলগুলি ক্যাপিটালিজমের বিরোধী নয় বলেই সোসালিজমের সপক্ষে নয়। এগুলি শান্তির মেকী অনুষ্ঠান সমূহ ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইম্পিরিয়ালিষ্ট যুদ্ধের সম্ভবনা ক্রমশই সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। ক্যাপিটালিজমের আভ্যন্তরীণ সমস্ত গলদগুলি উত্তরোত্তর স্ফীত হয়ে দেখা দিচ্ছে। ফ্যাসিষ্ট জার্ম্মানীর সঙ্গে ফরাসী ইম্পিরিয়ালিষ্ট গভর্ণমেণ্টের বিরোধ বাড়ছে ছাড়া কমছে না। ফ্যাসিষ্ট অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে ফ্যাসিষ্ট জার্ম্মানীর বিরোধ লেগেই আছে। ভূমধ্যসাগর নিয়ে ইটালীর সঙ্গে ফ্রান্সের বহুদিন থেকে মন কষাকষি চলছে। জাপানের সঙ্গে আমেরিকার বহুদিনের শত্রুতা নিয়তই বেড়ে চলেছে। ডিপ্লোমাসির দাঁড়িপাল্লার দড়ি একদিন না একদিন ছিঁড়ে পড়বেই, সে দিন আমেরিকান ইম্পিরিয়ালিজমের সঙ্গে জাপানী ইম্পিরিয়ালিজমের যে সম্পর্ক হবে তাতে ফুলের মালার আদান-প্রদান বলা চলবে না। আগুনের বিনিময়ই সেদিন প্রশান্ত মহাসাগরের দুই তীর জুড়ে চলবে। এই তো গেলো ইয়োরোপের আমেরিকার ও এশিয়ার ইম্পিরিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ। এ ছাড়াও যুদ্ধের আর একটি সম্ভাবনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সোভিয়েট রাষ্ট্রের সূত্রপাত থেকে সমস্ত ইম্পিরিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রগুলির অন্তরতম কামনা হচ্ছে সোভিয়েট রাশিয়াকে ধ্বংস করে সেখানে পুনর্ব্বারের মত ক্যাপিটালিষ্ট রাষ্ট্রের পত্তন করা। সোভিয়েট রাষ্ট্রের পত্তনের সময় ইয়োরোপের সমস্ত ইম্পিরিয়ালিষ্ট শক্তিগুলি এবং অন্য দিক থেকে জাপান সোভিয়েট রাষ্ট্রকে ধ্বংস করবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলো। বর্ত্তমানে জাপান সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে যেমন করে পারে যুদ্ধ লাগাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। মাঞ্চুকো বলে যে পুতুল-রাষ্ট্রটি জাপানী

ইম্পিরিয়ালিষ্ট সৃষ্টি করেছে সেই পুতুল-রাষ্ট্রটি সৃষ্টি করবার একমাত্র উদ্দেশ্যই হচ্ছে সোভিয়েট রাশিয়ার সীমানায় যুদ্ধের সরঞ্জাম জড়ো করা যায় এমন একটি আড্ডা তৈরী করা। জাপান যে রকম বেয়াড়া রকমে সোভিয়েট রাষ্ট্রের মধ্যে এসে উৎপাত করতে সুরু করেছে তাতে সোভিয়েট পররাষ্ট্রসচিব লিট্‌ভিনভের মতে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে ইম্পিরিয়ালিষ্ট জাপানী গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধ অনিবার্য্য। শুধু যে জাপানী ইম্পিরিয়ালিজম্‌ সোভিয়েট রাষ্ট্রকে ধ্বংস করবার জন্যে উন্মুখ হয়ে রয়েছে ও তোড়জোড় করছে তা নয়, হিটলার ফ্যাসিষ্ট জার্ম্মানী একদিকে ভিতরে ভিতরে জাপানকে সাহায্য করছে অন্যদিকে ইয়োরোপের সমস্ত ইম্পিরিয়ালিষ্ট শক্তিগুলিকে নিয়ে দল পাকিয়ে সোভিয়েট রাশিয়াকে আক্রমণ করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। হিটলার গভর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী হুগেনবার্গ লণ্ডনের আন্তর্জাতিক ইকনমিক কনফারেন্সে নিঃসংকোচে সকলকে জানাতে ত্রুটি করেন নি যে জার্ম্মানীর বর্ত্তমান ফ্যাসিষ্ট গভর্ণমেণ্ট সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্গত ইউক্রাইনা প্রদেশটিকে আত্মসাৎ করে জার্ম্মানীর উপনিবেশে পরিণত করতে মনস্থ করেছে। মুসোলিনীও হিটলারের কাছে হার মানবার নয় তাই মুসোলিনীর নেতৃত্বে ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্ম্মানী ও ইটালীর মধ্যে একটা চতুশক্তির সন্ধি (Four Powers Pact) স্থাপিত হয়েছে। ইয়োরোপের প্রধান ইম্পিরিয়ালিষ্ট শক্তিগুলিকে নিয়ে একটি সোভিয়েট বিরোধী-সমষ্টি তৈরী করাই যে এর উদ্দেশ্য সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। ফ্রান্স যদিও সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে পরস্পরকে আক্রমণ করবে না এই সর্ত্তে সন্ধি স্থাপন করেছে তবুও ভিতরে ভিতরে পিলসুড্‌স্কির ফ্যাসিষ্ট পোলাণ্ডকে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে সাহায্য করছে ও জাপানকে অস্ত্র সরবরাহ করছে। এই ইম্পিরিয়ালিষ্ট শক্তিগুলির পরস্পরের মধ্যে যে শত্রুতা আছে সেই শত্রুতার ফলেই এরা এতদিন এক জোট হতে পারে নি। তা না হলে এরা অনেক আগেই সম্মিলিত হয়ে সোভিয়েট রাষ্ট্রকে আক্রমণ করতো। কিন্তু অতীতে সেটা সম্ভব হয় নি বলে ভবিষ্যতে যে সেটা সম্ভব হবে না এটা মনে করলে ভুল করা হবে। শ্রমিক-বিপ্লবের সম্ভাবনা ইয়োরোপে যতই ঘনিয়ে আসবে ততই ইম্পিরিয়ালিষ্ট শক্তিগুলির এক জোট হয়ে সোভিয়েট রাশিয়াকে আক্রমণ করার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। সাময়িকভাবে ইম্পিরিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রগুলি আপনাদের জ্ঞাতি-কলহ ভুলে যাবে কিংবা ধামাচাপা দেবে এবং তাদের বৃহত্তর স্বার্থ অর্থাৎ কিনা ক্যাপিটালিষ্ট প্রণালীকে রক্ষা করবার স্বার্থের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সোভিয়েট রাশিয়াকে আক্রমণ করবে। সেই মহৎ ব্রত সম্পন্ন করে এই ইম্পিরিয়ালিষ্ট শকুনির দল যে আবার মাংসের ভাগাভাগির জন্য পরস্পরের সঙ্গে লড়বে তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

ইম্পিরিয়ালিষ্ট শক্তিগুলি এক জোট হয়ে সোভিয়েট রাশিয়াকে আক্রমণ

করলে উপনিবেশগুলির বুর্জোয়া শ্রেণীসমূহ যে তাদের প্রভু ইম্পিরিয়ালিষ্ট-দের অর্থ ও লোকবল দিয়ে সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সাহায্য করবে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। উপনিবেশগুলিতে গণ-আন্দোলন যতই তেজীয়ান হয়ে উঠবে, বুর্জোয়া শ্রেণীগুলির মনে তাদের প্রাণের চেয়ে তা প্রিয় সম্পত্তি হারাবার আশঙ্কা ততই বেড়ে যাবে আর সেই অনুপাতেই তাদের মনে সোভিয়েট রাশিয়ার উপর বিদ্বেষ ঘনীভূত হবে। তাই সোভিয়েট রাষ্ট্রকে ধ্বংস করবার যে কোন প্রচেষ্টাকে যে উপনিবেশের বুর্জোয়াশ্রেণী সাহায্য করবে সেটা সহজেই অনুমেয়।

একদা ভারতবর্ষে বুর্জোয়াশ্রেণী প্রভূত অর্থ ও লোকবল দ্বারা বৃটিশ ইম্পিরিয়ালিজমকে সাহায্য করেছিলো অন্য ইম্পিরিয়ালিষ্ট শক্তিগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। অহিংসার অবতার গান্ধী সেদিন বৃটিশ ইম্পিরিয়া-লিজমের এজেণ্ট স্বরূপ সৈন্য যোগাড় করবার জন্যে সারা ভারতবর্ষময় বক্তৃতো দিয়ে বেড়িয়েছিলেন। ইম্পিরিয়ালিষ্ট প্রভুদের কাছ থেকে যৎকিঞ্চিৎ বক্‌শিসের লোভে ভারতবর্ষের বুর্জোয়াশ্রেণী ও তার নেতা অহিংস গান্ধী এই মহৎ কার্য্য সেদিন সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছিলেন। বর্ত্তমানে শ্রমিক আন্দোলনের ফলে এতদিনের সঞ্চিত ধনসম্পদ ও সম্পত্তি হারাবার সম্ভাবনা যখন সত্যি সত্যিই দেখা দিয়েছে তখন ভারতবর্ষের বুর্জোয়াশ্রেণী যে মহা আনন্দের সঙ্গে সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ইম্পিরিয়ালিষ্ট প্রভুদের সাহায্য করবে তাতে সন্দেহ করবার কি কোন কারণ আছে? বরঞ্চ সাহায্য না করলেই বিস্মিত হবার কথা। গত ইম্পিরিয়ালিষ্ট যুদ্ধে তো ভারতবর্ষের বুর্জোয়াশ্রেণী বক্‌শিসের লোভে ইম্পিরিয়ালিষ্টদের খুবই সাহায্য করেছিল। এবার যখন ধনপ্রাণ নিয়ে টানাটানি তখন যে নিজেদের বাঁচাবার জন্য ভারতের ক্যাপিটালিষ্টরা ব্রিটিশ ইম্পিরিয়ালিজমকে পূর্ব্বের চেয়েও আরো অনেক বেশী সাহায্য করবে সেটা অলীক বলে মনে করবার কোন কারণ আছে কি? সমস্ত ইম্পিরিয়ালিষ্ট শক্তিগুলি যখন পুরোদমে যুদ্ধের আয়োজন করছে তখন একমাত্র সোভিয়েট রাশিয়াই শান্তির নীতি অনুসরণ করে আসছে। এই শান্তির নীতি অনুযায়ী লিট্‌ভিনভ্‌ লীগ অফ্‌ নেশন্‌সের অধিবেশনে সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব এনেছিলেন। ইম্পিরিয়ালিষ্ট শক্তিগুলি এক জোট হয়ে সোভিয়েট রাশিয়ার এই শান্তির প্রস্তাবকে নাকচ করে দিয়েছিলো। তার ফলে বর্ত্তমানে অস্ত্রশস্ত্র বাড়াবার জন্যে ইম্পিরিয়ালিষ্ট শক্তিগুলির মধ্যে ভয়ানক প্রতিদ্বন্দিতা চলছে এবং ইম্পিরিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রগুলি শুধু যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরীর কারখানাতে পরিণত হয়েছে। ইয়োরোপ আর আমেরিকা বারুদের আড়ৎ বল্লেও চলে।

ইম্পিরিয়ালিষ্ট যুদ্ধের সম্ভাবনা যতই বেড়ে যাচ্ছে, যুদ্ধকে বাধা দেবার জন্যে সমস্ত বিক্ষিপ্ত শক্তিগুলিকে কেন্দ্রস্থ করবার প্রয়োজন ততই বৃদ্ধি

পাচ্ছে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তিকে সম্মিলিত করবার জন্যেই প্রত্যেক বৎসর ২রা অগস্ট* ইয়োরোপের ও আমেরিকার প্রত্যেক দেশে বিরাট সভার আয়োজন করা হয়। ইম্পিরিয়ালিস্ট যুদ্ধের বিরুদ্ধে গণ-মত তৈরী করাই হচ্ছে এই সভাগুলির উদ্দেশ্য। ইয়োরোপ ও আমেরিকা জুড়ে লক্ষ লক্ষ লোক, শ্রমিক, ছাত্র, লেখক, শিক্ষক, মেয়ে, পুরুষ নির্ব্বিচারে এই দিন প্রতিজ্ঞা করে যে ১৯১৪ সালের সেই ইম্পিরিয়ালিস্ট জবাইয়ের পুনরাবৃত্তি তারা আর কিছুতেই ঘটতে দেবেনা। যদি ইম্পিরিয়ালিস্টরা তাদের স্বার্থসিদ্ধি করবার জন্য যুদ্ধ লাগাতে যায় তাহলে শুধু যুদ্ধে যোগদান করতে অস্বীকার করে নয়, জেনারল স্ট্রাইকের অস্ত্র ব্যবহার করে তারা যুদ্ধের বিরুদ্ধাচরণ করবে। এমন কি প্রয়োজন হলে তারা ঘরোয়া যুদ্ধও সুরু করে দিতে কুণ্ঠিত হবে না। এই স্মরণীয় দিনে ইয়োরোপের ও আমেরিকার লক্ষ লক্ষ তরুণেরা ইম্পিরিয়ালিস্ট যুদ্ধের জন্যে প্রকৃত দায়ী এই ক্যাপিটেলিস্ট সমাজ প্রথাকে ভেঙ্গে ফেলে তার জায়গায় সোশালিস্ট সমাজ প্রবর্ত্তন করবার শপথ গ্রহণ করে।

পৃথিবীর ইতিহাসে ১লা আগষ্টের সেই স্মরণীয় দিন আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে। ক্যাপিটালিজমের দানবিকতা যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে ততই পৃথিবীর অগ্রযায়ী তরুণের দল এই দানবিকতাকে নষ্ট করবার জন্যে বদ্ধ পরিকর হচ্ছে। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে এই তরুণ বীরদের দল এই দানবিকতাকে চিরদিনের মত নির্ম্মূল করবার জন্যে তৈরী হচ্ছে। আজ ১লা অগস্ট তারা তাদের ব্রত সফল করবার দিকে এক পা এগিয়ে যাবে। ভারতবর্ষের তরুণ কর্মীদের পিছিয়ে থাকলে চলবে না। বিশ্বের মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের সমানে পা ফেলে চলতে হবে। আজ আমরাও প্রতিজ্ঞা করবো যে আমরা ইম্পিরিয়ালিস্ট যুদ্ধকে কোন প্রকারে সাহায্য করবো তো নাই উপরন্তু সর্ব্বপ্রকারে বাধা দান করবো। আমরা শপথ করবো যে সোভিয়েট রাশিয়াকে যদি কোন ইম্পিরিয়ালিস্ট শক্তি আক্রমণ করে তা হলে যে উপায়ে সম্ভব আমরা সেই শক্তির বিরুদ্ধতা করবো ও সোভিয়েট রাশিয়াকে সাহায্য করবো। আমরা প্রতিজ্ঞা করবো যে ইম্পিরিয়ালিস্ট যুদ্ধের জন্য দায়ী ক্যাপিটালিস্ট প্রণালীকে আমরা ধ্বংস করবো এবং সাম্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত উন্নততর ও মহত্তর মানব-সমাজের আদর্শের জন্যে আমরা আত্মনিয়োগ করবো।

যে যথার্থ ইম্পিরিয়ালিস্ট যুদ্ধের বিরোধী তাকে ১লা অগস্ট তারিখে এই দিন সংকল্প গ্রহণ করতেই হবে।'

---

* আমি যে কাগজ দেখে নকল করেছিলাম সেই কাগজে ২রা অগস্ট কালি দিয়ে কেটে হাতে লেখা হয়েছিল ১লা অগস্ট। —বী. ব.

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'গণবাণী' ছিল সাপ্তাহিক কাগজ। ছাপা হতো—কালিকা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, ৩০নং হরিতকীবাগান লেন, কলকাতা থেকে। 'গণবাণী' অফিস ছিল—কলকাতার—৮২/১, হ্যারিসন রোডে।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'গণবাণী' পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ঃ কার্তিক ১৩৪৬, অক্টোবর ১৩৩৯ সালে। কাগজের দাম—দুই আনা। এই সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল কয়েকটি লেখা যেমন ঃ 'ইউনাইটেড ফ্রণ্টের ভারতীয় সংস্করণ'—পরেশ বসু, 'ইউনাইটেড ফ্রণ্ট না বিশ্বাসঘাতকতা'—সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কৃষক সমস্যা'—তারাপদ গুপ্ত, 'গোড়ায় গলদ'—সনৎ মুখোপাধ্যায়, 'অনেকান্ত ভূতবাদের গাণিতিক ভূমিকা'—মৃণাল ঘোষ, 'আমাদের দুনিয়া'—সিতেশ সেন। কাগজ ছাপা হতো—'সঞ্জীবনী প্রেস' কলকাতা থেকে। কাগজ প্রকাশিত হতো ঃ ২২০ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা থেকে।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এক অনন্যসাধারণ চরিত্র। গত ৫০ বছর ধরে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশে ও বিদেশে ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রচার ও সংগ্রাম করেছিলেন। তাঁকে বারে বারে কারাবরণ করতে হয়েছিল। ভারতে সমাজতন্ত্রবাদের প্রচার ও আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। দীর্ঘকাল ধরে তিনি ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। তাঁর সমস্ত জীবন একটা আপোষহীন নিরন্তর সংগ্রামের কাহিনী। ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলনে, কৃষক আন্দোলনে ও দেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক অধিকারের আন্দোলনে তাঁকে পুরোভাগে এসে দাঁড়াতে দেখা গেছে।

ঠাকুর পরিবারের সন্তান সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরলোক গমন করেন কলকাতায়, রবিবার দুপুর ১২-৫ মিনিটে, ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ সালে। অন্তিম সময়ে তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী ঠাকুর তাঁর কাছে ছিলেন। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্য, কাব্য, সঙ্গীত ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ ছিলেন। তিনি যেমন সুপুরুষ ছিলেন, তেমনি ছিলেন বাগ্মী। কিন্তু এই বাগ্মীকে জীবনের শেষ প্রায় এক বছরের বেশী বাক্‌শক্তিহীন হয়ে কাটাতে হয়। পরিচিত মুখ দেখলে, তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তো। ওষ্ঠাধর কেঁপে উঠতো। হয়তো কিছু বলতে চাইতেন। কিন্তু পারতেন না। যাঁরা তাঁকে দেখতে যেতেন, তাঁদেরও চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তো।

অমর চক্রবর্তী[১৫] কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা (ভবানীপুরের প্রার্থী সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর) থেকে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৈপ্লবিক জীবনের কয়েকটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

'১৯২৪ সাল—গান্ধীবাদী অসহযোগ আন্দোলনের কর্মীরূপে সৌম্যেন্দ্রনাথকে আমরা প্রথম দেখি খালি গায়ে খদ্দর ফেরী করে বেড়াচ্ছেন।

রাজনৈতিক আন্দোলনে সেই তাঁর প্রথম প্রকাশ। কিন্তু বাংলাদেশের আরও কয়েকজন যুবকের মত কঠোর যুক্তির বিচারে গান্ধীবাদী এই আন্দোলন পদ্ধতির সঙ্গে তিনি আর নিজেকে যুক্ত রাখতে পারলেন না। দেশের সাধারণ মানুষ চাষী মানুষের মধ্যে কাজ সুরু করলেন।

১৯২৬—এই সময় তিনি বেঙ্গল ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজেণ্ট পার্টি সংগঠন করেন। এই দল তখন অল্প কয়েকজন লোকের দ্বারা গঠিত হয়েছে। দলের সভ্যদের মধ্যে ছিলেন সুপণ্ডিত অতুল গুপ্ত, কবি নজরুল ইসলাম, মুজফ্ফর আমেদ।

১৯২৭—এই বছরে তিনি বেঙ্গল ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজেণ্ট পার্টির সম্পাদক হলেন এবং পার্টির মুখপত্র হিসাবে 'লাঙল' ও 'গণবাণী' প্রকাশিত হলে এই বছরের জুন মাসে ঐ দলের প্রতিনিধি হয়ে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সঙ্গে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ করে তোলার জন্য তিনি মস্কো যান। মস্কোতে তিনি মার্ক্সলেনিন ইনষ্টিট্যুটে লেনিনের সহকর্মী বুখারিনের কাছে কমিউনিষ্ট মতবাদের দর্শন ও অর্থনীতি অধ্যয়ন করেন

১৯২৮—এই বছরে কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিক ষষ্ঠ কংগ্রেসে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং ভারতবর্ষের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি একটি থীসিস ও কার্যসূচী পেশ করেন। রুশ নেতা কুসিনিনের উপনিবেশ সংক্রান্ত কার্যসূচী অগ্রাহ্য করে সৌম্যেন্দ্রনাথের কার্যসূচী গৃহীত হলো। (ইণ্টারন্যাশন্যাল প্রেস করেসপণ্ডেণ্ট- মস্কো থেকে প্রকাশিত)। মাদাম সান-ইয়াৎসেনের সভানেত্রীত্বে এশিয়ার অত্যাচারিত দেশগুলির এক সম্মেলন ডাকা হলো। সেই সম্মেলনে ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে মানবেন্দ্রনাথ রায় ও সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিনিধিত্ব করেন। এই বছরেই মাদ্রাজে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম সূত্রপাত হলো। অনুপস্থিত সৌম্যেন্দ্রনাথ প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য নির্বাচিত হলেন।

১৯২৯—দেশের মজুর আন্দোলনকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে ইংরাজ সরকার মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় বহু মজুর নেতাকে গ্রেপ্তার করে। বিদেশে থাকা সত্ত্বেও সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মানবেন্দ্রনাথ রায়কে এই মামলায় জড়ান হয়।

১৯৩২—রাশিয়ায় প্রায় চার বছর থাকার পর তিনি বার্লিন যান। এই বছরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি আবার মস্কো গেলেন। তিনিই রবীন্দ্রনাথকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন সম্বন্ধে উৎসাহী করে তোলেন।

১৯৩৩—জার্মানীতে তখন হিটলারের অভ্যুদয় পর্ব চলেছে। হাজার হাজার বিপ্লবী কর্মী প্রতিদিন গ্রেপ্তার হচ্ছে ও নিধন হচ্ছে। এই সময়ে হিটলারকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে সৌম্যেন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হলেন। জার্মানী থেকে কিছুদিন পরে তাঁকে বহিষ্কৃত করা হলো। জার্মানী থেকে

ছাড়া পেয়ে গেলেন ফ্রান্সে। এই সময় রোমাঁ রলাঁর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হলো এবং তাঁর হাত দিয়ে রমাঁ ভারতীয় যুবকদের জন্য একটি আবেগপূর্ণ আবেদন পাঠালেন (I will not rest. Rolaind)। জার্মানী ও ফ্রান্সে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তিনি অবিরাম প্রচার চালাতে থাকেন এবং প্রবাসী ভারতীয়দের দেশের মুক্তি আন্দোলনে যোগ দিতে উৎসাহ দেন।

এই সময় প্যারিসে অবস্থানকালে ফরাসী ভাষায় গান্ধীবাদের সমালোচনা করে তিনি এক যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা প্রকাশ করেন। তখনকার দিনে গান্ধীবাদের সমালোচনা করা অসম্ভব ছিল। কিন্তু সৌম্যেন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ যুক্তির আঘাতে অস্থির হয়ে পণ্ডিত জহরলালকেও মানতে হয়েছিল "Mr Saumyendra Nath Tagore is one of our young Comrades in India for whom I have the greatest respect Ardent, clear-headed and devoted to the cause of the freedom of the masses, anything that he says or writes must deserve attention"

—(India and the World—Jawaharlal Nehru)

অমর চক্রবর্তী[১৮] প্রকাশিত পুস্তিকায় আরও উল্লেখ আছে ঃ

১৯৩৪—এই সময় তিনি সুধীর দাশগুপ্ত ও প্রভাত সেন প্রভৃতি একনিষ্ঠ কর্মীদের নিয়ে বিপ্লবী কমিউনিষ্ট পার্টি সংগঠন করতে শুরু করেন। ১৯৩৪ সালের অগষ্ট মাসে এই পার্টির মুখপত্র হিসাবে ও সৌম্যেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় "গণবাণী" প্রকাশিত হয়। এই সময় ফ্যাসিজম ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে মনীষী রোমা রোঁলা, আঁরি বারবুস, টমাস ম্যানের নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী আন্দোলন সুরু হয়—ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি করে এক কমিটি গঠিত হয়, সৌম্যেন্দ্রনাথ সেই কমিটির সম্পাদক হন। তাঁর আহ্বানেই ভারতে প্রথম ফ্যাসীবাদ-বিরোধী-আন্দোলন শুরু হয়।

১৯৩৫ সালে বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের চরম পর্যায়ে বৃটিশ শাসকশ্রেণী যে অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতন চালাতে থাকে সৌম্যেন্দ্রনাথ তখন তার বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রবল ঝড় তোলেন। এই সময় তিনি Repression in Chittagong, Horrors of Dacca Jail প্রকাশ করে বাংলায় ইংরাজ শাসকদের অত্যাচার ভারতবাসীর চোখে তুলে ধরলেন।

১৯৩৫ সালে রাজবন্দী সুভাষচন্দ্রের মুক্তির দাবীতে আন্দোলন শুরু হয়। সৌম্যেন্দ্রনাথ নিখিল ভারত সুভাষ মুক্তি দিবসে কলকাতার ময়দানের সভায় যে বক্তৃতা করেন তার ফলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং রাজদ্রোহের অপরাধে এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

১৯৩৬ সালে জেল থেকে বেরিয়ে এসেই তিনি আন্দামানের রাজনৈতিক বন্দীদের অসহনীয় অবস্থার উপর Andamans-Penal Settlement of British Imperialism নামে পুস্তিকা রচনা করেন। আন্দামানের

বন্দীদের মুক্ত করার জন্য রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি ও সৌম্যেন্দ্রনাথকে সম্পাদক করে রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির প্রবল আন্দোলনে আন্দামানের বন্দীদের ইংরেজ সরকার ভারতে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হয়। ১৯৩৮ সালে বাংলার রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী করে শরৎচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে যে কমিটি তৈরী হলো তারও সম্পাদক হলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী সংগ্রামের আহবান জানালেন তিনি 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও ভারত' পুস্তিকা প্রকাশ করে। তার ফলে ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। ইংরেজ রাজ্যের ভারতরক্ষা আইনের তিনিই প্রথম বন্দী।

১৯৪০-৪৫—এক বছরের কারাদণ্ড শেষ হতে না হতে দেশব্যাপী ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের পুরোভাগে আবাব তাঁকে দেখা গেল। আসন্ন আন্দোলনের জন্য তিনি তৈরী হতে লাগলেন। কিন্তু আবার গ্রেপ্তার হলেন এবং ভারতবর্ষের নানা জেলে প্রায় সুদীর্ঘ পাঁচ বছর কাটলো তাঁর।

১৯৪৬—এই বছরে আবার ২৯শে জুলাইয়ের বিখ্যাত ধর্মঘটের নেতৃত্বে দেখা গেল তাঁকে। হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে Resurgence of Tribal Savagery প্রকাশিত হলো।

সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বহু বছর কারাগারে কাটিয়েছিলেন। তাঁর বন্দীজীবনের কথা উল্লেখ করা হলো: ১৯৩৩—বন্দীজীবন কেটেছে মিউনিক জেল, জার্মানী। ১৯৩৫-৩৬ সালে বম্বে সেণ্ট্রাল জেল, আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল। ১৯৩৯-৪০ আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল। ১৯৪১-৪৬ লক্ষ্ণৌ সেন্ট্রাল জেল, ফতেগড় সেণ্ট্রাল জেল, দমদম সেন্ট্রাল জেল। ১৯৪৭-৪৮ বহরমপুর জেল, দার্জিলিং জেল, মেদিনীপুর জেল।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের বিরুদ্ধেও তিনি তীব্রভাবে মত প্রকাশ করেছিলেন। ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষের সরকার সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পশ্চিমবাংলার বহু রাজনৈতিক কর্মীদের ওই সময় বিনা বিচারে আটক রাখে।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বহু বই লিখেছিলেন। কয়েকটি বইয়ের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো: ১. লেনিন, ২. ফ্যাসিজম, ৩. রোজা লুক্সেম-বর্গ, ৪. কার্ল লিবনেক্ট, ৫. বাবুরা কারখানা বসাবার প্রথম টাকাটা পেলো কোথা থেকে, ৬. কংগ্রেসীরাজ ও ভারতের মজুর আন্দোলন, ৭. সোভিয়েট রিপাব্লিক, ৮. পঞ্চায়েৎ, ৯. খোকামী রোগ, ১০. রাশিয়ার কবিতা, ১১. ত্রয়ী, ১২. যাত্রী, ১৩. অথমল্লিনাথ, ১৪. বিহারী সতসই, ১৫. রবীন্দ্রনাথের গান, ১৬. শ্রেণীদল ও বিপ্লব, (ইংরাজ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়) ১৭. নভেম্বর-বিপ্লব ও ভারতবর্ষ, (এই

বইটিও একসময় ইংরাজ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়েছিল) ১৮. মশাল, ১৯. November Revolution & Quit India, ২০. Tactics & Strategy of Revolution, ২১. Bourgeois. Democratic Revolution & India, ২২. United Front or Betrayal, ২৩. People's front or front against the people, ২৪. Sahajananda, Kornilov & Peoples War, ২৫. Gandhism & Labour Peasant Problem, ২৬. With Romain Rolland on Gandhism, ২৭. French Revolution, ২৮. Satyagraha or Service to Capitalism, ২৯. On Self determination of nations, ৩০. Congress Socialism, ৩১. Communism & Fetishism, ৩২. Hitlerism, ৩৩. Permanent Revolution, ৩৪. Treacherous marsh, ৩৫. Constituent Assembly, ৩৬. Resurgence of Tribal Savagery, ৩৭. Leftism & Leftist Unity, ৩৮. Stalin Truman Hands off Korea. ইংরাজ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত আরও কয়েকটি পুস্তক : ৩৯. সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীই কংগ্রেস বিরোধী, ৪০. চাষীর কথা. ৪১. সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও ভারত, ৪২. Gandhism or Service to Capitalism, ৪৩. Peasant Revolt in Malabar.

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৬শে এপ্রিল ১৯৫৮ সালে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁর ভাষণ বই আকারে ছাপা হয়েছিল। ৪৪. Third All India Conference of the United Trade Union Congress, Presidential Address by Saumyendranath Tagore.

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা সব বইয়ের নাম এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হলো না। তাঁর লেখা আরও বই বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল।

'সাহিত্যিকা' পত্রিকা প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল অগ্রহায়ণ ১৩৪২ সালে। সম্পাদক—বাদল গঙ্গোপাধ্যায়। মূল্য—প্রতি সংখ্যা চার আনা। অফিস : ৭২।৫, মির্জাপুর স্ট্রীট, কলকাতা। এই সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল কয়েকটি লেখা যেমন : যুদ্ধের বিরুদ্ধে অভিযান, যুদ্ধ সুবিধাবাদ ও ভারতের কর্তব্য, পুস্তক পরিচয়, চলতি পথে। কাগজের প্রকাশক ছিলেন : সুকেশচন্দ্র ব্যানার্জি। ছাপা হতো কলকাতার—রাজলক্ষ্মী প্রেস থেকে। প্রেসের ঠিকানা : ২৭।৫, মির্জাপুর স্ট্রীট, কলকাতা।

'সাহিত্যিকা'[১৭] কাগজে কৈফিয়ৎ কলমে প্রকাশিত লেখার কিছু অংশ হলো এই :

'……এমনি ধারা সেবার বাণী নিয়ে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে "সাহিত্যিকা" সাচ্চা স্বাধীনতাকামীদের অকৃত্রিম সাহায্য ও অকপট সহানুভূতি

দাবী করছে। "সাহিত্যিকার" এই দাবী অবশ্য ন্যায্য। যে সাহিত্য জাতীয সংগ্রামেব নেতৃত্ব করবে সেই সাচ্চা সাহিত্যের অকপট সেবা,—আজ অতীব কঠিন। সমাজের কর্ণধারদের নিকট সাচ্চা সাহিত্য অপ্রিয় সুতরাং সব সময় সমস্ত অপ্রিয় সাচ্চা ঘটনা, বিধি-ব্যবস্থা লিপিবন্ধ কবা সম্ভবপর হবে না। বর্ত্তমানে সাহিত্যিক ও বার্ত্তাজীবিদের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। একবারও তাঁরা ভেবে দেখেছেন কি যে বর্ত্তমান সাহিত্যের ধারাতে আমূল পরিবর্ত্তন সাধন কবে আজকের এই গলদ পূর্ণ পঙ্গু সমাজকে ঢেলে সাজাতে না পাবলে উল্লিখিত শোচনীয় অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার আর কোন দ্বিতীয় পন্থা নেই? প্রায সমস্ত সাহিত্যিকই আজ জ্ঞাতসারে কি অজ্ঞাতসারে বর্ত্তমান অন্যায়, অত্যাচাবী ও শোষণকারী সমাজ ব্যবস্থা' অস্তিত্বের জন্য দায়ী আজ অবিলম্বে এমন এক নব সাহিত্য সৃষ্টিব দিকে মনোনিবেশ কবা দবকাব যা বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে সেই ধ্বংসাবশেষেব উপব গড়ে তুলবে এক অন্যায ও অত্যাচার হীন নূতন সমাজ।

বর্ত্তমানে অধিকাংশ সাহিত্যিক এবং সাহিত্য সম্রাটগণেব কেউ সাহিত্য সৃষ্টি কবছেন কমিউনিজমকে-স্বাধীনতাকামীদের গালাগালি দিযে, কেউবা ফ্রয়েড, লুগেভিস, হ্যাভেলক এলিস প্রভৃতি যৌনবাদীদেব প্রণীত পুস্তকের সমালোচনা পাঠ কবে মানুষের দৈহিক ক্ষুধা নিবৃত্তির নামে জঘন্য অশ্লীল সাহিত্য রচনা করে নিজেদের কৃতার্থ মনে কবছেন। জনগণও অন্য কোন সাহিত্যের সন্ধান না পেয়ে এদেরই বাহাবা দিচ্ছে ও সাহিত্য সম্রাট প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত করছে। গল্প সাহিত্যের মধ্যে কৃত্রিমতা পূর্ণ প্রেমেব গল্প ব্যতীত আর কোন মৌলিকতা নেই। সমাজের যে ছবি বর্ত্তমান সাহিত্যিকগণ এই সকল গল্পের ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চান তাতে সমাজের কোন কল্যাণ সাধিত হওয়া তো দূরের কথা, ভূরি ভূরি অকল্যাণই সাধিত হচ্ছে—জাতির জীবনীশক্তি হ্রাস হযে জাতি একেবারে পঙ্গু হয়েছে। "সাহিত্যিকার" অন্যতম কাজ এই পঙ্গু জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করা।

চোখে আঙ্গুল দিয়ে "সাহিত্যিকা" দেখিয়ে দেবে বর্ত্তমান সমাজ সর্ব্ব-সাধাবণের হিতকল্পে নয। সমাজের যে ছবি বর্ত্তমান সাহিত্যিকরা ঢেকে রাখতে চান তাঁদের শ্রেণী স্বার্থ বজায় রাখবার জন্য সেই ছবি আজ আঁকবে 'সাহিত্যিকা'। অনাহারে, বস্ত্রাভাবে, বেকারগ্রস্ত হয়ে কিভাবে প্রতিদিন দেশের শতকরা নব্বই জন নরনারী অর্দ্ধমৃত অবস্থায় দুর্ব্বহ জীবন বহন করে চলেছে এবং অবশেষে অসহ্য যন্ত্রণার কবল হতে হয়তো বা মরে গিয়ে নিস্তার পাচ্ছে নতুবা করছে আত্মহত্যা। উপরে এত চাকচিক্য, এত জাঁকজমক, এত সভ্যতা কিন্তু পশ্চাতে রয়েছে অমানিতর সমাজ। যত ধনদৌলত, পণ্য সম্ভার প্রভৃতি উৎপন্ন করলো এরা, কিন্তু এরাই নির্য্যাতিত,

উৎপীড়িত, অত্যাচারিত এবং সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষিত! যুদ্ধ কেন বাধে, বেকার সমস্যার হেতু কি, ব্যবসা ও বাণিজ্য কেন মন্দা, স্বাধীনতার স্বরূপ কি প্রভৃতি সমস্যাগুলোর মূলে যে রয়েছে বর্ত্তমান শোষণকারী সমাজ-ব্যবস্থা তা বিশ্লেষণ করে "সাহিত্যিকা" সাহিত্য সৃষ্টি করবে উপেক্ষিতদের শ্রেণী-চেতনা জাগাবার জন্য। এরাই গড়বে নতুন সমাজ ও রাষ্ট্র।'

'বাঙ্গলার কথা', প্রথম ভাগ, প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯২১ সাল। ১৪ই আশ্বিন ১৩২৮ সাল। 'বাঙ্গলার কথা' ছিল সাপ্তাহিক কাগজ। অফিস ছিল—৭নং ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা। কাগজের প্রকাশক ছিলেন—হেমন্তকুমার সরকার। কাগজ ছাপা হতো মেটকাফ প্রেস, ৭৯নং বলরাম দে স্ট্রীট, কলকাতা। সম্পাদক: চিত্তরঞ্জন দাশ। কাগজের দাম ছিল—এক আনা। কাগজের অফিসের কর্মকর্তা ছিলেন—অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। প্রথম ভাগ, প্রথম সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল কয়েকটি লেখা যেমন: ১. বাঙ্গালার কথা—চিত্তরঞ্জন দাশ, ২. স্বরাজ সাধনা—চিত্তরঞ্জন দাশ, ৩. বস্ত্র যজ্ঞ—চিত্তরঞ্জন দাশ, ৪ শিক্ষার বিরোধ—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এই কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল।

'বাঙ্গালার কথা'[১৮] থেকে একটি লেখার কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো:

'বাঙ্গালী হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খৃষ্টান হউক, বাঙ্গালী বাঙ্গালী। বাঙ্গালীর একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে, একটা স্বতন্ত্র ধর্ম্ম আছে। এই জগতের মাঝে বাঙ্গালীর একটা স্থান আছে, অধিকার আছে, সাধনা আছে, কর্ত্তব্য আছে। বাঙ্গালীকে প্রকৃত বাঙ্গালী হইতে হইবে। বিশ্ববিধাতার যে অনন্ত বিচিত্র সৃষ্টি, বাঙ্গালী সেই সৃষ্টিস্রোতের মধ্যে এক বিশিষ্ট সৃষ্টি। অনন্ত রূপ লীলা-ধারের রূপ বৈচিত্র্যে বাঙ্গালী একটি বিশিষ্ট রূপ হইয়া ফুটিয়াছে। আমার বাঙ্গালা সেই রূপের মূর্ত্তি। আমার বাঙ্গালা সেই বিশিষ্ট রূপের প্রাণ। যখন জাগিলাম, মা আমার আপন গৌরবে তাঁহার বিশ্বরূপ দেখাইয়া দিলেন।'……

'বাঙ্গালার কথা' প্রথম ভাগ, ২য় সংখ্যা, প্রকাশিত হয়েছিল: শুক্রবার ৭ই অক্টোবর, ১৯২১, ২১শে আশ্বিন ১৩২৮ সাল। এই সংখ্যায় উল্লেখ ছিল: পূজা সংখ্যা বাঙ্গলার নবযুগের সাপ্তাহিক মুখপত্র—"বাঙ্গলার কথা"। সম্পাদক: চিত্তরঞ্জন দাশ, সহকারী সম্পাদক: হেমন্তকুমার সরকার। এই সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল কয়েকটি লেখা যেমন: ১. ভারতের লক্ষ্য—চিত্তরঞ্জন দাশ, ২. ব্যর্থ বোধন (কবিতা)—সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, ৩. গোলামখানার শিক্ষা—হেমন্তকুমার সরকার, ৪. শিক্ষার বিরোধ—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

'বাঙ্গলার কথা', প্রথম ভাগ, ৩য় সংখ্যা, প্রকাশিত হয়েছিল—শুক্রবার, ২১শে অক্টোবর ১৯২১, ৪ঠা কার্তিক ১৩২৮ সাল। এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল কয়েকটি লেখা যেমন ঃ

১. স্বরাজ চাওয়া—চিত্তরঞ্জন দাশ, ২. মাতৃজাতির প্রতি—হেমন্ত-কুমার সরকার, ৩. মাভৈঃ—ঊর্ম্মিলা দেবী, ৪. যুগ-সাধনা—সুকুমার-রঞ্জন দাশ, ৫. ঢাকা জেলায় চরকা শিল্প—প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। চিত্তরঞ্জন[১৯] দাশ লিখিত 'স্বরাজ চাওয়া' লেখার কিছু অংশ হলো এই ঃ

'যে শুধু মুখে জয়ধ্বনি করে, যার অন্তরে স্বরাজের বেদনা জাগে নাই, যার অন্তর স্বরাজের ভাবে ভেজে নাই, সে কি স্বরাজ চাইতে পারে? স্বরাজ পাওয়া কি যেমন তেমন? দুটো সভায় গেলাম, "মহাত্মা গান্ধী কি জয়" চীৎকার করে বল্লাম তাতেই কি হলো? তাতেই কি বুঝব স্বরাজলাভ হবে? যখন দেখব আদালত শূন্য প্রায়—উকীলেরা আদালত ছেড়েছেন, যখন দেখব স্কুল কলেজ শূন্য হয়ে গেছে—যখন দেখব যুবকেরা দলে দলে গ্রামে গিয়ে লোকের হিতসাধনে ব্রতী হয়েছেন, গ্রামে গ্রামে কৃষকের এই পরাধীনতার শৃঙ্খল যাতে ছুটে যায় তার চেষ্টা করচেন, তখনই বুঝব আপনারা স্বরাজ চান। মহাত্মা গান্ধীর জয়? মহাত্মা কে? তিনি একজন অসাধারণ ব্যক্তি সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারত কি একজনের জয় চান? ভারত আজ চায় ভারতের জয়। মহাত্মা গান্ধীর জয়ধ্বনিতে যখন গগন বিদীর্ণ করচি তখন মনে হয় সেই জয় এখনো আসে নাই—কিন্তু সেই জয়ের সম্ভাবনাতে প্রাণ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। যখন আপনারা কার্য্যক্ষেত্রে নামবেন—যখন স্কুল কলেজ আদালত শূণ্য হয়ে যাবে—যখন প্রাণের অশান্ত চেষ্টা স্বরাজ লাভের জন্য একাগ্র হবে—তখনই বুঝব আপনারা স্বরাজ চান, তখনই মহাত্মা গান্ধীর জয় পূর্ণ হবে। মনের মধ্যে তাহাই বুঝে দেখুন। অসার কল্পনায় মত্ত হয়ে উঠবেন না। স্বরাজ, বিনা চেষ্টায় বিনা সাধনায় গাছের ফলের মত পড়বে না। সেই সাধনা এখনই সফল করতে হবে।'

'বাঙ্গলার কথা', প্রথম ভাগ, ৯ম সংখ্যা, প্রকাশিত হয়েছিল—২রা ডিসেম্বর ১৯২১, ১৬ই অগ্রহায়ণ ১৩২৮ সাল। কাগজের দাম প্রতি সংখ্যা এক আনা। এই সংখ্যায় লিখেছিলেন ঃ সাতকড়িপতি রায়, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, সরলাদেবী চৌধুরাণী, চিত্তরঞ্জন দাশ, কাজী নজরুল ইসলামের[২০] লেখা এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

'নবযুগ

কাজী নজরুল ইসলাম

আজ মহা বিশ্বে মহা জাগরণ, আজ মহামাতার মহা আনন্দের দিন, আজ মহামাতার মহাযুগের মহা উদ্বোধন। আজ নারায়ণ আর

ক্ষীরোদসাগরে নিদ্রিত নন। নরের মাঝে আজ তাঁহার অপূর্ব্ব মুক্তি-কাঙাল বেশ। ঐ শোনো, শৃঙ্খলিত নিপীড়িত বন্দীদের শৃঙ্খলের ঝনৎকার। তাহারা শৃঙ্খল-মুক্ত হইবে, তাহারা কারাগৃহ ভাঙ্গিবে। ঐ শোনো মুক্তি-পাগল মৃত্যুঞ্জয় ঈশানের মুক্তি-বিষাণ! ঐ শোনো মহামাতা জগদ্ধাত্রীর শুভ শঙ্খ! ঐ শোনো ইসরাফিলের শিঙ্গায় নব-সৃষ্টির উল্লাস-ঘন রোল! ঐ যে ভীম রণ কোলাহল, তাহাতেই মুক্তি-কামী দৃপ্ত তরুণের শিকল টুটার শব্দ ঝন ঝন করিয়া বাজিতেছে! সাগ্নিক ঋষির ঋক্-মন্ত্র আজ বাণী লাভ করিয়াছে অগ্নি পাথারের অগ্নি-কল্লোলে। আজ নিখিল উৎপীড়িতের প্রাণ-শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ঐ মন্ত্র-শিখার পরশ পাইয়া। আজ তাহারা অন্ধ নয়, তাহাদের চোখের উপরকার কৃষ্ণ পর্দ্দা তীব্র বহ্নি-ঘাতে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তাহাদের নয়নে আজ মুক্ত জ্যোতিঃ বিস্ফুরিত। আজ নূতন করিয়া মহাগগন তলে দাঁড়াইয়া ঐ অনাদি অসীম মুক্ত শূন্যতার পানে তাহারা চাহিয়া দেখিয়াছে, কোথায় সে অনন্ত মুক্তি আর কোথায় তাহারা পড়িয়া বন্ধন-জর্জ্জরিত। নরে আর নারায়ণে আজ আর ভেদ নাই। আজ নারায়ণ মানব। তাঁহার হাতে স্বাধীনতার বাঁশী। সে বাঁশীর সুরে সুরে নিখিল মানবের অণু পরমাণু ক্ষিপ্ত হইয়া সাড়া দিয়াছে। আজ রক্ত প্রভাতে দাঁড়াইয়া মানব নব প্রভাতী ধরিয়াছে—"পোহাল পোহাল বিভাবরী পূর্ব্ব তোরণে শুনি বাঁশরী।" এ সব নবযুগের। সেই সর্ব্বনাশা বাঁশীর সুর রুষিয়া শুনিয়াছে, আয়র্ল্যাণ্ড শুনিয়াছে, তুর্ক শুনিয়াছে আরো অনেকে শুনিয়াছে এবং সেই সঙ্গে শুনিয়াছে আমাদের হিন্দুস্থান,—জর্জ্জরিত, নিপীড়িত শৃঙ্খলিত ভারতবর্ষ।

ভারত যে দিন জাগিল, সেদিন নিজের পানে চাহিয়া সে নিজেই লজ্জায় মরিয়া গেল। সে দিন সর্ব্বাপেক্ষা অপমানিত পদানত ঘৃণ্য সে। কতশত বর্ষের কত সহস্র শৃঙ্খলের কত লক্ষ বাঁধনই না মোচড় খাইয়া খাইয়া দাগ কাটিয়া বসিয়া গিয়াছে—তাহার অস্থি পঞ্জর ভেদ করিয়া মর্ম্মের ও মর্ম্মস্থলে! কত গোলা কত গুলি, কত বল্লম, কত তলোয়ারই না তাহার বুক ঝাঁজরা করিয়া দিয়াছে। পৃষ্ঠে তাহার নিষ্করুণ বেত্রাঘাত ও দুর্বিনীত পদাঘাতের দুর্বিসহ বেদনা-ঘা। গর্দ্দানে তাহার নির্দ্দয় খামখেয়ালী পশুশক্তির বিপুল জগদ্দল শীলা। চক্ষে তাহার সাতপুরু করিয়া কাপড় বাঁধা। যেই সে গা মোড়া দিয়া উঠিল, অমনি তাহার আগেকার কাঁচা ঘায়ে সপাৎ সপাৎ করিয়া জল্লাদের লৌহ হস্তের কাঁটার চাবুক বসিল। অসহনীয় সে নির্ম্মম অপমানে সে যখন ক্ষিপ্তের মত হাত-পা ছুড়িয়া গর্দ্দানের বোঝা জোর করিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া শির উঁচু করিয়া তাকাইল, তখন কসাই-এর ভোঁতা ছোরা দিয়া কচ্লাইয়া কচ্লাইয়া তাহার প্রাণপ্রিয় সন্তানগুলিকে তাহারই বুকের উপর রাখিয়া হত্যা করা হইল। হা হা

করিয়া যখন মা তাহার বাছাদের রক্ষা করিতে গেল, তখন তাহারই দলিত শিশুর কলিজা মথিত রক্তের বিপুল ঝাপটা তাহার মুখে ছিটাইয়া দেওয়া হইল। সেই সন্তানের রক্ত-মাখান দৃষ্টি দিয়া সে জল ভরা চোখে দেখিল, পূর্ব্বতোরণে অগ্নিরাগে লেখা রহিয়াছে "নবযুগ"। নয়ন দিয়া তাহার হু হু করিয়া অশ্রুর শত পাগল ঝোরা ছুটিল। সে তাহার কোলের কাটা সন্তানের মুণ্ড ফেলিয়া, দুই ব্যগ্রবাহুর ব্যাকুল আলিঙ্গন মেলিয়া নবযুগকে আহ্বান করিল, "তুমি এস"। নবযুগ সেই ব্যাকুল কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পায়ে মাথা রাখিয়া বলিল, "আর আমায় ছাড়িও না মা। এমনই করিয়া যুগে যুগে আমার আহ্বান করিয়ো।"

আবার দূরে সেই সর্ব্বনাশা বাঁশীর সুর বাজিয়া উঠিল। রুষিয়া বলিল, "মারো অত্যাচারীকে! ওড়াও স্বাধীনতা বিরোধীর শির! ভাঙো দাসত্বের নিগড়! এ বিশ্বে সবাই স্বাধীন। মুক্ত আকাশের এই মুক্ত মাঠে দাঁড়াইয়া কে কাহার অধীনতা স্বীকার করিবে? এই "খোদার উপর খোদকারী" শক্তিকে দলিত করা এই স্বার্থের শাসনকে শাসন কর। 'আল্লাহু আকবর' বলিয়া তুর্কী সাড়া দিল। তাহার শূন্য নতশিরে আবার অর্দ্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত রক্তশিখ ফেজের রক্তরাগ স্বাধীনতাপহারীর অন্তরে মহাভীতির সঞ্চার করিল। শিথিল মুষ্টির ভূলুণ্ঠিত তরবার আবার আস্ফালন করিয়া উঠিল। আইরিশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "যুদ্ধ শেষ হয় নাই। এখনো বিশ্ব দানবশক্তির বজ্রমুষ্টি আমাদের টুঁটি টিপিয়া ধরিয়া রহিয়াছে। এ অসুর শক্তি ধ্বংস না হইলে দেবতা বাঁচিবে না। যজ্ঞ জ্বলুক। এ হোম-শিখায় যদি কেহ না দেয় আমরা আমাদের প্রাণ আহুতি দিব। এমন সময় ভারত জাগিল। এত দিনে ভারতের বোধিসত্ত্ব-বুদ্ধ মেলিয়া চাহিলেন। ভারত ব্যাপিয়া হর্ষ-বাণীর মহাকল্লোল কলকল নিনাদে ধ্বনিত হইল "আবিরাবির্ম্মএধি!" সারা বিশ্ব কান পাতিয়া সে মুক্তি কল্লোল শুনিল। যুগাবতারের কাঙাল বেশে করুণ নয়নপাতে সারা বিশ্বের আর্ত্তনিখিলের বন্ধন, কাতরতা আর মুক্তি-লিপ্সা মূর্ত্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিল। একই দুঃখে আজ দুঃখী জনগণ দেশ জাতি সমাজের বহির্ব্বন্ধন ভুলিয়া পরস্পর পরস্পরকে বুকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিল। আজ তাহারা এক, তাহারা একই ব্যথায় ব্যথিত নিষ্পীড়িত সত্য মানবাত্মা। আজ কেহ কাহাকেও বাহির হইতে দেখে নাই। অন্তর দিয়া পরস্পরের বন্ধন বেদনাতুর অন্তর দেখিয়াছে। তাহাদের উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত রবে—ঐ দেখ—বুঝি বন্ধন প্রয়াসীর মুখ বন্ধ হইয়া গেল হস্তমুষ্টি শিথিল হইয়া গেল।

ঐ শোন নবযুগের অগ্নিশিখা নবীন সন্ন্যাসীর মন্ত্রবাণী। ঐ বাণীই রণক্লান্ত সৈনিককে নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। ঐ শোনো তরুণ কণ্ঠের বীরবাণী—আমাদের মধ্যে ধর্ম্মবিদ্বেষ নাই, জাতিবিদ্বেষ

নাই, বর্ণবিশ্বেষ নাই, আভিজাত্য অভিমান নাই। আজ আমরা আমাদের এই মুক্তিকামী ভাইদের রক্তপূত সবুজ প্রান্তরে দাঁড়াইয়া তাহাদের পবিত্র স্মৃতির তর্পণ করিতেছি। পরস্পর পরস্পরকে ভাই বলিয়া, একই অবিচ্ছিন্ন মহাত্মার অংশ বলিয়া অন্তরের দিক হইতে চিনিয়াছি। এই রক্ত সমাধি পাশে দাঁড়াইয়া আমরা যেন সব স্বার্থ ভুলিয়া যাই। একই বিশ্বে একই বিশ্বমাতার বড় ছোট ভাই বলিয়া যেন করুণা ধারায় আমাদের বুক সিক্ত হইয়া ভরিয়া ওঠে। আজ এ মহামিলনে যেন এতটুকু দীনতা থাকে না। এই মহামানবের সাগরতীরে শ্মশানবেলায় আমাদের এই যুগ বাঞ্ছিত মহা-মিলন পবিত্র হউক, শাশ্বত হউক।

দাঁড়াও জন্মভূমি জননী আমার! একবার দাঁড়াও!! যেদিন তুমি সমস্ত বাধা বন্ধন মুক্ত, মহা মহিমময়ী বেশে স্বাধীন বিশ্বের পানে অসংকোচ দৃষ্টি তুলিয়া তাকাইবে, সে দিন যেন নিজের এই ক্ষতবিক্ষত অঙ্গ ঝাঁজরা পারা বক্ষ, সুতশোণিতলিপ্ত ক্রোড় দেখিয়া কাঁদিয়োনা! তোমার পুত্রশোকাতুর বুকের নিবিড় বেদনা সেদিন যেন উছলিয়া উঠেনা মা! সেদিন তুমি তোমার মুক্ত শিশুদের হাত ধরিয়া বিশ্বমঞ্চে বীরপ্রসূজননীর মত উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়ো। ঐ দূর সাগর পার হইতে তোমার মুখে সেদিন যেন, নব প্রভাতের তরুণ হাসি দেখি। যে বীর পুত্র তাহার তরুণ অসমাপ্ত জীবনের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা তোমার মুক্তির জন্য বলিদান দিয়া বিদায় লইয়াছে, সেদিন তাহাকেই হয়ত তোমার বেশী করিয়া মনে পড়িবে। কিন্তু সেদিন আর চোখের জল ফেলিয়োনা মা। বুক-জোড়া হাহাকার তোমার সেদিন কোলের সন্তানদের দেখিয়া ভুলিতে চেষ্টা করিয়ো!

এস ভাই হিন্দু! এস ভাই মুসলমান! এস বৌদ্ধ! এস ক্রিশ্চিয়ান! আজ আমরা সব গণ্ডি কাটাইয়া সব সংকীর্ণতা সব মিথ্যা সব স্বার্থ চিরতরে পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি। আজ আমরা আর কলহ করিব না। চাহিয়া দেখ, পাশে তোমাদের মহা শয়নে শায়িত ঐ বীর ভ্রাতৃগণের শব। ঐ গোরস্থান ঐ শ্মশান ভূমিতে—শোন শোন তাহাদের তরুণ আত্মার অতৃপ্ত ক্রন্দন। এ পবিত্র স্থানে আজ স্বার্থের দ্বন্দ্ব মিটাইয়া দাও ভাই। ঐ শহীদ ভাইদের মুখ মনে কর, আর গভীর বেদনায় মূক স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। মনে কর, তোমাকে মুক্তি দিতেই সে এমন করিয়া অসময়ে বিদায় লইয়াছে। উহার সে ত্যাগের অপমান করিয়োনা, ভুলিয়োনা! আজ আর কলহ নয়। আজ আমাদের ভাই এ ভাই এ বোনে বোনে মায়ের কাছে অনুযোগের আর অভিযোগের এই মধুময় কলহ হইবে যে, কে মায়ের কোলে চড়িবে আর কে মায়ের কাঁধে উঠিবে।'

'বাঙ্গালার কথা', দৈনিক মুখপত্র রূপে—প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ২২শে অগ্রহায়ণ ১৩২৯, ৮ই ডিসেম্বর ১৯২২ সালে।

সম্পাদক ঃ সুভাষচন্দ্র বসু। কাগজের দাম এক পয়সা। প্রকাশক ঃ ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৪নং রামতনু বসুর লেন, কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতো। কাগজ ছাপা হতো মেটকাফ প্রেস, কলকাতা থেকে।

'সংহতি' ছিল মাসিক পত্রিকা। জিতেন্দ্রনাথ গুপ্ত ছিলেন এই কাগজের প্রতিষ্ঠাতা। সম্পাদক ঃ জ্ঞানাঞ্জন পাল, কেশবেশ্বর বসু। ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল বৈশাখ ১৩৩১ সালে। কাগজের কার্যালয় ঃ ১০, রূপচাঁদ মুখার্জি লেন, ভবানীপুর, কলকাতা। কাগজের মূল্য প্রতি সংখ্যা তিন আনা। এই সংখ্যায় লিখেছিলেন, বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস রায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, এবং আরও অনেকে। ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যায় শ্রমজীবী প্রসঙ্গে আলোচনা, মজুরের গান, বাংলার কৃষক নিয়ে কবিতা ছাপা হয়েছিল।

'সংহতি' ২য় বর্ষ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ সালের সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল ঃ আসামে কুলি চালান নিয়ে আলোচনা, রেলওয়ের কথা প্রভৃতি লেখা।

'সংহতি', ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, প্রকাশিত হয়েছিল—শ্রাবণ ১৩৩১ সালে। কাগজের দাম তিন আনা। সম্পাদক ঃ জ্ঞানাঞ্জন পাল, কেশবেশ্বর বসু। সংহতি[২১] কাগজে প্রকাশিত একটি লেখার কিছু অংশ হলো এই ঃ

'তারকেশ্বরের কথা

প্রত্যহ প্রাতে খবরের কাগজ খুলিয়াই দেখি যে তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহ আন্দোলন কিরূপ চলিতেছে তাহার বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। প্রত্যহ চারিব্যাচে প্রতি ব্যাচে চারিজন করিয়া যে ষোলজন গ্রেপ্তার হইতেছে তাহাদের নাম ধাম, তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালাইবার জন্য সংগৃহীত চাঁদার তালিকা, নিজ তারকেশ্বরে বা নিকটবর্তী অন্যান্য স্থানে উক্ত আন্দোলন উপলক্ষে আহূত সভা সমিতির কার্য্য বিবরণ, সত্যাগ্রহীদের উপর পুলিশের নানাবিধ অত্যাচারের কাহিনী এইরূপ আরও ঐ জাতীয় বিবিধ সংবাদ দিনের পর দিন খবরের কাগজ খুলিলেই চোখের সম্মুখে পড়িতেছে। অবস্থা এখন এইরূপ যে যাঁরা দেশের এবং কল্যাণ সম্বন্ধে সামান্য মাত্রও চিন্তা করেন তাঁহাদের এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ সহকারে চিন্তা করা উচিত এবং যাহাতে সকল দিক রক্ষা হইয়া কোনও মীমাংসা হয় তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করা উচিত।

তারকেশ্বর সংক্রান্ত এই আন্দোলনও নেহাৎ অল্প দিনের নয় যে ইহাকে একরূপ দু' কথায় চাপা দেওয়া চলিবে। আজ দু-মাস উত্তীর্ণ হইয়া গেল ব্যাপার এইরূপভাবে গড়াইয়াই চলিয়াছে, তৃতীয় মাস পড়িল তবুও ভবিষ্যতে যে ইহার কোনও একটা মীমাংসা হইবে সেরূপ আশা করা যাইতেছে না। তারকেশ্বরের মোহন্ত এবং তদনুষ্ঠিত কুকীর্ত্তির বিরুদ্ধে জনসাধারণের

আন্দোলন আজ এই প্রথম নয়. ইহার পূর্ব্বেও এইরূপ হইয়াছে। মোহন্ত মাধবগিরি এবং নবীন এলোকেশী সংক্রান্ত বৃত্তান্ত, বাংলার এমন কে আছেন যিনি না শুনিয়াছেন। এই ব্যাপারে তখনকার দিনের জনসাধারণের মন বিশেষভাবে বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল এবং মোহান্ত মাধবগিরিকে শেষ পর্য্যন্ত ইহার জন্য বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। এখনও যেমন বর্ত্তমান মোহন্ত সম্বন্ধে নানারূপ সত্য এবং কল্পিত কদাচার এবং অনাচারের কাহিনী পুস্তিকাকারে লিখিত হইয়া প্রচারিত হইতেছে এবং তাঁহার চরিত্রগত কলংক বা প্রজাদের উপব অত্যাচার-এর বিবরণ নানাবিধ বাংলা দৈনিকে স্থান পাইতেছে, তখনও মোহন্ত মাধবগিরির সম্বন্ধে এইরূপ বহুবিধ সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল এবং এলোকেশী ঘটিত ব্যাপার সারা বাংলার পথে ঘাটে, জনসাধারণের গানে গল্পে চিন্তায় তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।'

'সওগাত'—সচিত্র মাসিক পত্র। অগ্রহায়ণ ১৩২৫, দাম প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা। প্রকাশক: দি মোসলেম প্রিন্টিং এন্ড পাব্লিসিং কোং লিমিটেড, ৮, জেকারিয়া স্ট্রীট, কলকাতা। জেনারেল ম্যানেজার: এম. নাসির উদ্দিন। সওগাত কাগজে বিভিন্ন সময়ে যাঁরা লিখতেন তাঁদের কয়েক জনের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো: মিসেস আর, এস, হোসেন. মানকুমারী বসু, মোহম্মদ কে চাঁদ, সিরাজী, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়. কুমুদরঞ্জন মল্লিক, ব্রজমোহন দাস, সাহাদাৎ হোসেন, রসময় লাহা, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, জলধর সেন, ফজলুর রহিম চৌধুরী, ও. আলী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কায়কোবাদ, সরসীবালা বসু, কালিদাস রায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গোলাম মোস্তাফা এবং আরও অনেকে।

সওগাত, ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল: ফাল্গুন ১৩২৫ সালে। পৃষ্ঠা ২৮৩, উল্লেখ আছে: 'জাতীয় মহামিলন অর্থাৎ চট্টোগ্রামের সম্মিলন-এর কথা। ২৮শে ২৯শে ডিসেম্বর মুসলমান শিক্ষা সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। এই অধিবেশনের শেষে যা' বলা হয়েছিল তা' 'সওগাতে' প্রকাশিত হয়। সওগাত[২২] কাগজে প্রকাশিত লেখার কিছু অংশ হলো এই:

'হিন্দু-মুসলমান

উপসংহারে সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় এই হিন্দু-মুসলমানের মিলন প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়া "মধুরেণ সমাপয়েৎ" করিব। হিন্দু-মুসলমান বঙ্গ-জননীর যুগল সন্তান। রাজনীতি ক্ষেত্রে আজ উভয় ভ্রাতা পরস্পরকে আলিঙ্গণ দিতে পারিয়াছে, ইহা সুখের কথা। এই মিলন পরস্পরের স্বার্থের অনুরোধেই ঘটিতেছে, তবুও ইহা প্রার্থনীয়। কিন্তু সাহিত্য-ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের যে মিলন হইবে, তাহাতে স্বার্থের সম্বন্ধ থাকিবে না। সে মিলন অতি পবিত্র এবং অতি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত

হইবে। সাহিত্যের মধ্য দিয়াই হিন্দু-মুসলমান পরস্পরকে সত্যিকার ভাই বলিয়া চিনিতে পারিবে, সেই শুভদিনের সূত্রপাত হইয়াছে। চিন্তাশীল ও দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ আর কোন্দল, কলহ ও হিংসা বিদ্বেষপূর্ণ সাহিত্য পছন্দ করিতেছেন না।

আসুন আমরা অপ্রীতিকর অতীতকে ভুলিযা গিয়া মাতৃভাষার আঁচল ধরিযা মুক্তি ও মহত্বের দিকে অগ্রসর হই এবং সকলে মিলিয়া কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইযা আজ বঙ্গের নগর, প্রান্তরকে মুখরিত করিয়া তুলি—

আজি শুভলগ্নে ভাই, ভুলে যাও মম / অতীতের শত অপরাধ, / আমিও তোমারে ক্ষমি প্রীতিভরে আজি / ভাঙ্গিতেছি ভিন্নতার বাঁধ। / তোমার যে দেশ সে যে আমারো স্বদেশ— / উভয়ের এক জন্মভূমি, / এক গঙ্গা জ'ল তোষে দোঁহে চিরদিন / হিমাদ্রির পাদদেশ চুমি।'

বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের যে কোন ভাষার দৈনিক সংবাদপত্রের তুলনায় আনন্দবাজার পত্রিকার প্রচার সবচেয়ে বেশী। একদা আনন্দবাজার পত্রিকা ছাপা হতো ১৭/১, মির্জাপুর স্ট্রীট, কলকাতা থেকে। তারপর বর্মণ স্ট্রীট থেকে কাগজ প্রকাশিত হতো। ইংরেজের কাছে এই সংবাদপত্রের পরিচয় ছিল—'Extremist in Tone'। আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিকরা শুরু থেকে স্বাধীনতার আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন। জাতীয় আন্দোলনের জন্য সত্যাগ্রহ শুরু হলে আনন্দবাজারের সাংবাদিকরা সত্যাগ্রহের বাণীকে জনসাধারণের কাছে পৌঁছিয়ে দেবার ব্রত গ্রহণ করে লেখনী ধরেছিলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন সময়ের স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা, বিপ্লবীদের কীর্তিকাহিনী, ইংরেজ সরকারের অত্যাচার প্রভৃতি সংবাদ এই পত্রিকার সাংবাদিকরা দেশবাসীর কাছে প্রচার করে অনেকে কারাবরণ করেন।

সুরেশচন্দ্র মজুমদার[২৩] লিখেছেন ঃ 'জাতীয় স্বাধীনতার ইতিহাস বস্তুতঃ এক সুদীর্ঘ দুঃখ নির্যাতন বরণের ইতিহাস। মুক্তির স্বপ্ন অন্তরে পোষণ করিবার অপরাধে দেশের লক্ষ লক্ষ যাঁহারা সামাজিক শাসকশক্তির হস্তে নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, আনন্দবাজার পত্রিকা কঠিন কর্মপথে তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছে। নিতান্ত কথার দ্বারা উৎসাহ প্রচার নহে, বৈদেশিক শাসকের হস্তে সেই দুঃখ ও নির্যাতনের ভাগী হইয়া এবং বস্তুতঃ জাতীয় সংগ্রামের সহিত একাত্ম হইয়া আনন্দবাজার পত্রিকা তাহার কর্তব্য করিতে পারিয়াছে।'

সুরেশচন্দ্র মজুমদার[২৪] আরও উল্লেখ করেছেন, '......অসহযোগ আন্দোলনকালে, দেশব্যাপী চেতনার আলোড়ন ও জাগৃতির এক স্মরণীয় দিবসে দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার আবির্ভাব হইয়াছিল। অসহযোগ আন্দোলনের প্রবর্তক ভারতের মহাত্মা যেই দিন রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার হইলেন, সেই দিন দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম আত্মপ্রকাশ।'

সুরেশচন্দ্র মজুমদার[২৫] আনন্দবাজার প্রসঙ্গে লিখেছেন : 'বস্তুতঃ সারা বাংলাদেশের অসহযোগ আন্দোলনের মুখপত্ররূপেই আনন্দবাজার পত্রিকার নূতন যাত্রা সুরু হয়। জনসমাজে ইহা দ্রুত প্রচার এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করতে থাকে। স্বাধীনতা আন্দোলনকে প্রচারের প্রধান বিষয় করিলেও ইহার বক্তব্য আর নিছক রাজনৈতিক ব্যাপারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই। অর্থনীতি, সমাজ-সংস্কার, সাহিত্য, কৃষি, শিল্প ও সংস্কৃতির সকল বিষয়ে উন্নতি ও পরিবর্তনের আবেদন লইয়া এই পত্রিকা জাতীয় জীবনকে সমগ্রভাবে সেবা করিবার উদ্যোগ আরম্ভ করে।'

সুরেশচন্দ্র মজুমদার[২৬] লিখিত প্রবন্ধ থেকে আরও কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হলো : '......আনন্দবাজার পত্রিকা বিদেশী শাসকের দমন নীতির প্রকোপে কিভাবে এবং কতবার নির্যাতন বরণের 'সৌভাগ্য' লাভ করিয়াছে, তাহার একটি কালানুক্রমিক ঘটনাবলী উদ্ধৃত করা যাইতে পারে :

১৯২৩—সম্পাদক শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার এবং মুদ্রাকর শ্রীঅধরচন্দ্র দাসের বিরুদ্ধে ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে মামলা। উভয়ে অভিযোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন।

১৯২৬—ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৫৩ (ক) ধারা অনুসারে পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা। অভিযোগ হইতে নিষ্কৃতি।

১৯২৯—১২৪ ধারা অনুসারে রাজদ্রোহের অভিযোগে পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা। সম্পাদকের প্রতি কারাদণ্ডের আদেশ এবং এক হাজার টাকা জরিমানা।

১৯৩০—পত্রিকার বিরুদ্ধে ১২৪ ধারা অনুসারে মামলা। সম্পাদকের প্রতি ছয় মাসের সশ্রম কারাবাসের আদেশ এবং এক হাজার টাকা জরিমানা।

পত্রিকার নিকট হইতে চার হাজার টাকার জমানত দাবী। প্রতিবাদে ৬ মাসকাল পত্রিকা বন্ধ রাখা হয়।

১৯৩১—রাজদ্রোহের অভিযোগে মামলা। সম্পাদকের প্রতি ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ।

১৯৩২—দুই হাজার টাকার জমানত দাবী।

১৯৩৩—এক হাজার টাকা জমানত গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক বাজেয়াপ্ত। নূতন করিয়া ৩ হাজার টাকা জমানত দাবী।

পুনরায় ২ হাজার টাকা জমানত গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক বাজেয়াপ্ত। নূতন করিয়া ৮ হাজার টাকা জমানত দাবী।

১৯৩৪—এক হাজার টাকা জমানত সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত। পত্রিকার নিকট হইতে নূতন করিয়া ১০ হাজার টাকা জমানত দাবী।

হাইকোর্টে আবেদন করা হয় এবং হাইকোর্টে এই নূতন জমানতের নির্দেশ নাকচ করেন।

১৯৩৬—২ হাজার টাকা জমানত গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক বাজেয়াপ্ত। নূতন করিয়া ২ হাজার টাকা জমানত দাবী।

১৯৩৮—ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা। সম্পাদকের প্রতি ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাবাসের আদেশ। আপীলে মুক্তিলাভ।

১৯৪০—'জাতীয় সপ্তাহ" সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশ সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের নিষেধমূলক নির্দেশ অমান্য করিবার অভিযোগে মামলা। গভর্ণমেণ্ট পত্রিকাকে "সাবধান" করিয়া অভিযোগ হইতে রেহাই দেন।

ভারতরক্ষা আইন অনুসারে পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা। গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক অভিযোগ প্রত্যাহার।

১৯৪১—গভর্ণমেণ্টের নির্দেশ অমান্য করিবার অভিযোগে মামলা। ২২শে মার্চ তারিখে গভর্ণমেণ্ট এই নির্দেশ জারী করিয়াছিলেন যে, স্পেশাল প্রেস এডভাইসারের দ্বারা, পূর্বে অনুমোদিত না করাইয়া সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ যেন প্রকাশিত না হয়। এই মামলায় সম্পাদকের ১৫০ টাকা এবং মুদ্রাকরের ৫০ টাকা জরিমানা হয়।

১৯৪৬—বঙ্গীয় বিশেষ ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স (৬) অনুসারে পত্রিকাব বিরুদ্ধে মামলা। সম্পাদকের প্রতি ২০০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ২ মাসের সশ্রম কারাবাস এবং মুদ্রাকরের প্রতি ৫০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ২ সপ্তাহের কারাবাসের আদেশ দেওয়া হয়।

১৯৪৭—পত্রিকার মুদ্রাকরের তরফে প্রদত্ত জমানত হইতে ২ হাজার টাকা সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত।

'আনন্দ প্রেসে'র যে প্রেস হইতে আনন্দবাজার পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তরফে প্রদত্ত জমানত হইতে ৩ হাজার টাকা সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত। আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রকাশকের নিকট অতিরিক্ত ৩ হাজার টাকা জমানত দাবী। আনন্দ প্রেসের নিকট হইতে অতিরিক্ত ৬ হাজার টাকা জমানত দাবী।

'চিত্রালী' ছিল মাসিক পত্রিকা। প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড, প্রকাশিত হয়েছিল—জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২ সালে। সম্পাদক: সুবোধ রায়। পরিচালক: ন্যাশনাল নিউজ পেপার্স লিমিটেড, ৯, রামময় রোড, কোলকাতা।

শরৎচন্দ্র বসু[২৭] সুবোধ রায়কে একটি পত্র লিখেছিলেন। সেই পত্র এই সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। পত্রটি হলো এই:

'স্নেহাস্পদেষু—

আপনার গত ২৬শে মার্চের পত্র পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত

হলুম। যাঁদের সঙ্গে অতীতে কাজ করেছি তাঁদের অন্তঃকরণে এখনও কিছু স্থান অধিকার করি—ইহা আমার পরম সৌভাগ্য।

'চিত্রালী'র সম্পাদনের ভার আপনার ওপর ন্যস্ত হয়েছে শুনে আপনাকে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনার ক্ষমতার ও উদ্যমের পরিচয় আমি পেয়েছি এবং সেই জন্যে আমি বিশ্বাস করি আপনার ওপর যে গুরুভার অর্পণ করা হয়েছে, সে ভার আপনি কৃতিত্বের সহিত সম্পাদন কোরবেন।

সাপ্তাহিকের ও মাসিকের নিজ নিজ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আপনি যা লিখেছেন. আমি অনুমোদন করি। 'আত্মশক্তি' ও 'নবশক্তি' এক সময়ে সাপ্তাহিকের আদর্শ ছিল; কিন্তু সে আদর্শ প্রায় লুপ্ত। সমসাময়িক ঘটনার আলোচনা আজকাল সাপ্তাহিকের প্রধান এবং সময় সময়, একমাত্র কারবার হয়ে দাঁড়িয়েছে; এবং তার ফলে আমাদের সমাজের আবহাওয়া অনেক সময় দূষিত হচ্ছে। তার প্রতিবিধান উচ্চ আদর্শে পরিচালিত মাসিকের দ্বারা হওয়া সম্ভব।

আশা করি 'চিত্রালী'র পাতায় পাতায় ভারত ধর্ম্ম. ভারত সভ্যতা, ভারত সাহিত্য ও ভারত মানব ও মানবী চরিত্রের আদর্শ ফুটে উঠবে। 'চিত্রালী' ভারতের অতীত গৌরবের ও ভবিষ্যৎ আশার চিত্রপট হোক এই কামনা সর্ব্বতোভাবে করি—শ্রীভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন!

ইতি শুভানুধ্যায়ী
শ্রীশরৎচন্দ্র বসু'

এই কাগজে ছাপা হতো, কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ভ্রমণ-কাহিনী, কাজী নজরুল ইসলামের গান ও স্বরলিপি, ছায়াছবির সংবাদ, ছবি সহ আলোচনা, বিজ্ঞানের আলোচনা তা' ছাড়া নামকরা শিল্পীদের আঁকা নানারঙের ছবি, পুস্তক সমালোচনা এবং আরও অনেক কিছু।

পুরুলিয়ার 'মুক্তি' পত্রিকা এবং নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত সম্বন্ধে আগে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে চিত্রালী[২৮] কাগজে প্রকাশিত নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত প্রসঙ্গে একটি লেখা উল্লেখ করা হলো ঃ

'নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত

প্রসিদ্ধ দেশকর্ম্মী শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। যে সকল সর্ব্বত্যাগী অক্লান্ত কর্ম্মী পুরুষ জন্মভূমির সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত তাঁহাদেরই অন্যতম। তাঁহার চরিত্র ছিল স্ফটিকের মত নির্ম্মল—হৃদয় ছিল সিংহের মত নির্ভীক, প্রকৃতি ছিল নিরীহ মেষশাবকের মত মৃদু। গান্ধীজীর আদর্শে তাঁহার বিশ্বাস ছিল অপরিসীম। সাধারণ নরনারীর জীবনের সহিত গভীরভাবে তিনি পরিচিত হইয়াছিলেন, আপন হৃদয়ের বিশাল অনুভূতি দিয়া তাহাদের মর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের একেবারে আপনার জন হইয়া

গিয়াছিলেন। দেশ সেবার পুরস্কার স্বরূপ কারাবাসও তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। পুরুলিয়া তাঁহার কর্ম্মস্থল ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে একজন অকৃত্রিম নীরব-কর্ম্মীর তিরোভাব ঘটিল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুন।'

'ভারতবর্ষ', মাসিক পত্রিকা, প্রকাশক ঃ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা। প্রথম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, ষোড়শ বর্ষ প্রকাশিত হয়েছিল ঃ ভাদ্র ১৩৩৫ সাল। এই সংখ্যায় ৫১১ পৃষ্ঠায় সাময়িকী কলমে ছাপা হয়েছিল 'সাইমন কমিশন' নিয়ে লেখা। ভারতবর্ষ[২৯] পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা হলো এই ঃ

'সাইমন কমিশনের সহিত সহযোগিতা করা হইবে না বলিয়া দেশময় যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার জের এখনও মিটে নাই; আগামী অক্টোবর মাসে যখন সাইমন-সপ্তক পুনরায় এদেশে আসিবেন, তখন আবার জোরে আন্দোলন আরম্ভ হইবে। এদিকে কিন্তু বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভা অধিকাংশ সদস্যের মতানুসারে সাইমন কমিশনের সহযোগিতা করিবার জন্য এক কমিটি গঠন করিয়া ফেলিবেন। এই কমিটির উদ্দেশ্য বাঙ্গালা দেশের পক্ষ হইতে শাসন বিষয়ে কি বক্তব্য প্রকাশ করা এবং কমিশনকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করা। বাঙ্গালার এই সাহায্যকারী সমিতিতে সাতজন সদস্য থাকিবেন। এই সাতজনের নামও গেজেটে ছাপা হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে একজন সাহেব, চারিজন মুসলমান এবং দুইজন হিন্দু। সাহেব মহাশয় ও মুসলমান চারিজনের মধ্যে কে কেমন লায়েক তাহা আমরা জানি না, হিন্দু দুইজনকেই, আমরা কেন বাঙ্গালা দেশের সকলেই জানেন ও চেনেন। তাঁহারা ময়মনসিংহের মহারাজা বাহাদুর ও নসীপুরের মহারাজা বাহাদুর।'

'বসুমতী' পত্রিকার কর্মকর্তারা একসময় জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী দেশ কর্মীদের নানাভাবে সাহায্য করতেন। বসুমতী কাগজে স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা লেখা হতো। এই কারণে দৈনিক বসুমতী, মাসিক বসুমতী কাগজের ওপর ইংরেজ সরকারের নজর ছিল। ১৯২০ সালে ইংরেজ সরকার বসুমতীকে সতর্ক করে দিয়েছিল।

মাসিক বসুমতী, ৭ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৩৫, পৃষ্ঠা ৩৪১, সাময়িক প্রসঙ্গে ছাপা হয়েছিল—'সাইমন কমিশন' নিয়ে লেখা। মাসিক বসুমতী[৩০] কাগজ থেকে কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো।

'সাইমন কমিশন

আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি যে, সাইমন কমিশন এদেশের যে কেন্দ্রেই পদার্পণ করিতেছেন, সেই কেন্দ্রে যেভাবে সাক্ষ্য গ্রহণ

করা হইতেছে, তাহাতে এক দিকে সাম্প্রদায়িকতার বিকটতা এবং অন্যদিকে আমলাতন্ত্র সরকারের ইজ্জৎ প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিবার চেষ্টাই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রদায়গত বৈষম্য ও দায়িত্ব উপভোগের অবসরহীনতা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ কিরূপে প্রকৃত দায়িত্বপূর্ণ শাসনাধিকার প্রাপ্ত হইতে পারে, সে বিষয়ে কমিশনের অনুসন্ধিৎসার পরিচয় আদৌ পাওয়া যাইতেছে না।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি। পাঞ্জাব সরকার একটি স্মারকলিপি সাইমন কমিশনের নিকট পেশ করিয়াছেন। শুনা যায়, এই রচনা রত্নটি স্যার ম্যালকম হেলি ও স্যার জিওফ্রে মণ্টমোরেন্সির সম্মিলিত পরিশ্রমের ফল। স্যার ম্যালকম এখন যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর এবং শেষোক্ত রাজপুরুষ পাঞ্জাবের গভর্ণর, কিন্তু স্মারকলিপি রচনাকালে স্যার ম্যালকম ছিলেন পাঞ্জাবের গভর্ণর এবং স্যার জিওফ্রে তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারী। স্যার ম্যালকম, স্যার মাইকেল ওডয়ারের মন্ত্রশিষ্য, এবং স্যার জিওফ্রে আবার তস্য শিষ্য, এমনই একটা কথা পাঞ্জাবে প্রচলিত। ইহা সত্য হউক বা না হউক, এ কথা কিন্তু সত্য যে, এই দুই জন রাজপুরুষ মাথা ঘামাইয়া যে চমৎকার স্মারকলিপি রচনা করিয়াছেন, তাহা কোন সংস্কারবিরোধী ঝুনা ব্যুরো-ক্রাটেরই যোগ্য বটে। তাঁহারা ঐ লিপির মারফতে সরকারের ইজ্জৎ রক্ষার জন্য যে আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা স্যার মাইকেল ওডয়ারের সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ।

অবশ্য স্মারকলিপিতে সংস্কার আইনের বিরুদ্ধে কিছু বলা হয় নাই, বরং নানা মিষ্ট কথায় উহার সমর্থনই করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ সঙ্গে উহার জন্য যে সকল "রক্ষা কবচ" প্রার্থনা করা হইয়াছে তাহা দেওয়া হইলে সংস্কার নামে সংস্কার থাকিবে বটে, কিন্তু সংস্কারের কায়ার পরিবর্ত্তে দেশের লোক ছায়াই প্রাপ্ত হইবে। .....'

'সাইমন কমিশন' প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়[৩১] লিখেছেন ঃ

'১৯২৭ সালের শেষভাগে জাতীয় আন্দোলন নূতন রূপ পরিগ্রহ করিতে চলিল। মদ্রাজের কন্‌গ্রেসে (ডিসেম্বর ১৯২৭) যুবক জবহরলাল নেহরু সভাপতি হইয়া পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন, উহা ডোমিনিয়ন স্টেটাস নহে। সর্ব সম্প্রদায়ের ভারতীয়দের পক্ষ হইতে পূর্ণ স্বরাজের দাবি—এ দাবির মধ্যে কোনো 'কিন্তু' 'খাদ' ছিল না।

ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সরকার ভারতের মধ্যে স্বাধীনতা লাভের জন্য বিচিত্র প্রকারের কর্মধারা দেখিয়া ভারতের সংবিধান পরিবর্তন করিবার উদ্দেশ্যে এক কমিশন গঠনের প্রস্তাব করিলেন। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, মণ্টফোর্ড সংবিধান প্রবর্তিত হইবার পর হইতে স্বৈরাজিক শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটাইবার জন্য কন্‌গ্রেস হইতে নানাবিধ বহু প্রকারের প্রস্তাব হইয়াছিল।

সেই সূত্রে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে স্যর জন সাইমনের নেতৃত্বে এক কমিশন বসাইবার কথা ঘোষণা করা হয় (৮ নভেম্বর ১৯২৭)। কিন্তু কমিশনের সদস্যদের মধ্যে একজনও ভারতীয়ের নাম দেখা গেল না। ভারতীয়দের নিজের দেশে শাসন ব্যবস্থা কি হইবে তাহা তদারক ও বিচার করিবার জন্য কমিটিতে ভারতীয় নাই! কিন্তু সরকারের পক্ষেও বলিবার কথা আছে: বহু দলে উপদলে বিভক্ত রাজনীতিকদের মধ্য হইতে সদস্য নির্বাচন এক জটিল সমস্যার বিষয়; কোন্ দলকে বাদ দিয়া কোন্ দলকে লইবেন—কোন্ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কতজন লোক লইতে হইবে—তাহা লইয়া নিশ্চয়ই একটা দারুণ কোলাহল সৃষ্ট হইত; যেমনটি হইয়াছিল ভারত স্বাধীনতা দানের অব্যবহিত পূর্বে কন্‌ষ্টিটিউয়েণ্ট এসেম্‌ব্লি গঠন করিবার সময়। আমাদের বোধহয়, সেই অচল অবস্থার সৃষ্টি যাহাতে না হয় তজ্জন্য বুদ্ধিমান ইংরেজ গভর্মেণ্ট একেবারে শ্বেতাঙ্গ সদস্য দ্বারা কমিশন গঠন করিলেন।

এই ব্যাপার লইয়া ভারতের সর্বত্র তীব্র বিক্ষোভ প্রকাশ পাইল। কন্‌গ্রেস প্রমুখ সকল দলই সাইমন কমিশন বর্জন করিবার পক্ষপাতী। কমিশন ১৯২৮ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী ভারতে আসেন ও প্রাথমিক অনুসন্ধান শেষ করিয়া মার্চ মাসের শেষে দেশে ফিরিয়া যান। দ্বিতীয়বার ভালো করিয়া তদন্ত করিবার জন্য আসিলেন। কমিশন দেশের নানা স্থানে ঘুরিয়া নানা দলের প্রতিনিধি, সাংবাদিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহিত কথাবার্তা করিয়া শাসন-সংস্কার বিষয়ে মতামত সংগ্রহ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা যেখানে যান সর্বত্র হরতাল ও বিক্ষোভ। লাহোরের বিক্ষোভকারীদের নেতৃত্ব করেন হিন্দুমহাসভার অন্যতম নেতা মদনমোহন মালবীয় ও আর্যসমাজের বিশিষ্ট নেতা লালা লাজপৎ রায়। বিক্ষোভকারী জনতার উপর লাঠি চার্জ হয়—লালাজি গুরুতররূপে আহত হন; ইহার কয়েকদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হয়—লোকে মনে করে, আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় তাঁহার মৃত্যু ত্বরান্বিত হইয়াছিল। লাজপত রায়ের উপর লাঠি চালনা করেন লাহোরের সহকারী পুলিশ সুপার মিঃ স্যানডার্স; পাঞ্জাবী বিপ্লবী দলের ভগৎ সিংহের গুলিতে স্যানডার্স নিহত হন।'

সাইমন কমিশনের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল আনন্দবাজার পত্রিকায়[৩২]। সংবাদটি হলো এই:

'ঐ এলো—ঐ এলো

কমিশন কলিকাতায় শহরবাসী দেশের মর্য্যাদা রাখ

রয়াল কমিশনের সদস্যগণ অদ্য সোমবার ভোর ৬-২১ মিনিটের সময় স্পেশাল ট্রেনে হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিবেন। কমিশনী কর্ত্তারা অত সকালেই গাড়ী হইতে নামিবেন না, গাড়ী হইতে নামিতে তাঁহাদের হয়ত ঘণ্টাখানেক

দেরী হইবে। বলা বাহুল্য এতদুপলক্ষে হাওড়া ষ্টেশনটি লাল পাগড়ীর আখড়ায় পরিণত হইবে এবং পুলিশ রণসাজে সজ্জিত থাকিবে।'

সাইমন কমিশনের আর একটি সংবাদ আনন্দবাজার পত্রিকায়[৩৩] প্রকাশিত হয়েছিল। সংবাদটি হলো এই ঃ

'বেনারসে সাইমন কমিশন সহরের দোকান পাট বন্ধ
সাধারণের বিপুল আন্দোলন

বেনারস, ১৯শে ফেব্রুয়ারী অদ্য অপরাহ্নকালে সাইমন কমিশন এখানে পৌঁছল। রেল স্টেশন এবং সহরের অন্যান্য যে সব অঞ্চলের ভিতর দিয়া কমিশনের সদস্যগণ গমন করিয়াছিলেন, সেই সব স্থানে জনসাধারণের বিপুল আন্দোলন হয়। আন্দোলনকারীরা "সাইমন ফিরিয়া যাও", "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের পতন হউক", 'আমাদের শাসনতন্ত্র নির্ধারণে বিদেশীর কোন ক্ষমতা নাই", "পূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদের আদর্শ।" এই সব কথা যুক্ত পোস্টার লইয়া মিছিল করিয়াছিল। তাহারা ঐসব কথা বলিয়া চীৎকারও করিতেছিল।

কমিশনের সদস্যগণ লেভেল ক্রসিংয়ে অবতরণ করেন, ঐ স্থানটি স্টেশন হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে। কমিশন যখন চক দেখিতে গমন করেন তখন তথাকার সব দোকানপাট বন্ধ ছিল। এই আন্দোলনে সহরে বহু সংখ্যক অধিবাসী কংগ্রেসকর্মী এবং হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যোগদান করিয়াছিল। কমিশন যে রাস্তা দিয়া গমন করেন, সেই রাস্তার মোড়ে মোড়ে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হইয়াছিল।'

প্রবর্ত্তক—সচিত্র মাসিক পত্রিকা। ২য় বর্ষ, (নবপর্য্যায়) ১৩৩৩ সাল। সম্পাদক ঃ মতিলাল রায়। প্রকাশক ঃ প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ২৯নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা।

প্রবর্ত্তক[৩৪] পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল 'রাজবন্দীর কথা'। ওই লেখাটি হলো এই ঃ

বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হওয়ার জন্য, সব শ্রেণীর রাষ্ট্রবিদের মুখেই বিনা বিচারে দণ্ডিত বাংলার তরুণ কর্ম্মীদের মুক্তির দাবী শুনা গিয়াছিল, বাংলার স্বরাজ্য দলের সভ্যসংখ্যা ব্যবস্থাপক সভার অপরাপর দলের অপেক্ষা অধিক হইলেও, যে ভাবে নূতন শাসননীতি পরিচালনের ব্যবস্থা, তাহাতে ব্যবস্থাপক সভায়, তাঁহাদের কর্তৃত্ব সম্ভব নহে, দেশবন্ধু তাঁর অমানুষিক প্রচেষ্টায় দ্বৈত শাসন ব্যর্থ করিয়া দেশের মর্ম্ম নিবেদন রাজপ্রতিনিধিগণের নিকট জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা নিষ্ফল হইয়াছে, এই অজুহাতে যাঁহারা এইবার দ্বৈত শাসন রক্ষা করিলেন, তাঁহাদের এক্ষণে কর্ত্তব্য—বাংলার কর্মক্ষেত্র হইতে প্রকাশ্য বিচার না করিয়া যাঁহাদের বন্দী করা হইয়াছে তাঁহাদের মুক্তির ব্যবস্থা করা, এবং বিপ্লবের নামে, এইরূপে

বাংলার তরুণ কর্ম্মী অকস্মাৎ অকারণ যাহাতে বন্দী না হয়, তাহার দিকেও লক্ষ্য রাখা। বাঙ্গালী ধ্বংসের পথ হইতে জীবনের পথে, নির্ম্মাণের পথে মুখ ফিরাইয়াছে। জাতিকে রক্ষা করার জন্য, বাংলার প্রাণে নূতন প্রেরণার সঞ্চার হইয়াছে, "রেগুলেশন তিন" নামক আইনের চাপে এই বিশুদ্ধ প্রেরণা যদি যথারীতি স্ফুর্ত্ত হইতে না পায়, বড় মর্ম্মঘাতী বেদনা লইয়া বাঙ্গালীকে গুমরিয়া মরিতে হইবে—ইহা যে ঘোরতর অস্বাস্থ্য সৃজন করিয়া জাতিকে নানারূপে বিকৃত করিতে পারে, তাহা বলাই বাহুল্য—প্রবীণ মন্ত্রীবর্গ দেশের ও জাতির মুখ চাহিয়া, তাঁহাদের কার্য্যকালে, এই দিকে এক মুহূর্ত্ত যে উদাসীন রহিবেন না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস, আশা করি, দেশের প্রধান প্রতিনিধির পক্ষ হইতে, ইঁহারা স্বতন্ত্র হইলেও, দেশের এ আশা দুরাশায় পরিণত হইবে না।'

'বঙ্গশ্রী' ছিল মাসিক পত্র। সম্পাদকীয় লিখতেন : সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য। এই কাগজের ভাদ্র ১৩৪৭ সালের সংখ্যায়—'ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির ইতিহাস (৩)' লিখেছিলেন : হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। 'বঙ্গশ্রী' কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতো। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, কার্টুন ও ছবি বঙ্গশ্রীতে ছাপা হতো।

'গৌড়দূত' (সাপ্তাহিক পত্রিকা), ৩৪শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, প্রকাশিত হয়েছিল ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২, ইং ১৭ই মে, ১৯৪৫ মূল্য দুই আনা। প্রধান সম্পাদক—লালবিহারী মজুমদার, সম্পাদক—রমাপ্রসাদ মজুমদার। প্রকাশিত হতো : গৌড়দূত প্রেস, জুবিলী রোড, মালদা।

মালদা ইংরেজবাজারে—জুবিলী রোডে গিয়ে 'গৌড়দূতে' কাগজের আগেকার সংখ্যা দেখেছিলাম। এই কাগজে বড় করে 'জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা' লিখলেও কোন রকম ইংরেজ বিরোধী লেখা চোখে পড়েনি। স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন করে কোন লেখা যে প্রকাশিত হয়েছিল তা' বর্তমান সম্পাদক দেখাতে পারেন নি। এই কাগজে ছাপা হতো জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা। তা' ছাড়া ইংরেজ রাজপরিবারের ছবিও বিভিন্ন সময়ে বড় করে প্রকাশিত হয়েছিল।

ডক্টর চারুচন্দ্র স্যান্যাল[৩৫] লিখেছেন জলপাইগুড়ি সহরের একশো বছর। এই নিবন্ধে জলপাইগুড়ির পত্র-পত্রিকার কথা উল্লেখ আছে। ডক্টর সান্যাল লিখেছেন :

'১৯০০ সনে "ত্রিস্রোতা" নামে এক মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। পত্রিকা হচ্ছে, শিক্ষিত সমাজের একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তু। তখন একমাত্র ছাপাখানা "জলপাইগুড়ি প্রেস" স্থাপিত হয়েছিল ১৮৯৫ সনে। "ত্রিস্রোতা" এখানে ছাপা হয়। সম্পাদক [illegible] চৌধুরী। তিনি [illegible] ১৯২৩ সনের

পর থেকে সহরে অনেক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, অনেকের অকাল মৃত্যুও ঘটেছে।'

ডক্টর চারুচন্দ্র সান্যাল[৩৬] লিখেছেন: জলপাইগুড়ি থেকে প্রকাশিত হতো "জনমত"। সম্পাদক: জ্যোতিশ্চন্দ্র সান্যাল।

১৪ই জানুয়ারী ১৯২৪ সালের সংখ্যায় দাম লেখা ছিল: দুই পয়সা। কাগজে প্রথমে লেখা থাকতো: "মানুষ আমরা নহিত মেষ।" জলপাইগুড়ির "ত্রিস্রোতা" ছিল সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। ২য় বর্ষ ১০ই এপ্রিল ১৯২৫, ২১শ সংখ্যায় সম্পাদকের নাম: সুরেশচন্দ্র পাল। এই কাগজে প্রথমে উল্লেখ আছে: স্বর্গীয় শশিকুমার নিয়োগী প্রতিষ্ঠিত।

মুক্তিবাণী', জলপাইগুড়ি থেকে প্রকাশিত হতো। ইহা ছিল সাপ্তাহিক কাগজ। মূল্য প্রতি সংখ্যা, দুই পয়সা। সম্পাদক: খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল—২০শে ডিসেম্বর ১৯২৮ সালে।

'স্বাধীনতা', কমিউনিস্ট পার্টির দৈনিক পত্রিকা। সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি—সোমনাথ লাহিড়ী। ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, প্রকাশিত হয়েছিল—১৩ই পৌষ শুক্রবার ১৩৫২, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৪৫, ৪ পৃষ্ঠা কাগজের দাম—দুই পয়সা। রমণীমোহন সরকার কর্তৃক কলকাতার ২৩ নং ডিক্সন লেনের মণ্ডল প্রেসে মুদ্রিত, এবং ১২১ লোয়ার সার্কুলার রোড হইতে প্রকাশিত ও সম্পাদিত হতো। 'স্বাধীনতা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকে বেশ কয়েক বছর যাবত কমিউনিস্ট কর্মীরা এই কাগজ নিজেরা বিক্রি করতেন। কলকাতার পথে যেমন 'স্বাধীনতা' বিক্রি করতে দেখা যেত, ঠিক তেমনি গোটা বাংলাদেশে বিভিন্ন রেল-স্টেশনে, স্টীমার ঘাটে, হাটে-বাজারে কমিউনিস্ট কর্মীরা 'স্বাধীনতা' কাগজ সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরতেন।

স্বাধীনতা[৩৭] পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় এখানে উল্লেখ করা হলো।

'তমলুকের কৃষককে বাঁচান

সমগ্র দেশবাসীর দৃষ্টি আজ তমলুক তথা মেদিনীপুরের উপর। ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ নেতা মহাত্মা গান্ধী এখন তমলুক মহকুমার মহিষাদলে সশরীরে উপস্থিত। অল্প কিছুদিন আগেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকের বিবৃতিতে এই তমলুকবাসীর উপর আমলাতন্ত্রের আক্রমণের জঘন্য কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে। জাতীয় আন্দোলনের জ্বলন্ত মশাল হাতে এই তমলুকের মানুষ অমানুষিক অত্যাচারের মুখোমুখী দাঁড়াইয়াছে। গুলির চোটে মারা গিয়াছে ৪১ জন মেয়ে-পুরুষ, ৭৩ জন স্ত্রীলোক ধর্ষিতা হইয়াছেন, বাড়ী এবং গ্রামও জ্বালিয়াছে অনেক [illegible]। [illegible], গ্রেপ্তার ও জেল তো কতই হইয়াছে। [illegible]।

প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক এবং অন্যান্য অনেকের রিপোর্ট হইতেছে দেশবাসী সকলেরই জানিবার ইচ্ছা হয়,—বীরত্ব ও আত্মত্যাগের গরিমায় উজ্জ্বল এই তমলুকের মানুষেরা আজ কি করিতেছে, কি ভাবিতেছে, কি তাহাদের দুঃখ কষ্ট, কিই বা তাহাদের দাবী? দমননীতির দারুণ আঘাত এবং ঝড় প্লাবনের ক্ষতি কাটাইয়া যাহারা বাঁচিয়া রহিল, তাহারা কি করিতেছে? তাহারা কি চায়? সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চরম আঘাত হানিবার জন্য তাহারা আজ কিভাবে প্রস্তুত হইতেছে? কংগ্রেস সম্পাদকের রিপোর্টে বা দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত অন্যান্য রিপোর্টে তমলুকের এই জীবন্ত মানুষের কোন সন্ধান মেলে না।

সমস্ত তমলুক মহকুমাকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগ হইতেছে নন্দীগ্রাম থানা, সুতাহাটা থানা এবং মহিষাদলের কিছু অংশ নিয়া। ইহাকে নাম দেওয়া যায় জোতদার অঞ্চল। এখানে শতকরা ৭০ জন কৃষক ভূমিহীন হইয়া গিয়াছে। সব জমি গিয়াছে জোতদারদের মুষ্কিতে। দ্বিতীয় অঞ্চল হইতেছে তমলুক ও পাঁশকুড়া থানা নিয়া। ইহার নাম দেওয়া যায় জমিদারী অঞ্চল। এখানে জমিদারদের সঙ্গে সরাসরি কৃষকদের যোগাযোগ। এইখানে স্থানীয় ছোট ছোট অনেক জমিদার ছাড়াও আছে শীলবাবু, দালালবাবু ও লাহাবাবুর জমিদারী।

জোতদার অঞ্চলে ১৯৪০ সালের মাঝামাঝি ভাগচাষী আন্দোলন আরম্ভ হয়। আগে ফসলের দুভাগ পাইত জোতদার এবং মাত্র ১ ভাগ চাষী পাইত। তাহা ছাড়া "খামার ছিলানী", "গুণধারাণী" প্রভৃতি বে-আইনী আদায়ও চলিত। কৃষক আন্দোলনের ফলে ফসলের ভাগ আধা-আধি হয় এবং অন্যায় জুলুমও বন্ধ হয়।

জমিদারী অঞ্চলেও বাকী খাজনার দায়ে জমি ক্রমেই কৃষকের হাতছাড়া হইতেছিল। ১৯৪০ সালেই আন্দোলন সুরু হয়—বাকী বকেয়া খাজনা মকুব চাই। কোথাও কোথাও দাবী হয় যে খাজনা কয়েক কিস্তীতে দিবার ব্যবস্থা করা হউক। সঙ্গে সঙ্গে দাবী উঠে যে, গ্রামের রাস্তাঘাট, জমিদারী সীমানার বাঁধ, জমিদারের এলাকার খাল—এই সবই জমিদারকে ঠিকভাবে রাখিবার দায়িত্ব নিতে হইবে। বাঁধ ও খালের অব্যবস্থার জন্য বছর বছর এই অঞ্চলের অনেক জায়গা বন্যায় ভাসিয়া যায়, শস্য নষ্ট হয়। ঘরবাড়ী ভাসিয়া পড়ে। পথঘাট নষ্ট হইয়া যায়। এক কথায় কৃষি ব্যবস্থাই বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। জমিদারের সঙ্গে লড়াইয়ে অনেক জায়গাতেই কৃষকেরা সাময়িকভাবে জিতিয়াছে, কিন্তু ঠিকমত মীমাংসা হইয়া উঠে নাই।

দমন-নীতির চোট এবং প্লাবনের প্রকোপ গেল ১৯৪২ সালে, ১৯৪৩ সাল নিয়া আসিল দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যু, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আসিল মহামারী। সংগঠিত কৃষক আন্দোলনের জোরেই তমলুকের মানুষ আবার উঠিয়া

দাঁড়াইয়াছে। জমিদার ও সরকার যাহা করে নাই, করিতে পারে নাই, মেদিনীপুরের কৃষক সমিতি তাহা করিয়াছে। তমলুক থানার এক নম্বর ইউনিয়নে ৫০ জন কৃষক ভলেণ্টিয়ার ১৫ দিন মেহনৎ করিয়া ৬০০ ফুট লম্বা এবং সাড়ে চারি ফুট উঁচু বাঁধ বাঁধিয়া ৭০০ বিঘা জমির ধান বন্যার জল হইতে রক্ষা করিয়াছে। এই ইউনিয়নেই কৃষক সমিতির কর্মীরা মির্জাপুর খালের এক মাইল সংস্কার করিয়া ২০০ বিঘা জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করিয়াছে। এই কাজের জন্য কৃষকেরা ৩০০০ টাকা তুলিয়া দিয়াছিল। মহিষাদল থানার ১১নং ইউনিয়নে লাক্ষাখাল বাঁধিয়া বাইশ হাজার বিঘা জমিকে লোণা জল হইতে বাঁচান হইয়াছে। মহকুমার প্রত্যেক থানাতেই কৃষক সমিতিকে আশ্রয় করিয়া কৃষকগণ মুহ্যমান অবস্থা কাটাইয়া উঠিয়াছে। কৃষক সমিতিরই প্রেরণায় জেলে ও তাঁতিরা জাগিয়া উঠিয়াছে। তমলুক মহকুমায় ১৯৪৫ সালে তাঁতিদের ৪৬টি সমবায় সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছে, হাজার হাজার তাঁতির সংঘবদ্ধ আন্দোলনের আঘাতে আমলাদের দুর্নীতি ও চোরা কারবার ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

দেশপ্রেমের দুর্গ তমলুকে আবার নূতন বিপদ ঘনাইয়া উঠিয়াছে। এবার ধান যাহা হইয়াছে, তাহা স্বাভাবিক ফলনের অর্দ্ধেক মাত্র। ভাগচাষী আবার নিজের ঘরে এই অর্দ্ধেক ফলনেরও অর্দ্ধেক মাত্র রাখিতে পারিবে। জমিদারী অঞ্চলে চাষীর বাকী খাজনা আছে। হাল সনের খাজনা আছে, তাহার উপর সরকারী ঋণ শোধের দায় আছে। জোতদারী অঞ্চলে এক তো আধা বখরা, তাহার উপর সরকারী ঋণ শোধ জোতদারদের বাড়ের ধান শোধ, মহাজনের দেনা শোধ, এসব আছেই। মহিষাদল—নন্দী গ্রাম অঞ্চলে ফসল কাটিবার সঙ্গে সঙ্গেই অভাবের তাড়নায় চাষী ধান বিক্রী শুরু করিয়াছে। তমলুকের সামনে দারুণ দুর্ব্বৎসর।

সংগঠিত কৃষক আন্দোলন তমলুকের কৃষকগণকে বাঁচিবার একমাত্র পথে চলিবার জন্য আহ্বান করিতেছে। ১৯৪৩ সাল হইতে আজ পর্য্যন্ত বাকী বকেয়া খাজনা, দেনা, সরকারী ঋণ, জোতদারের বাড়, সমস্ত কিছুর আদায় স্থগিত রাখিতে হইবে। নূতন বছরে সরকার কর্ত্তৃক ব্যাপকভাবে ঋণদানের ব্যবস্থা চাই। কোনও রকম বাকী পাওনা আদায়ের জন্য এই দুর্ব্বৎসরে চাষীর ঘর হইতে ধান নেওয়া চলিবে না। তমলুকে মানুষের উপর একটার পর একটা চোট আসিয়াছে,—দমননীতি, প্লাবন, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বস্ত্রসংকট এবং হাল সনের ঘাটতি ফসল। সংগঠিত কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যদি কংগ্রেস হাত মিলান, তাহা হইলে তমলুক বাঁচিবে। তমলুকের জোতদার এবং জমিদারেরা কংগ্রেসেরই সমর্থক এবং অনেকেই কংগ্রেসের স্থানীয় নেতা। কংগ্রেস আহবান করিলে তাঁহারা হাল সনে আদায় নিশ্চয়ই স্থগিত রাখিবেন। ইহাই হইবে সাম্রাজ্যবাদের দমননীতির সত্যকার জবাব। সাম্রাজ্যবাদ

তমলুকের মানুষের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিতে চাহিয়াছিল। সেই তমলুক আবার উঠিবে, সংঘবদ্ধভাবে আবার চরম আঘাত হানিবার জন্য প্রস্তুত হইবে। মহাত্মা গান্ধী বর্ত্তমান তমলুক ভ্রমণের সময় নিশ্চয়ই তিনি কংগ্রেস-সমর্থক জোতদার এবং জমিদারদের এই দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিবেন।

—পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী।'

স্বাধীনতা[৩৮] পত্রিকায় প্রকাশিত আর একটি লেখা এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

'স্বাধীনতার প্রতি অভিনন্দন

খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় "স্বাধীনতা'কে অভিনন্দন করিয়া নিম্নোক্ত বাণী পাঠাইয়াছেন ঃ

যাহারা বংশানুক্রমে পরের সেবা করিয়া পরাধীন হইয়া আসে, ভারতের সেই অগণিত জনগণের কল্যাণকেই যদি ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে তো গণ-আন্দোলন একদিন সার্থক হইবেই এই আমার বিশ্বাস। তাহাদের দেহে, মনে ও বাক্যে স্বাধীনতা আনিয়া দেওয়াই হোক স্বাধীনতার মূল মন্ত্র।'

স্বাধীনতা[৩৯] পত্রিকায় প্রকাশিত 'স্বাধীনতা দিবস' উপলক্ষে সম্পাদকীয় লেখায় বলা হয়েছিল

'স্বাধীনতা দিবস

আজ স্বাধীনতা দিবস। ভারতবর্ষের মানুষ আজ সহরে গ্রামে স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণ করিবে ; স্বাধীনতার নামে নিজেদের নূতন করিয়া উৎসর্গ করিবে।

স্বাধীনতার পিপাসা আজ দেশের সকল মানুষকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। এ পিপাসা নূতন নয়, সাময়িকও নয়। একশো বছর ধরিয়া এই আকাঙ্ক্ষা আমাদের মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়াছে। তাই লক্ষে লক্ষে আজ দেশের নরনারী সম্বর্দ্ধনা জানাইতেছে স্বাধীনতার সৈনিকদের স্বাধীনতার সংগ্রামশীল পথকে, বিদ্রোহী আদর্শকে।

স্বাধীনতাই আজ দেশের মানুষকে পাগল করিয়াছে, তাহারা স্বাধীনতার কোনো একটি সংকীর্ণ দলগত আদর্শ বা বিশিষ্ট পদ্ধতিকে একান্ত বলিয়া মানে নাই, মানেও না। এই কথা, তাহারা জানে, এই স্বাধীনতার আদর্শ জন্ম লইয়াছিল কংগ্রেসের বাহিরে, ফুটিয়া উঠিয়াছে কংগ্রেসের মধ্যে ; আবার ছড়াইয়া পড়িয়াছে কংগ্রেসের সীমা ছাড়াইয়া দেশের সকল মানুষের বুকে। ইহার স্বপ্নে তাই উন্মাদ হইয়া বলি গিয়াছে মধ্যবিত্ত তরুণ-তরুণী, ইহার আহ্বানে তাই ছুটিয়া পথে বাহির হইয়াছে দূর গ্রামের কৃষক, দূরান্তরের জাতি-উপজাতির সকল মানুষ, আর [illegible]

মানুষ। স্বাধীনতার সংগ্রামে মিশাইতে আসিয়াছে তাহাদের রক্ত, মিশাইতে আসিয়াছে তাহাদের পতাকা। কোনো দল, কোনো সংগঠনের ভেদ-রেখা টানিয়া আজ যাহারা স্বাধীনতার এই অসংখ্য সৈনিককে বিভক্ত করিবে তাহারা স্বাধীনতার সংগ্রাম বিনষ্ট করিবে, স্বাধীনতার সংকল্প করিবে অস্বীকার। অথচ উনিশশো ছ'চল্লিশের ছাব্বিশে জানুয়ারী আজ এক মহামুহূর্ত ইতিহাসের, কে না জানে. দেশ বিদেশে আজ সাম্রাজ্যবাদের আসন টলটলায়মান। সমস্ত মুক্তিকামী মানুষ আমাদের ৪০ কোটি মানুষের মুক্তি প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব, মহাযুদ্ধের বিপ্লবী সম্ভাবনা মুক্তির ডাক লইয়া সকল দেশের দুয়ারে হাঁকিয়া যাইতেছে। ইতিহাসের এই আহ্বানকে এই মুহূর্তে গ্রহণ করিতে পারিলে পরাধীন ভারতে আমাদের স্বাধীনতার সংকল্প আর কোনদিন গ্রহণ করিতে হইবে না—স্বাধীন ভারতে আমরা সূচিত করিতে পারিব আমাদের স্বাধীন জীবন।

অথচ জানি না, না-জানিয়া আজ সে মহৎ সম্ভাবনাকেও আমরা অস্বীকার করিয়া ফেলিতে পারি। স্বাধীনতার এতদিনকার যুদ্ধ আজ নিমেষের ভুলে ভ্রাতৃদ্বন্দ্বেও পরিণত হইতে পারে। কলিকাতায়, চট্টগ্রামে যে শুভ সূচনা দেখা গিয়াছে—কলিকাতায়, বোম্বাইতে ও বহু বহু স্থলে আবার তাহারই বিস্মৃতি ও বিকৃতি দেখা দিয়াছে—স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্রও আজ গোপনে, প্রকাশ্যে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এই আত্মঘাতের প্ররোচনাকে আজ এই দিবসে অস্বীকার করিতে হইবে দেশবাসীর এই গৃহযুদ্ধের ষড়যন্ত্রকে ঠেকাইতে হইবে জনগণের—না হইলে উনিশশো ছ'চল্লিশ শুধু পরাধীন ভারতের আত্মঘাত ও রক্তপায়ী দেখিবে—স্বাধীনতার সৈনিকেরা হইবে বিধ্বস্ত, স্বাধীনতার সংকল্প হইবে ব্যর্থ, জাতি হইবে প্রবঞ্চিত।'

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, 'স্বাধীনতা'র এই সংখ্যায় উল্লেখ ছিল: 'সম্পাদক: রমণীমোহন সরকার কর্তৃক কলিকাতা ২৩ নং ডিক্সন লেনের "মণ্ডল 'প্রেসে" মুদ্রিত এবং ১২১এ লোয়ার সার্কুলার রোড হইতে প্রকাশিত।'

১৯৪৬ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতো দৈনিক 'প্রত্যহ' এবং দৈনিক 'কৃষক' পত্রিকা। এই দুটি পত্রিকার সাংবাদিকরা স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য লেখনী ধরেছিলেন। ১৯৪৬ সালে দাঙ্গার সময় দাঙ্গাবিরোধী লেখা এবং স্বাধীনতার আন্দোলনের কথা প্রকাশিত হতো 'স্বরাজ' এবং 'ভারত' পত্রিকায়। এই দুটি কাগজ দৈনিক সংবাদপত্ররূপে প্রকাশিত হতো।

প্রাসঙ্গিক সংযোজনী :

আগে (৯৯ পৃষ্ঠায়) বিধুভূষণ বসু লিখিত 'প্রতিকার' নামক একটি রাজনৈতিক গল্পের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা দরকার, ইং ১৯৩১ সালে কলকাতায় ১৩৭ নং বহুবাজার স্ট্রীট (বর্তমানে যেখানে কোলেবাজার) ওই স্থানে 'স্বদেশী মেলা' হয়েছিল। স্বদেশী মেলার' সম্পাদক ছিলেন—জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী। সভাপতি—নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, কোষাধ্যক্ষ—ইন্দুভূষণ বিদ। ওই মেলায় অনেক হেটো বই—হেটো ছড়া বিক্রি হত। হেটো কবিরা স্বদেশী গান গেয়ে বই বিক্রি করতেন। অধিকাংশ চটি বইয়ের দাম ছিল এক পয়সা থেকে এক আনা। হেটো কবিরা বিধুভূষণ বসু লিখিত গল্প 'প্রতিকার' চটি বই আকারে ছাপিয়ে বিক্রি করতেন। বইতে লেখকের নাম থাকলেও প্রকাশক এবং ছাপাখানার নাম-ঠিকানা ছিল না। স্বদেশী মেলায় ওই বই বহু বিক্রি হয়েছিল। আর একটি চটি বই 'স্বদেশী মেলায়' বিক্রি হত। বইটির নাম : 'তরুণ শহীদ দীনেশ গুপ্তের পত্রাবলী'.—লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী. পল্লীচিত্র মেশিন প্রেস, বাগেরহাট, এই বইটি ইং ১৯৩১ সালে ইংরেজ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ পুস্তিকারূপে চিহ্নিত হয়েছিল। 'হেটো বই' প্রসঙ্গে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কৌতূহলী পাঠক আমার হেটো বই—হেটো ছড়া' দেখতে পারেন। আর একটি কথা আবার উল্লেখ করা দরকার 'পল্লীচিত্র মেশিন প্রেস' ছিল বিধুভূষণ বসু প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানা একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলা ১৩৭৬ সালে একটি পুস্তিকা গণশক্তি প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, কালকাতা-১৬ থেকে ছাপা হয়েছিল। ওই পুস্তিকার মলাটে উল্লেখ ছিল ইং ১৯০৯ সালে যে গল্প লিখে শ্রীবিধুভূষণ বসুকে কারাবরণ করতে হয়, এবার তাঁর জন্ম দিবসে সেই "শিকার" গল্প পুনর্মুদ্রিত করে তাঁকে আমাদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছি···।' উক্ত পুস্তিকায় লেখকের আত্মজীবনী (১৭ পৃষ্ঠায়) ছাপা হয়েছিল। কিছু অংশ হল এই : 'রাজনীতি সামলিয়ে চলতে পারিনি। "পল্লীচিত্র" পত্রিকায় "শিকার" গল্প লিখে ১৯০৯ সালে ডিসেম্বর মাসে গ্রেপ্তার হই।···'

গল্পটি 'প্রতিকার' না 'শিকার', কোনটা ঠিক ? লেখক তখন জীবিত। ওই সময় আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭শে মে, ১৯৬৮ তারিখে বিধুভূষণ বসুর সম্বর্ধনা সভার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। সংবাদটি এই : '···কথায় কথায় আবার সেই স্বদেশী যুগ এসে গেল। শ্রীবসু বললেন : "বঙ্গবাসীর সোনার স্বপনে" লিখেছিলাম "ফুলার আর কি দেখাও ভয়, দেহ তো মোর অধীন বটে মন তো স্বাধীন রয়।" "পল্লীচিত্র" কাগজে "প্রতিকার" গল্প

লেখার জন্য রাজদ্রোহের অভিযোগে তাঁর চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।…'

—বী. ব

প্রসঙ্গপঞ্জী

১। ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম (অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস), প্রথম খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, ১৯৪৯, পৃষ্ঠা ২।

২। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ভারত কোন পথে? ১৯৩৬, পৃষ্ঠা ৫১।

৩। James Campbell Ker, Political Trouble in India 1907-1917, Page, 368.

৪। পল্লীচিত্র, মাসিক পত্র, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩১৮, পৃষ্ঠা ২।

৫। পল্লীচিত্র, সাপ্তাহিক পত্র, ২য় সংখ্যা, ১৩ই বৈশাখ ১৩৩৬, পৃষ্ঠা ৮।

৬। বিধুভূষণ বসু, আত্মজীবনী, শ্রীবিধুভূষণ বসু পঞ্চনবতিতম জন্ম দিবস ১৩৭৬ উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকা, ছাপা হয়েছিল গণশক্তি প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, কলিকাতা-১৬ থেকে।

৭। বিধুভূষণ বসু, আত্মজীবনী, পূর্বে উল্লিখিত বই।

৮। মনোরঞ্জন গুপ্ত, আমার সংক্ষিপ্ত জীবন কথা।

৯। মনোরঞ্জন গুপ্ত, আমার সংক্ষিপ্ত জীবন কথা।

১০। ছাত্রদল, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০।

১১। ছাত্রদল, ৩য় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৪০।

১২। মার্ক্সপন্থী, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৪০।

১৩। গণশক্তি, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪১ সাল।

১৪। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গণবাণী, প্রথম সংখ্যা, ১৭ই শ্রাবণ ১৩৪১ সাল।

১৫। অমর চক্রবর্তী, ভবানীপুরের প্রার্থী সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৬। অমর চক্রবর্তী, পূর্বে উল্লিখিত পুস্তিকা।

১৭। সাহিত্যিকা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৪২ সাল।

১৮। বাঙ্গালার কথা, প্রথম ভাগ, প্রথম সংখ্যা, ১৪ই আশ্বিন ১৩২৮, ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯২১।

১৯। চিত্তরঞ্জন দাশ, বাঙ্গলার কথা, প্রথম ভাগ, ৩য় সংখ্যা, ৪ঠা কার্তিক ১৩২৮, ২১শে অক্টোবর ১৯২১।

২০। কাজী নজরুল ইসলাম, বাঙ্গলার কথা, প্রথম ভাগ, ৯ম সংখ্যা, ১৬ই অগ্রহায়ণ ১৩২৮, ২রা ডিসেম্বর ১৯২১।

২১। সংহতি, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩১।

২২। সওগাত, ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩২৫।
২৩। সুরেশচন্দ্র মজুমদার, জাতীয় জীবনে আনন্দবাজার পত্রিকা, আনন্দবাজার পত্রিকা কংগ্রেস সংখ্যা, পৌষ ১৩৫৫।
২৪। সুরেশচন্দ্র মজুমদার পূর্বে উল্লিখিত প্রবন্ধ।
২৫। সুরেশচন্দ্র মজুমদার, পূর্বে উল্লিখিত প্রবন্ধ।
২৬। সুরেশচন্দ্র মজুমদার, পূর্বে উল্লিখিত প্রবন্ধ।
২৭। শরৎচন্দ্র বসু, চিত্রালী, প্রথম বর্ষ প্রথম খণ্ড জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২।
২৮। চিত্রালী ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা শ্রাবণ ১৩৪২।
২৯। ভারতবর্ষ প্রথম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, ষোড়শ বর্ষ ভাদ্র ১৩৩৫।
৩০। মাসিক বসুমতী, ৭ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৩৫।
৩১। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ভারতে জাতীয় আন্দোলন, তৃতীয় সংস্করণ পৃষ্ঠা ১৮৮।
৩২। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৮।
৩৩। আনন্দবাজার পত্রিকা ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৮।
৩৪। প্রবর্ত্তক, মাঘ ১৩৩৩ ২য় বর্ষ, (নব পর্য্যায়)।
৩৫। ডক্টর চারুচন্দ্র সান্যাল, জলপাইগুড়ি সহরের একশো বছর, প্রকাশিত হয়েছিল 'জলপাইগুড়ি জেলা শত-বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে', ১৯৭০ সাল।
৩৬। ডক্টর চারুচন্দ্র সান্যাল, পূর্বে উল্লিখিত লেখা ও স্মারক গ্রন্থ।
৩৭। স্বাধীনতা, ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ১৩ই পৌষ শুক্রবার, ১৩৫২. ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৪৫।
৩৮। স্বাধীনতা, পূর্বে উল্লিখিত সংখ্যা।
৩৯। স্বাধীনতা, প্রথম বর্ষ ৩৩ সংখ্যা, ১২ই মাঘ, শনিবার ১৩৫২, ২৬শে জানুয়ারী ১৯৪৬।

১১ ॥ হিতবাদী প্রসঙ্গে

হিতবাদী ছিল সেকালের বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র। এই কাগজ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতো। হিতবাদী এবং কয়েকটি পত্র-পত্রিকা প্রসঙ্গে Report on the Administration of Bengal[১] গ্রন্থে উল্লেখ আছে :

'The Indian Press

During the year 1910 the total Number of newspapers

and periodicals published was 354, of which 128 were newspapers and 226 periodicals, this number represents an increase of about 12.38 percent. On the figures of the previous year. Of these publications, about 48 per cent were written in Bengali and 31 per cent in English *The Hitavadi* was the most widely read paper, either English or vernacular, and had a circulation of 30,000 copies, next came the *Basumati* with 17,000, the *Statesman* with 15,000, the *Bangavasi* with 15,000, the *Indian Daily News*, the *Englishman*, the *Empire* and the *Sanjivani* with 10,000. *The Amrita Bazar patrika* and other extremist papers all showed a decrease in circulation, while the *Bengalee* increased in popularity.'

'হিতবাদী' নামটির নীচে লেখা থাকতো—

'হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ'। ২১ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, প্রকাশিত হয়েছিল ঃ ২৯শে আষাঢ় শুক্রবার, সন ১৩১৮ সাল, ১৪ই জুলাই ১৯১১ মূল্য দুই পয়সা। হিতবাদীর স্বত্বাধিকারী ও কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন ঃ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। হিতবাদী কার্য্যালয় ঃ ৭০ নং কলুটোলা স্ট্রীট. কলিকাতা। বিনোদবিহারী চক্রবর্তীর দ্বারা কাগজ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতো। কাগজ ছিল বিরাট। কাগজ লম্বায় ৪৫ ইঞ্চি, আড়ে ৩০ ইঞ্চি ছিল প্রতি পৃষ্ঠার মাপ। অধিকাংশ সংখ্যায় ১১টি কলমে লেখা ছাপা হতো। লেখা এবং বিজ্ঞাপন দুই থাকতো প্রচুর। হিতবাদী[২] পত্রিকায় লেখা হয়েছিল ঃ ভারতবর্ষ হিন্দু-মুসলমানের দেশ। সেই লেখাটি হলো এই ঃ

'পাঞ্জাবে হিন্দু-বিদ্বেষ।

পাঞ্জাবের মুসলমান সমাজে হিন্দু বিদ্বেষ ধীরে ধীরে বেশ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সহযোগী "ঝাংশিয়াল" বলিতেছেন—ঝাং নগরে সম্রাটের অভিষেকদিনে স্থানীয় বিদ্যালয়সমূহে ছাত্রদিগের মধ্যে যে সময় মিষ্টান্ন বিতরণ করা হইয়াছিল. সেই সময় কোন মুসলমান ছাত্রই বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিল না। হিন্দুগণ সম্রাটের অভিষেক উৎসব উপলক্ষে যে উদ্যান ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন, সেই ভোজ সভায় মুসলমান অতিথিগণ উপস্থিত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা হিন্দুর প্রদত্ত মিষ্টান্ন ভোজন করেন নাই। এখন মুসলমানগণ হিন্দুর সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধচ্ছেদের চেষ্টা করিতেছেন এবং হিন্দুর স্পর্শে কলুষিত খাদ্য আর গ্রহণ করিবেন না, বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। ভারতবর্ষ হিন্দু-মুসলমানের দেশ ; সুতরাং এই প্রকার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিকাশ যে হিন্দু-মুসলমানের পক্ষে কল্যাণকর নহে, একথা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু ক্ষোভের বিষয়, পাঞ্জাবী মুসলমানগণ একথা বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না।'

হিতবাদী[৩] পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল পুস্তক বাজেয়াপ্ত করার সংবাদ ঃ

'পুস্তক বাজেয়াপ্ত

"সি কাস্টমস্ এক্ট" অনুসারে ভারত গবর্ণমেণ্ট '১০ই মে নামক একখানি কাগজ বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ দিয়াছেন।'

হিতবাদী[৪] পত্রিকায় প্রকাশিত একটি মৃত্যু সংবাদ ঃ

'মৃত্যু সংবাদ। আমরা শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম যে, বাবু রাধেশচন্দ্র শেঠ পরলোক গমন করিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য সেবায় রাধেশ বাবু প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। মালদহ, পৌণ্ড্র প্রাচীন গৌড় প্রভৃতি প্রদেশের ইতিহাস উদ্ধারে ব্রতী হইয়া তিনি নানা উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। গতবারে মালদহে যে সাহিত্য সম্মিলন হইয়াছিল, তাহা তাঁহারই চেষ্টার ফল। তিনি অমায়িক ও সদাশয় এবং মালদহে স্বদেশী আন্দোলনের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইদানীং কিছুদিন হইতে উদরের যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছিলেন। চিকিৎসার্থ তিনি মালদহ হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। এই খানেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ সান্ত্বনা লাভ করুন। ইহাই আমাদিগের কামনা।'

হিতবাদী[৫] কাগজে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

'ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ অব ইণ্ডিয়া।

(ভারত গবর্ণমেণ্টের আইন অনুসারে রেজিষ্টারীকৃত)

এল্. এম. এস. এবং এম্. বি. পরীক্ষার পাঠ্য শিক্ষা দেওয়া হয়। দারভঙ্গ ও কাসিমবাজারের মহারাজা, রাজা পিয়ারীমোহন মুখার্জ্জি, রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর ও মিঃ এ. এ. চৌধুরী কলেজের সভ্যগণ। কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার এস. কে. মল্লিক ৫০, ৪০, ৩০ ও ২৫ টাকা বৃত্তি দিবেন। শবচ্ছেদ, এনটমি ফিজিওলজি, প্র্যাকটিক্যাল রোগ চিকিৎসা ও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা হাসপাতালে শিক্ষা হয়। মাসিক বেতন ৩ টাকা। আবেদন স্থান ১৯১ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।'

'হিতবাদী' পত্রিকায় একটি কলম ছিল 'মফস্বলের প্রতিধ্বনি'। এই কলমে মফস্বলের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা উদ্ধৃত করা হতো। লেখার সঙ্গে থাকতো মফস্বলের কাগজের নাম এবং কোন জায়গার কাগজ তা' উল্লেখ করা হতো। হিতবাদী[৬] পত্রিকা থেকে সেকালের 'নীহার' (কাঁথি), 'যশোহর' (যশোহর), 'ত্রিপুরা হিতৈষী' (ত্রিপুরা) পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা উল্লেখ করা হলো ঃ

'মফস্বলের প্রতিধ্বনি।

কাঁথি। স্বাস্থ্যের অবস্থা ক্রমেই হীন হইতে হীনতর হইতেছে। নূতন জ্বরে অনেকেই আক্রান্ত হইয়াছে। ধান চাউলের দর চড়িয়াছে।

জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় কৃষকেরা মাঠে যে বীজ ধান্য বুনিয়াছিল, মধ্যে কিছু অধিক বৃষ্টি হওয়ায় তাহার কতক পরিমাণ নষ্ট হইয়া যায়। পরে কৃষকেরা অনেক কষ্টে বীজ বুনিয়া যে চাষা করিয়াছে, মধ্যে কয়েকদিন একেবারেই বৃষ্টি না হওয়ায় তাহার ক্ষতি হইবার উপক্রম হইয়াছে। বৃষ্টির অভাবে চাষের কার্য্য একরূপ বন্ধ হইতে বসিয়াছে। শীঘ্রই জল না হইলে যথেষ্ট ক্ষতির সম্ভাবনা। "নীহার"।

যশোহর। মধ্যে মধ্যে বারিবর্ষণ হইতেছে। যাহা হউক তাহাতে সর্ব্ববিধ শস্যের বেশ সুবিধা হইতেছে; তবে রাস্তা ঘাটের অভাবে লোকদিগকে কর্দ্দম ঘাটিতে হইতেছে। যাহা হউক জলের কষ্টটা একটু কমিতেছে। তাহাই আমাদের পক্ষে মঙ্গল। আশু ধান্যের অবস্থা বেশ ভালই বলিতে হইবে। পাটও এতদঞ্চলে মন্দ হয় নাই। অন্যান্য শস্যও নিতান্ত মন্দ নহে। বালাম চাউল চার টাকা—চার টাকা চার আনা, মোটা তিন টাকা বারো আনা—তিন টাকা চৌদ্দ আনা মণ দরে বিক্রীত হইতেছে। করকচ সের এক আনা, সর্ষপ তৈল সের ছয় আনা। কেরোসিন সের ছয় পয়সা, দুগ্ধ টাকায় দশ—বারো সের। মৎস্যাদি দুষ্প্রাপ্য। হাটটীর অবস্থা বেশ ভাল। তবে গাড়ী চলাচলের রাস্তা নাই বলিয়া তত উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে না। হাটের মালিকগণ যদি রাস্তা ঘাটের দিকে একটু দৃষ্টি করেন তাহা হইলে শীঘ্রই হাটটী একটি উন্নত হাটে পরিণত হইবে। "যশোহর"।

ত্রিপুরা। মাসাধিককাল যাবৎ অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছে। সূর্য্যের মুখ দেখা দুর্ঘট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অসময়ে বন্যার প্লাবনে পর্ব্বত সানুদেশের শস্যের বেশী ক্ষতি না হইলেও নিম্নভূমিতে ধান ও পাটের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। নিম্ন প্রদেশস্থ গৃহস্থগণ পাটের ভরসাতেই অত্যধিক সুদে ধার কর্জ্জ করিয়া এই বর্ষার কয়টা মাস চালায়। এবার অনেক গ্রামে টাকার সুদ শতকরা বার্ষিক ১৫০ টাকারও অধিক। অনেক গৃহস্থ পেটের জ্বালায় বাধ্য হইয়া অসম্ভব সুদে টাকা কর্জ্জ করিতেছে। পাটের যে অবস্থা দেখা যাইতেছে তাহাতে এবার গৃহস্থগণ যে কি করিয়া ঋণমুক্ত হইবে তাহা ভগবানই জানেন। আশু ও পৌষ ধান্যেও সম্বৎসরের খোরাকী হইবে কি না সন্দেহ। সমবেত চেষ্টা ও সমবায় নীতি যে দরিদ্রের আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় তাহা এখনই বুঝাইবার সময়। পেটের জ্বালায় মানুষ যত সহজে হিতবুদ্ধি গ্রহণ করিবে আর কিছুতেই তত নয়। এই সময় যদি আমাদের উদ্যমশীল যুবকবৃন্দ গ্রামে গ্রামে সমবায় সমিতি স্থাপনের চেষ্টা করেন, তবে যত সহজে দেশ ও সমাজের কল্যাণ সাধনে সমর্থ হইবেন আর কিছুতেই তেমন নহে। "ত্রিপুরা হিতৈষী"।

হিতবাদী[৭] পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল কলিকাতায় সংকীর্ত্তন নিয়ে একটি লেখা। সেই লেখাটি হলো এই ঃ

'কলিকাতায় সংকীর্ত্তন।

কলিকাতা পুলিশের কর্তৃপক্ষ একটি সার্কুলার জারি করিয়া কলকাতার রাজপথে সংকীর্ত্তন বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এখন কোন সংকীর্ত্তন সম্প্রদায় পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে রাজপথে সংকীর্ত্তন করিতে পারিবেন না। পুলিশ কর্তৃপক্ষের এই ব্যবস্থায় হিন্দু সমাজ যে ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, একথা বলাই বাহুল্য। আমরা শুনিতেছি, সংকীর্ত্তন সংক্রান্ত সার্কুলার পুলিশ কমিশনার মান্যবর মিঃ হ্যালিডের মস্তিষ্ক প্রসূত নহে। আশা করি, মান্যবর মিঃ হ্যালিডে এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য জনসাধারণের গোচর করিয়া লোকের সংশয় অপনোদন করিবেন। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট আমাদিগের প্রার্থনা, তাঁহারা যেন এই অপ্রীতিকর সার্কুলার রহিত করিয়া কলিকাতার হিন্দু অধিবাসীদিগের মনঃপীড়া দূরীভূত করেন।'

হিতবাদী[৮] কাগজে প্রকাশিত পুস্তক সমালোচনা। সেকালের একটি নাটক প্রসঙ্গে হিতবাদীতে লেখা হয়েছিল।

'মায়া। নাটক। শ্রীযুক্ত গঙ্গাগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। হাওড়া বেতড় হইতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত মূল্য দশ আনা, এই নাটকখানি এলাহাবাদে "গ্রেট ইউনিয়ন থিয়েটারে" অভিনীত হইয়াছে। আমরা এই নাটকখানি পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি। গ্রন্থকার পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, পার্থিব আকর্ষণ ছিন্ন করিয়া মায়াজাল হইতে মুক্ত হওয়াই শান্তি লাভের একমাত্র উপায়। লেখকের নাটক রচনাব ক্ষমতা আছে। মোটের উপর আজকাল "নাটক" নামে যে সকল আবর্জনা নিত্য মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়, এই পুস্তকখানি সেরূপ নহে। যে কোন রঙ্গালয়ে ইহা অভিনীত হইবার উপযুক্ত।'

সেকালে হিতবাদী[৯] কাগজের এক সংবাদে বলা হয়েছিল প্রচার সংখ্যার কথা। কিছু অংশ হলো এই ঃ

'হিতবাদীর বর্ত্তমান গ্রাহক সংখ্যা অতুলনীয়।

A High Court affidavit

(bv the Govt. Postal Officer Incharge.)

The "Hitabadi" newspaper is posted every week by Instalments on Wednesdays and Thursdays...and that the total number thus posted weekly average about 25,000 copies. Solemly affiimed that 1st day of July 1901 before me—H. H. Andrews. Commissioner Calcutta High Court... ..'

হিতবাদী[১০] কাগজে প্রকাশিত আর একটি সংবাদ হলো এই ঃ

'সাভারকরের দ্বীপান্তর

নাসিকের ষড়যন্ত্রের মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাস দণ্ডে দণ্ডিত

সাভারকরকে গত ২৭শে জুন তারিখে মাদ্রাজে আনায়ন করা হয়। সাভারকরের স্বাস্থ্য মন্দ নহে। ঐ দিবস অপরাহ্নকালেই "মহারাজা" নামক জাহাজে তাঁহাকে আন্দামানে প্রেরণ করা হইয়াছে।'

সেকালের 'সুলভ সমাচার' এবং রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুরের কথা এবং অন্যান্য বিষয় উল্লেখ আছে Report on the Administration of Bengal[১১] গ্রন্থে। কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

'The police continued to meet with severe criticisims in the columns of the Vernacular Press. If the police were adversely criticised in Courts of Law, highly coloured and misleading versions of their misdeeds were given a conspicuous place in the newspapers, while any praise given by the Courts was either passed by unnoticed or mentioned only to be condemned. Jail administration, and in particular the treatment of political prisoners, was another topic which met with hostile criticism. Other matters of a political character which attracted special notice were the prohibition of District Conferences in Eastern Bengal under the Seditious Meetings Act the prohibition of the boycott celebration in Calcutta and the circular discountenancing the Partition meeting, which the chief Legislative measures of the year which were discussed were the Press Act, the Calcutta Police Act, the Seditious Meetings Act and the Calcutta Improvement Bill.

During the year 1910 it was decided to give financial assistance to a vernacular Newspaper of Loyal tone. This proposal not unexpectedly met with much adverse criticism, but at the same time it is significant that both in the Press and in the debate in the Local and Imperial Legislative Councils there was a general consensus of opinion that in view of the indiscriminate misrepresentation to which Government was exposed in the Vernacular Press, it was only right that measures should be taken to assist and encourage the spread of sober opinion and accurate information when the intentions and acts of Government were concerned. An agreement was entered into by Government with Rai Narendra Nath Sen Bahadur, the editor of the *Indian Mirror,* and the first number of this newspaper made its appearance shorthy after the close of the year under review, with the tittle of *Sulabh Samachar.*

সেকালের বিভিন্ন কাগজের কথা উল্লেখ আছে Report on the Administration of Bengal[১২], গ্রন্থে :

'During the year the total number of newspapers and periodicals published was 348, of which 243 were published in Calcutta One of the most noticeable journalistic tendencies was the growth of the Muhammadan Press The circulation of *Muhammadi* doubled, and a newspaper called the *Moslem Hitaishi* was started with a circulation of over 5,000 copies An English weekly called the *Comrade* was also started purely in Muhammadan interests *The Herald* the first daily newspaper in English published in Eastern Bengal appeared towards the end of the year There was an increase in the cleavage between the Indian papers in Calcutta, such as the *Bengalee* and the *Amrita Bazar Patrika* and the English papers such as *The Statesman* and *Englishman* The *Hitabadi* as in the previous year was the most widely read paper either English or vernacular and had a circulation of 30,000 copies Next came the *Sulabh Samachar* with a circulation of 25,000 the *Basumati* with 20,000, *The Statesman* with 18,000 and the *Englishman* and *Bengalee* with 15,000 each The largest circulation enjoyed by any paper in Eastern Bengal was that of the *Biswabarta*, a paper started during the year, with a circulation of 12,000 copies, of which 11,000 were taken by Government'

Report on the Administration of Bengal[১৩] গ্রন্থে আরও উল্লেখ আছে :

'Subsidised Newspapers

Almost the entire press objected to subsidising of the *Sulabh Samachar* and the *Biswabarta* by the Governments of Bengal and Eastern Bengal and Assam The *Biswabarta* it is said, was not conducted with marked ability was rather colourless and uninteresting and had little influence

As regards the *Sulabh Samachar* the consensus of opinion is that the paper was well received by the public for whom it was intended and that its effect was salutary The publishers received large number of appreciative letters and eagerness was shown to obtain copies It reached, by means of a carefully devised scheme of circulation, a large public

which did not read any papers at all before; and this is a danger that, after the public has become accustomed to newspaper-reading, it will take to less reputable papers now that the distribution of these papers by Government has ceased.'

অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য[১৪] শরৎচন্দ্রের ভাষা প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে 'সুলভ সমাচারের' কথা উল্লেখ করেছিলেন। ওই অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

'এই প্রসঙ্গে সংবাদপত্রের ভাষা ও সাহিত্যের ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা উঠেছিল। শরৎচন্দ্র বললেন যে দুই-এর মধ্যে পার্থক্য করা নিরর্থক। প্রসঙ্গত আরও বলেছিলেন যে সংবাদপত্রের ভাষা সাধারণ মানুষের অন্তরের ভাষা যদি না হয়, তাহলে সংবাদপত্রের প্রচেষ্টা অর্থহীন হয়ে পড়ে। এই শতাব্দীর ত্রিশ শতকের কথার উল্লেখ করছি। তদানীন্তন সংবাদপত্রের ভাষা অল্প শিক্ষিত বা ইংরাজী না জানা মানুষের বোধগম্য নয় বলে শরৎচন্দ্র মন্তব্য করেন।'

এই সম্পর্কে বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাসের অজ্ঞাত প্রায় একটি তথ্যের উল্লেখ করা প্রয়োজন। আজ থেকে একশ বৎসর পূর্বে কেশবচন্দ্র সেন তাঁর সুবিখ্যাত সাপ্তাহিক সংবাদপত্র "সুলভ সমাচার" প্রকাশ করেন। এর প্রতি সংখ্যার দাম ছিল এক পয়সা। অতি দরিদ্র মানুষও সংবাদপত্রটি কিনে পড়তে পারবে—এই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি মাত্র এক পয়সায় তাঁর সংবাদপত্রটি বিক্রয় করতে আরম্ভ করেন। "সুলভ সমাচারের" আর একটি বিশেষত্ব ছিল যে এই সংবাদপত্রটির ভাষা অতি সহজ, সরল ও অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গেরও বোধগম্য। এই সংবাদপত্রের তৃতীয় বিশেষত্ব ছিল যুগান্তকারী। ধনী উচ্চপদস্থ ব্যক্তি দ্বারা দরিদ্রের শোষণ ও অপমান এ পত্রে সুস্পষ্ট ভাষা পেয়েছিল। ১৮৭১ সালে "সুলভ সমাচারের" একটি সংখ্যায় দরিদ্র ও শোষিত জনসাধারণকে আহ্বান করে কেশবচন্দ্র যা লিখেছিলেন তার মর্মার্থ এইরূপ ঃ আর ঘুমিওনা। জেগে উঠে তোমরা দেখ যে তোমাদের দুঃখ কষ্টের কথা বলার লোক এদেশে নাই, উচ্চপদস্থ কর্মচারিবৃন্দ আর বড় লোকের দল তোমাদের দুর্দশার কথা চিন্তা করেনা। তোমরা কি চিরকাল এই অপমান সহ্য করে যাবে? তোমরা কি মানুষ নও? ঈশ্বর কি তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি দেন নি? তোমরা কেন অজ্ঞতার অন্ধকারে চিরকাল বাস করবে? সত্য বলতে তোমরাই দেশের মহান মানুষ কারণ দেশকে তোমরাই বাঁচিয়ে রেখেছো। তোমরা যদি নিশ্চিহ্ন হও, দেশও রসাতলে যাবে। তাই চেষ্টা কর, আপন অজ্ঞতা দূর কর। তোমরা যখন আপন চেষ্টায় নিজ অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হবে তখন সরকার তোমাদের কথা শুনতে

বাধ্য হবে। আর অত্যাচারী বড় লোকের দল তোমাদের শক্তিকে ভয় করবে এবং তোমাদের সম্মান করতে শিখবে।

কেশবচন্দ্রের ভাষা ছিল সাধারণ মানুষের প্রাণের ভাষা। ভাষা ও ভাবের যে সমন্বয় আমরা কেশবচন্দ্রের "সুলভ সমাচারে' দেখতে পেয়েছি, আজকাল তথাকথিত প্রগতিপন্থী সংবাদপত্রগুলিতেও তা দেখা যায় না। সেগুলির ভাষা মধ্যবিত্তসুলভ আড়ম্বরে পরিপূর্ণ। কুৎসিত গালাগালি এবং অর্ধপক্ক বিদেশী বুলির দিনের পর দিন পুনরুক্তি তাদের মূলধন। তাই মনে হয় যে কেশবচন্দ্রের আদর্শ একশত বৎসর পরেও আমাদের সংবাদপত্রগুলিকে পথ নির্দেশ করছে।

এই স্থলে কেশবচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের মতের একটা ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। ভাষাকে সহজবোধ্য করে তুলতে হবে। বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন যথা সম্ভব সাধারণ মানুষের কাছে বিষয়টি আনতে হবে। এই জন্যই ভাষার যাদুকর হতে হবে সাহিত্যিকের। এই সাহিত্যিকের জন্য বাংলা ভাষা অপেক্ষা করছে। এই যুগান্তকারী সাহিত্যিককে শরৎচন্দ্রের পথেই অগ্রসর হতে হবে। কিন্তু তাঁকে যেতে হবে অনেক দূর।

সুলভ সমাচারের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল 'হিতবাদী' পত্রিকায়। সাংবাদিক নরেন্দ্রনাথ সেনের মৃত্যুর পর একটি বড় লেখা ছাপা হয়েছিল 'হিতবাদী'[১৫] কাগজে। ওই লেখার সঙ্গে কাঠের ব্লক দিয়ে ছাপা নরেন্দ্রনাথ সেনের একটি ছবি ছাপা হয়েছিল। সেই লেখার কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

'"মিরার" পত্রের প্রবীণ সম্পাদক, দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ উপাসক, মনস্বী ও যশস্বী নরেন্দ্রনাথ সেন আর ইহলোক নাই। বিগত শনিবার অপরাহ্ন ৫টা ৪৫ মিনিটের সময় তিনি আত্মীয় স্বজন ও গুণানুরাগী বন্ধুমণ্ডলীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।...'

'...তিনি বাঙ্গলার প্রথম ইংরাজী দৈনিকপত্র "ইণ্ডিয়ান মীরার" সম্পাদক ছিলেন এবং অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল নানা বিঘ্ন সত্ত্বেও উক্ত পত্রের পরিচালনা করিয়াছিলেন।...'

'শেষ বয়সে তিনি বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্র "সুলভ সমাচারের" প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। কিন্তু সুলভ প্রকাশের পর দুই মাস যাইতে না যাইতেই তিনি রক্তামাশায় ও জ্বর রোগে আক্রান্ত হন।...'

'...মৃত্যুকালে তাঁর বয়ঃক্রম ৬৯ বৎসর হইয়াছিল।'

সেকালে 'হিতবাদী' পত্রিকায় তেজারতি কারবারী অর্থাৎ সুদখোরদের কথা মাঝে মাঝে দশের সামনে তুলে ধরা হতো।

হিতবাদী[১৬] পত্রিকায় 'কলিকাতা ও উপনগর' কলমে ছাপা হয়েছিল একটি সংবাদ ঃ

'কাবুলীর তেজারতি

জনৈক কাবুলি এক ব্যক্তিকে ৮০ টাকা ধার দিয়াছিল। সাত বৎসরে সে অধমর্ণের নিকট হইতে সুদ হিসাবে এক সহস্র টাকা আদায় করিয়াছে। কাবুলিদিগের এবংবিধ তেজারতি ব্যবসায় পল্লীগ্রামে আরও ভীষণভাবে চলে। কিন্তু দরিদ্র কৃষকেরা ইহাদিগের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে বিরত হয় না, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয় '

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে সেকালের বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক সংবাদপত্র—'সঞ্জীবনী'র কথা। এই পত্রিকা লম্বায় ২৮ ইঞ্চি, আড়ে ২১ ইঞ্চি ছিল। আট কলমে লেখা ছাপা হতো। ৯ ভাগ, ১৬শ সংখ্যা, ১৭ই শ্রাবণ ১২৯৮, ১লা আগষ্ট ১৮৯১ সালের সংখ্যায় সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল—'রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র। তা' ছাড়া ছাপা হয়েছিল 'রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্বন্ধে কয়েকটি গল্প'। আর একটি লেখা—'বিদ্যাসাগর নাই'। ওই সংখ্যায় কাঠের ব্লকে ছাপা হয়েছিল রাজেন্দ্রলাল মিত্রের একটি ছবি এবং বিদ্যাসাগরের তিনটি ছবি। কাগজ প্রকাশিত হতো ২ নং কলেজ স্কোয়ার, পটলডাঙ্গা, কলিকাতা থেকে। নিবারণচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতো। কাগজের দাম ছিল প্রতি সংখ্যা দুই পয়সা।

সঞ্জীবনী[১৭] পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদ ঃ

'ছাত্রসমাজ

বক্তা—শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, বি. এ.

বিষয়—পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

স্থান—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির

১১১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট,

সময়—১লা আগষ্ট শনিবার, সায়াহ্ন – ৭॥ ঘটিকা'

প্রসঙ্গপঞ্জী

১। Report on the Administration of Bengal, 1910-1911, (Published From : The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1912), Page 128

২। হিতবাদী, ২৯শে আষাঢ় ১৩১৮, ১৪ই জুলাই ১৯১১

৩। হিতবাদী, পূর্বে উল্লিখিত তারিখের কাগজ

৪। হিতবাদী, পূর্বে উল্লিখিত তারিখের কাগজ

৫। হিতবাদী, পূর্বে উল্লিখিত তারিখের কাগজ

৬। হিতবাদী, পূর্বে উল্লিখিত তারিখের কাগজ

৭। হিতবাদী, পূর্বে উল্লিখিত তারিখের কাগজ

৮। হিতবাদী. পূর্বে উল্লিখিত তারিখের কাগজ
৯। হিতবাদী, ২২শে আষাঢ় ১৩১৮, ৭ই জুলাই ১৯১১
১০। হিতবাদী, পূর্বে উল্লিখিত তারিখের কাগজ
১১। Report on the Administration of Bengal, 1910-1911, Page 128
১২। Report on the Administration of Bengal, 1911-1912, Page 277.
১৩। Report on the Administration of Bengal, 1911-1912
১৪। অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য, শরৎচন্দ্রের ভাষা ; স্মৃতিচারণ, প্রকাশিত হয়েছিল—'অয়ন' শারদীয় সংকলন, ১৩৮০ পৃষ্ঠা ৫১. নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন, দক্ষিণ কলিকাতা শাখা, ১১ পালিত স্ট্রীট, কলিকাতা থেকে অপর্ণা দেবী কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
১৫। হিতবাদী. ২২শে আষাঢ় ১৩১৮, ৭ই জুলাই ১৯১১
১৬। হিতবাদী, ২৯শে আষাঢ় ১৩১৮, ১৪ই জুলাই ১৯১১
১৭। সঞ্জীবনী. ১৭ই শ্রাবণ ১২৯৮, ১লা আগষ্ট ১৮৯১

১২। দৈনিক হিন্দুস্থান

কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি দৈনিক বাংলা সংবাদ পত্র ১৯৪৬ সালে বেশ নাম করেছিল। কাগজের আকার ছিল সেদিনের আরও অন্যান্য বাংলা দৈনিক কাগজের মতো। কাগজের নাম: হিন্দুস্থান। সম্পাদক-মণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন—ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সম্পাদক: রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্ষেত্রমোহন রায় কর্তৃক কলকাতা, ৯৮।৪, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড ক্যালকাটা প্রিন্টিং কোং লিমিটেড থেকে কাগজ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতো। ১ম বর্ষ, ১১৩তম সংখ্যা, শনিবার. ১২ই পৌষ ১৩৫৩ সাল, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৪৬ তারিখে আট পৃষ্ঠা কাগজ ছাপা হয়েছিল। দাম: এক আনা। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একটি বক্তৃতা 'হিন্দুস্থান'[১] পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ওই অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো:

শেষ সংগ্রাম তীব্র হইবে

আমার মনে হয়, একথা নিশ্চিত যে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ভারতবর্ষকে আরও একবার তীব্র সংগ্রামের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে।

ভারতবর্ষ বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতায় পূর্ণ হইয়া উঠুক তাহা কেহ চাহিবে না। শান্তিপূর্ণ ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে চাহিয়া বৃটিশরা যদি লীগকে চিরস্থায়ী বাধা হিসাবে রাখিয়া দেয় তাহা হইলে ভারতবর্ষ সেই জঘন্য অবস্থা কখনও সহ্য করিবে না। এইরূপ ক্ষেত্রে দেশে বিদ্রোহ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিবে। সেই সময়ে ভারতের অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা-কামী সকলে রাজনৈতিক মতামত যাহাই হউক না কেন, সেই সংঘর্ষে জড়াইয়া পড়িতে বাধ্য হইবে। এইরূপ ভয়াবহ পরিণতির পূর্ণ দায়িত্ব ব্রিটিশ সরকারের উপর বর্তাইবে।'

ওই দিনের কাগজে এল. বি. ভোপৎকার সম্পর্কে এন. সি. চ্যাটার্জির বক্তৃতা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা ইত্যাদি সংবাদ ছাপা হয়েছিল।

প্রসঙ্গপঞ্জী

১ হিন্দুস্থান ২৮ ডিসেম্বর ১৯৪৬।

১৩॥ হরিজন পত্রিকা

দেশ স্বাধীন হবার আগে বাংলা 'হরিজন পত্রিকা' বেশ নাম করেছিল। দেশপ্রেমিকদের একটি প্রিয় সাময়িক পত্র রূপে 'হরিজন পত্রিকা' ভালো বিক্রি হতো। বিশেষ করে যাঁরা মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশ মতো গঠনমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাঁদের অনেকে ছিলেন এই কাগজের পাঠক। অহিংসা ও প্রেম, ভালোবাসার ভেতর দিয়ে দেশের কাজ করে যাওয়ার কথা এই কাগজে প্রচার করা হতো। মহাত্মা গান্ধীর বিভিন্ন সময়ের লেখা ইয়ং ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান হোম রুল প্রভৃতি থেকে বাংলায় অনুবাদ করে 'হরিজন পত্রিকায়' প্রকাশিত হয়েছিল। 'হরিজন পত্রিকার' সম্পাদক : রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, কাগজের অফিস ছিল ২৭।৩ বি, হরি ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা। কাগজ প্রতি রবিবার বের হতো। কলকাতায় 'শক্তি প্রেস'-এর অজিতকুমার বসু কাগজ ছাপাতেন এবং প্রকাশ করতেন। অধিকাংশ কাগজ আট পৃষ্ঠা বেরিয়েছিল। মূল্য প্রতি সংখ্যা দুই আনা। হরিজন পত্রিকায়[১] 'স্বাধীনতা' শীর্ষক একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। লেখাটি এখানে উল্লেখ করা হলো :

'স্বাধীনতা

[মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী]

স্বাধীনতার সংজ্ঞা নির্দেশ করিবার জন্য বন্ধুরা আমাকে বারবার আহ্বান করিয়াছেন। যে অনবদ্য আদর্শ স্বাধীনতা আমার মনে রূপ

পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহা তো রামরাজ্য—পৃথিবীতে ভগবানের রাজত্ব। স্বর্গে তাহার কি রূপ আমি তাহা জানি না ; সুদূরের সে কথা জানিবার অভিরুচিও আমার নাই। আমি শুধু এই জানি যে তাহার বর্তমানের রূপ যদি যথেষ্ট মনোহারী হয়, তবে ভবিষ্যৎ রূপে পার্থক্য অধিক হইবে না।

স্থূলভাবে নির্দেশ করিতে হইলে এই স্বাধীনতা হইবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মনৈতিক।

"রাজনৈতিক" বলিতে অবশ্য ইহাই বুঝাইবে যে ব্রিটিশ সৈন্যদল দ্বারা শাসন ব্যবস্থার সর্বতোভাবে অপসারণ।

'অর্থনৈতিক" বলিতে বুঝাইবে যে ইংরেজ ধনিক এবং তাহাদের ধনতান্ত্রিক শোষণের সহায়স্বরূপ ভারতীয় ধনিক, ইহাদের উভয়ের ধন-শক্তির প্রভাব হইতে দেশের নিরবশেষ মুক্তি। অন্য কথায় বলিতে গেলে, দেশের নিম্নতম অধিবাসীও আপনাকে উচ্চতমের সমান বলিয়া অনুভব করিবে। যদি ধনিকেরা তাঁহাদের দীনতম ও ক্ষুদ্রতম দেশবাসীর সহিত তাঁহাদের ধন ও কর্মনৈপুণ্য ভাগ করিয়া লইতে সম্মত হন, তাহা হইলেই ইহা হইতে পারে।

'ধর্মনৈতিক" বলিতে বুঝাইবে বহিরাক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যদল রাখিবার প্রয়োজন হইতে মুক্তি। আমার চিন্তা-ধারার রামরাজ্যের যে ছবি ফুটিয়াছে, তাহাতে দেশের উপর কর্তৃত্ব রক্ষার জন্য ইংরেজ সৈন্যদলের পরিবর্তে জাতীয় সৈন্যদল রাখিবার স্থান নাই। কোন দেশ যদি জাতীয় সৈন্যদলের দ্বারাও শাসিত হয়, তবু তাহার নৈতিক মুক্তি হইয়াছে, একথা কখনও বলা চলে না। সুতরাং সে দেশের তথাকথিত দুর্বলতম অধিবাসী পরিপূর্ণ নৈতিক উচ্চভূমিতে কখনও উঠিতে পারে না। যদিও মিস্টার চার্চিল ব্রিটিশের পক্ষে যুদ্ধ জয় করিয়াছেন বলিয়া দাবি করেন, তথাপি এবারডিন সহরের বক্তৃতায় তাঁহার মুখে যেসব জ্ঞানের কথা বাহির হইয়াছে, তাহা তো চূড়ান্ত অহিংসাপন্থী সংস্কারকেরই কথা। আমাদের সময়ে পৃথিবীব্যাপী দুইটি মহাযুদ্ধের কারণে মানুষের যে সর্বনাশ ঘটিয়াছে, বর্মাচ্ছাদিত কোন বীরের যদি তাহা জানা থাকে, তবে মিস্টার চার্চিল তাহা জানেন। সংবাদপত্রে তাঁহার বক্তৃতা যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার একটি সংক্ষিপ্তসার অন্যত্র দেওয়া হইল। কেবল তাঁহার বক্তৃতায় যে অবসাদ ও নৈরাশ্যের সুর উঠিয়াছে সেই সম্বন্ধে আমি সকলকে সাবধান করিয়া দিতেছি। যুদ্ধের ভীষণতা দেখিয়া মানবজাতি যদি আজ ত্রাস ও বিতৃষ্ণায় যুদ্ধ বিমুখ হয়, তবে কোথাও কিছুই ভুল হইবে না। সাংঘাতিক রক্তপাততো মানুষের উপর দিয়া গেল। মানবসমাজে আজ আর প্রাণের রঙ নাই, সবই সাদা বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু একটি শিক্ষা যদি আমরা হইতে লাভ করিয়া থাকি, তবে এই রক্তপাতের বেদনা বৃথা

যাইবে না। সে শিক্ষাটি এই যে, কোন কাজ যত উচ্চাঙ্গের হউক অথবা হীনই হউক, তাহার সম্পাদনে আমরা স্বচ্ছন্দে নিজেরই রক্ত দান করিব. অপরের রক্ত কখন লইব না।

মন্ত্রী-মিশন যদি ভারতে তাহার অধিকার ছাড়িয়া দেয়. তবে দেশের উপর একটি গুরু মীমাংসার ভার আসিয়া পড়িবে। সামরিক-শক্তি সম্পন্ন জাতি হইয়া উঠিবার চেষ্টায় ভারতবর্ষ কি তবে অন্ততঃ আগামী কয়েক বৎসর ধরিয়া একটি পঞ্চম শ্রেণীর রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়া থাকিতে চাহিবে? উপরে মিষ্টার চার্চিলের বক্তৃতায় যে নৈরাশ্যের কথা বলা হইয়াছে তাহার জবাবে এবং তাহা দূর করিবার জন্য ভারতবর্ষের কি কোন বাণী থাকিবে না? অথবা, ভারতবর্ষ তাহার অহিংসাকে আরও পরিশুদ্ধ করিয়া লইয়া তাহার বহুসাধন-লব্ধ স্বাধীনতা জগতের কল্যাণের জন্য ব্যবহার করিবে এবং যুদ্ধে তথাকথিত বিজয়লাভ হইলেও পৃথিবী আজ দুঃখের যে গুরুভাবে মথিত হইতেছে তাহা হইতে মানবজাতিকে উদ্ধার করিয়া আপনাকে জগৎসভায় সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া প্রমাণ করিবে?

নয়া দিল্লী, ২৯-৪-৪৬'

'হরিজন পত্রিকায়' বিভিন্ন সংখ্যায় খাদি প্রসঙ্গ, গোশালা ও পিঁজরা-পোল, মোহনদাস করমচাদ গান্ধীজী বিভিন্ন প্রশ্নের যে সব উত্তর দিতেন তা ছাপা হতো। উদুর্ভাষা, মেথর ধর্মঘট, পশুবলি, খাদ্যসমস্যা ও দুর্ভিক্ষ প্রসঙ্গে লেখা ছাপা হয়েছিল। মানুষের প্রতি মানুষের অবিচার, চিনেবাদামের উপকারিতা, হরিজন-বর্ণহিন্দু-বিবাহ, কুষ্ঠরোগীর সেবা মদ্যপানের কুফল ইত্যাদি লেখা সেকালে অনেকের মনে দাগ কেটেছিল

প্রসঙ্গপঞ্জী

১। হরিজন পত্রিকা ২য় খণ্ড, ১১শ সংখ্যা, রবিবার ৫ই মে ১৯৪৬।

১৪ ॥ বাংলা পত্র-পত্রিকার টুকিটাকি

অধ্যাপক ডক্টর অমলেন্দু দে[১] সম্পাদিত কাফেলা (সৈয়দা মোতাহেরা বানু) গ্রন্থে উল্লেখ আছে 'সওগাত' পত্রিকার কথা। কিছু অংশ হলো এই:

'তখন "সওগাত" বিখ্যাত মাসিক পত্র ছিল। বাংলা ১৩২৫ সনে এই

কাগজ কলকাতা থেকে আত্মপ্রকাশ করে। মুসলিম মহিলা লেখিকাদের সাহিত্য চর্চায় উদ্বুদ্ধ করার ও জনসমক্ষে পরিচিত করার ব্যাপারে এই মাসিকপত্রের উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। এই মাসিকপত্রেই প্রথম মুসলিম মহিলা লেখিকাদের ছবি প্রকাশিত হয়। তখনকার দিনে এই কাজ করা কম দুঃসাহসের পরিচয় ছিল না।'

অমলেন্দু দে[২] আরও উল্লেখ করেছেন: '...১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুলাই কলকাতা থেকে মহিলাদের সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা "বেগম" প্রকাশিত হয়।'

'বেগম' পত্রিকা প্রসঙ্গে অধ্যাপক ডক্টর অমলেন্দু দে[৩] লিখেছেন:

'বেগম'-এর প্রথম সংখ্যা যখন কলকাতার কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট থেকে প্রকাশিত হয় তখন তার প্রধান সম্পাদিকা ছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল, আর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদিকা ছিলেন নুরজাহান বেগম। পরে নুরজাহান বেগম সম্পাদিকা থেকে কাগজটি চালান। ২০৭ নং পার্ক স্ট্রীটে "বেগম"-এর নূতন কার্য্যালয় ছিল।'

শারদীয়া দৈনিক কৃষক, ১৩৫৩, কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদক: হেমেন্দ্রনাথ দত্ত। একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল: 'শারদীয়া সংখ্যাখানি সম্পাদনা করিয়াছেন আমাদের সহযোগী সম্পাদক—গোপাল ভৌমিক এবং তাঁহার সহকারীরূপে সাহায্য করিয়াছেন শ্রীসমর বিশ্বাস...'

শারদীয়া দৈনিক কৃষক[৪] কাগজে 'শারদোৎসব' শীর্ষক একটি লেখা ছাপা হয়েছিল। সেই লেখাটি হলো এই:

'শারদোৎসব

দীর্ঘ এক বৎসর পরে বাঙ্গলার জাতীয় জীবনে আবার চিরাকাঙ্খিত শারদোৎসব ফিরিয়া আসিয়াছে। দুর্গাপূজা বাঙ্গালী হিন্দুদের নিজস্ব পূজা। অথচ এই পূজাকে কেন্দ্র করিয়া সারা দেশময় যে উৎসবের সঞ্চার হয়, যে আনন্দের স্রোত বহিয়া যায়, তাহাতে শুধু বাঙ্গালী হিন্দুদের একচেটিয়া অধিকার নয়। সে আনন্দোৎসবে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম নির্ব্বিশেষে বাঙ্গালী এবং অবাঙ্গালীও অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। বাঙ্গলার পাড়াগাঁয়ে এখন পর্য্যন্ত এই উৎসব উপলক্ষে হিন্দু ও মুসলমান ছেলেমেয়েদের একই রকমের নূতন ধুতি চাদর পরিয়া হাসিমুখে পাশাপাশি বেড়াইতে দেখা যায়—বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ও কলকোলাহলের মধ্যে একথা অভিনব শুনাইলেও, ইহা আদৌ অসত্য নয়। ইহার কারণ বাঙ্গালী দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করিয়া যে শারদোৎসবের সৃষ্টি করিয়াছে তাহার সার্ব্বজনীনতার কাছে পৌত্তলিকতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে গৌণ—মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে এই উৎসবের অন্তর্নিহিত মিলনের মহাবাণী। সেখানে

হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ, খৃষ্টানের মধ্যে বিরোধ নাই, সংঘাত নাই। ধর্ম্মের বহিরঙ্গ বাদ দিলে জাতি হিসাবে বাঙ্গালীর যে বৈশিষ্ট্য, যে নিজস্বতা তাহা পরিপূর্ণভাবে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে এই শারদোৎসবের মধ্যে।

বাঙ্গলার জাতীয় বৈশিষ্ট্যের মত প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যও এই উৎসবের মধ্যে সম্পূর্ণ রূপে প্রতিফলিত। বাংলায় ঋতুরাজ শরৎকে আমরা যেমন উপভোগ্যরূপে পাই—পৃথিবীর আর কোন জাতি বোধ হয় তাহা পায় না। বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসব তাই অনুষ্ঠিত হয় এই সুমধুর শরৎকালে। বর্ষাস্নাত সুনীল আকাশ মেঘমুক্ত রবির করে সমুজ্জ্বল, মাঠে মাঠে সবুজ শস্যের সমারোহ, নদী, পুষ্করিণী তড়াগে সুনীল স্বচ্ছজল ও তাহার মধ্যে কুমুদ কহ্লারের অপূর্ব্ব শ্রী-শেফালী ফুলের মিষ্টি সুগন্ধে গ্রাম-পথ আমোদিত। ইহা শুধু কবির কল্পনামাত্র নয়—ইহাই পল্লী বাঙ্গলার প্রকৃত রূপ। আজ যদি পল্লীবাঙ্গলার কোথাও সেই শ্যামলশ্রীর ব্যতায় ঘটিয়া থাকে, তবে তাহার জন্য দায়ী মানুষ নিজে—প্রকৃতির কার্পণ্য নয়।

আজও প্রকৃতি সেই শ্যামলশ্রীর পূর্ণপশরা লইয়া মুক্ত হস্তে বিতরণ করিতে আসিয়াছে। কিন্তু আমরা তাহার আনন্দের দান গ্রহণ করিতে পারিতেছি কই? বৎসরের এই বহু আকাঙ্খিত লগ্নটির প্রত্যাশায় বাঙ্গালী উন্মুখ হইয়া থাকে। কিন্তু সেই শুভলগ্ন আজ তাহার চোখের উপর দিয়া আসিয়া অজ্ঞাতেই বহিয়া যাইতে চলিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালীর মুখে হাসি কই—তাহার চোখে আনন্দোৎসবের কিরণ কই, তাহার সুবিস্তৃত বক্ষপটে মরণজয়ীর সাহস কই? কোন অদৃষ্টশক্তি কেমন করিয়া তাহার মুখের হাসি, চোখের জ্যোতি, বক্ষের বল কাড়িয়া লইল? বাঙ্গলার জাতীয় জীবনে এমন আত্মবিধ্বংসী বিভেদ-বুদ্ধির সঞ্চার কে করিল? বাঙ্গালী আজ পরস্পর অকারণে কোলাহল করিয়া, ভাইয়ের বুকে ভাই ছুরিকা বসাইয়া এই সার্বজনীন শারদোৎসবকে করিয়া তুলিয়াছে কলঙ্কিত—নিজেদের অসংহত জাতীয় জীবনকে করিয়া তুলিয়াছে দুর্ব্বলতর। আত্মবিস্মৃত এই বাঙ্গালী জাতি কি আজও জাগিয়া উঠিবে না—শারদোৎসবের মহামিলনের বাণীতে হইবে না একত্রিত?

বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়াই বাঙ্গালীর এই শারদোৎসবের আনন্দ হইয়া গিয়াছে স্তিমিত ব্যথাপরিম্লান। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী—একটির পর একটি দুর্দ্দৈব আসিয়া আমাদের সমাজ-জীবন ও জাতীয় জীবনকে করিয়া দিয়াছে ছত্রছান। তাহার প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে না উঠিতেই আমরা আজ আবার মাতিয়া উঠিয়াছি আত্ম-কলহে ভ্রাতৃ-নিধন-যজ্ঞে। শরতের স্বচ্ছ সুনীল আকাশ তাই আজ ব্যথা-পান্ডুর, লোকের ভীতিবিবর্ণ মুখে বিষাদের কৃষ্ণছায়া। তবু ইহারই মধ্যে যে আশার আলোক-রেখা নাই, তাহা নয়। দীর্ঘ পরবশতার মহারাত্রি আজ অবসান হইতে চলিয়াছে—অদূরে দেখা

দিয়াছে স্বাধীনতার মহাসূর্য্য। আসন্ন স্বাধীনতা-সূর্য্যের তূর্য্য নিনাদে সারা ভারত আজ উন্মুখ-কর্ম্ম-চঞ্চল। বিচ্ছিন্ন অসংহত বাঙ্গালী জাতিকেও আজ পারস্পরিক বিবাদ বিসম্বাদ ত্যাগ করিয়া সেই বিরাট বিপুল কর্ম্মচঞ্চলতায় অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। স্বাধীনতা লাভের আন্দোলন বাঙ্গালী কোন দিন পিছাইয়া পড়ে নাই—স্বাধীনতা লাভের শুভ মুহূর্ত্তেও সে পিছাইয়া পড়িবে না। এবারের ব্যর্থ শারদোৎসবের পিছনে আমরা সেই মহাসম্ভাবনারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেখিতে পাইতেছি।'

শারদীয়া দৈনিক কৃষক (১৩৫৩) এই সংখ্যায় লিখেছিলেন: সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, মনোজ বসু, যতীন্দ্রনাথ মজুমদার, কালিদাস রায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বাণী রায়, ভূপতি চৌধুরী, প্র না. বি., নির্ম্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, বনফুল, প্রবোধচন্দ্র বাগচী এবং আরও অনেকে।

ভারত (শারদীয়া সংখ্যা), সম্পাদক: মাখনলাল সেন। ১৫ই আশ্বিন ১৩৪৭, ১লা অক্টোবর ১৯৪০, মূল্য ছয় আনা। ২০নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট-এর 'আর্ট প্রেস' থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। ভারত" (শারদীয়া সংখ্যায়) দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত একটি লেখার কিছু অংশ হলো এই:

'···গৃহহারা, খাদ্যহারা, স্বাধীনতাহারাদের দুঃসহ ব্যথা স্মরণ করিয়া কুটীরবাসী আমরা, অর্দ্ধাশনে অপুষ্ট আমরা, পরাধীন আমরাও যে স্বস্তিতে থাকিতে পারিতেছি না। আমাদেরও অন্তরাত্মা যে কাঁদিয়া উঠিতেছে নিপীড়িত মানবতার দুর্গতি দেখিয়া।...'

'ভারত' পত্রিকার এই সংখ্যায় লিখেছিলেন: প্রমথ চৌধুরী, ডক্টর কালিদাস নাগ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বিধুশেখর শাস্ত্রী, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, বনফুল, রাজেশ্বর মিত্র, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, রেজাউল করীম, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, কাজী আবদুল ওদুদ এবং আরও অনেকে।

ভারত, কৃষক প্রভৃতি কাগজের কথা উল্লেখ আছে Dr. Nadig Krishna Murthy লিখিত গ্রন্থে। Dr. Nadig Krishna Murthy[৬] লিখিত গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো:

'Two Bengali dailies appeared on the scene in the year 1939. The *Bharat* was founded by Makhan Lal Sen. He was not new in the field of the Press. He had played a significant part in the establishment of the *Ananda Bazar Patrika, The Krisak* was started as an official organ of the Krishak Praja Party, a party which had definite political

ideologies and was gaining popular support from among the agriculturists in Bengal and elsewhere. Prof. Humayun Kabir, famous novelist and eminent educationist was actively connected with it. In 1941 another daily the *Navajug* was founded by A. K. Fazlul Huq. The *Swadhinata* started publication in 1946 as the official organ of the Communist Party of India. In the same year the *Swaraj* was started by Satyendranath Majumdar. Maulana Akram Khan's *Azad* and Hasan Shaheed Suhrawardy's *Ittehad* were two other Muslim-edited Bengali dailies published from Calcutta. The former was founded in 1936.'

নবযুগ (সচিত্র সাপ্তাহিক), সম্পাদক: জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯ই মাঘ ১৩৩২, ইং ২৩শে জানুয়ারী ১৯২৬, দ্বিতীয় বর্ষ, মূল্য প্রতি সংখ্যা দু-আনা। 'নবযুগ' ছাপা হতো 'হিমানী প্রেস' থেকে। ৮৩নং দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীট, কলিকাতা।

নবযুগ[৭] পত্রিকায় 'কাজের কথা' কলমে প্রকাশিত একটি লেখায় সেকালের আর একটি কাগজ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। লেখাটি হলো এই:

'নায়কের হস্তান্তর: দৈনিক "নায়ক" হস্তান্তরিত হইয়া স্বরাজ্যদলের মুখপত্র রূপে পরিচালিত হইয়াছে—এ সম্বন্ধে কয়েকটা কথা আমরা ভালরূপ বুঝিতে পারিতেছি না—কাগজখানি স্বরাজ্যদল ভুক্ত কয়েকটী ভদ্রলোকের "ব্যবসায়" হইবে, না উহা সমগ্র স্বরাজ্যদলের কাগজ হইবে অর্থাৎ উহার লাভ ক্ষতির জন্য ও মতামতের জন্য সমগ্র স্বরাজ্যদল দায়ী থাকিবেন কি না? এ সম্বন্ধে স্বরাজ্যদল একটা প্রকাশ্য ঘোষণা না দিলে ব্যাপার ঠিক বুঝা যাইবে না।'

নবযুগ[৮] (সচিত্র সাপ্তাহিক) পত্রিকায় 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা' কলমে সেকালের একটি কাগজ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছিল। আলোচনাটি এখানে উল্লেখ করা হলো:

'শ্রমিক—শ্রীযুক্তা সন্তোষকুমারী গুপ্তা সম্পাদিত শ্রমজীবি সম্প্রদায় সংক্রান্ত সাপ্তাহিক। গত ১২ই জুলাই তারিখে দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইল। পত্রিকাখানি সুসম্পাদিত হইতেছে ও শ্রমজীবি সম্প্রদায়ের অভাব অভিযোগ হইতে বিশেষরূপে আলোচিত হইতেছে কিন্তু সাধারণের নিকট যে পরিমাণ সহানুভূতি পাইবার ইহা যোগ্য তাহা ইহা পাইতেছে বলিয়া বোধ হয় না। অথচ আমাদের দেশে শ্রমিকের সংখ্যাই বেশী—তাহাদের কর্ত্তব্য ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া ইহার উন্নতি বিধানে যত্নবান হওয়া। আমরা শ্রমিকের ক্রমোন্নতি প্রার্থনা করি।'

নবযুগে[৯] (সচিত্র সাপ্তাহিক) পত্রিকায় প্রকাশিত আর একটি লেখা ঃ

'দেশবন্ধুর আপন বাটী ঃ স্মৃতি-ভাণ্ডারের আদায়ী টাকা হইতে বোর্ড অব ট্রাষ্টির সম্মতি ক্রমে কোষাধ্যক্ষ— স্যার রাজেন্দ্রনাথ দেশবন্ধুর আবাস বাটী সংক্রান্ত সমস্ত দেনা মায় সুদ পরিশোধ করিয়া দিয়াছেন। অনেকে হয়তো বলিবেন দশলাখ টাকা উঠিবার পূর্ব্বেই দেনা শোধের এত তাড়া কেন ? আমরা কিন্তু কাজটী বড় বুদ্ধিমানের কাজ মনে করি এবং স্যার রাজেন্দ্রের ন্যায় ব্যবসায়ী-কুলোতিলকের যোগ্য ভাবি। টাকা হাতে থাকিতে অনর্থক সুদ বাড়াইয়া মহাজনের পেট ভরান কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নয়— সমস্ত টাকা উঠিলে যাই কিছু করা হোক না কেন দেশবন্ধুর বাটীখানি তো রাখিতেই হবে –তা যদি হয় তবে বিলম্বের পরিবর্ত্তে 'শুভস্য শীঘ্রং'ই বাঞ্ছনীয়।'

নবযুগে[১০] (সচিত্র সাপ্তাহিক) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল বর্ধমানের 'শক্তি' পত্রিকা প্রসঙ্গে আলোচনা। সেই লেখা এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

'শক্তি—সাপ্তাহিক। বর্ধমান হইতে প্রকাশিত। মফস্বলের প্রায় সাপ্তাহিকই কেবল নীলামী ইস্তাহারে ভরা থাকে। লেখার দিকটা একেবারেই উপেক্ষিত হয় কিন্তু পড়িয়া দেখিলাম "শক্তি" সে শ্রেণীর কাগজ নহে—ইহাতে সত্য সংবাদ পত্রের অনেক লক্ষণ বেশ পরিস্ফুট আছে। শক্তি কলিকাতার অনেক সাপ্তাহিকের চেয়েও ভাল আর একটা শুভ লক্ষণ দেখা গেল যে ইহা কোন একটা দলের কাগজ নয়—ইঁহারা সত্যের সম্মান রাখিতে বদ্ধপরিকর। আমরা সহযোগীর দীর্ঘজীবন কামনা করি।'

জয়শ্রী (সচিত্র মাসিক পত্র), চতুর্থ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা আষাঢ় ১৩৪১ সাল সম্পাদিকা ঃ বীণাপাণি রায়. কার্য্যালয় ঃ ২৩নং ওয়ার স্ট্রীট, উয়ারী, ঢাকা। প্রতি সংখ্যা কাগজের দাম—ছয় আনা।

'জয়শ্রী' পত্রিকার 'বিচিত্রা' কলমে ছাপা হতো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার কিছু কিছু অংশ। জয়শ্রী[১১] পত্রিকায় প্রকাশিত একটি লেখা এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

'অন্তরীণে শান্তিসুধা ঘোষ

বরিশাল, ৯ই মে। কলিকাতার ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউটের অধ্যাপিকা কুমারী শান্তিসুধা ঘোষ, এম-এস-সি গতকল্য এখানে পৌঁছিয়াছেন। তাঁহার প্রতি সহরের অন্তর্গত আলেকান্দা অঞ্চলে স্বগৃহে অন্তরীণ থাকার আদেশ প্রদত্ত হয়। ষ্টিমার ষ্টেশনে পৌঁছিলে তাঁহাকে কোতোয়ালী থানায় লইয়া যাওয়া হয়। সেখান হইতে তিনি গৃহে গমন করেন।

তাঁহার উপর নিম্নলিখিত আদেশ জারি হইয়াছে—

১. তিনি নির্দিষ্ট এলাকার বাহিরে যাইতে পারিবেন না। ২. সন্ধ্যা ৬টা হইতে সকাল ৬টা পর্য্যন্ত নিজ আবাসস্থলের এলাকার মধ্যে বাস করিতে

হইবে। ৩. নিজ আত্মীয় ব্যতীত কোন বিদ্যালয়ের ছাত্রী অথবা অন্য কোন ব্যক্তির সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে পারিবেন না। ৪. প্রতি সপ্তাহে একবার স্থানীয় থানায় হাজিরা দিতে হইবে। কুমারী শান্তিসুধা ঘোষকে গ্রিণ্ডলে ব্যাঙ্ক প্রতারণা মামলা সম্পর্কে অপর প্রায় ৫০ জন তরুণ-তরুণীর সহিত গ্রেফতার করা হয়। চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করেন। কিন্তু, মুক্তির পর বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুযায়ী তাঁহার প্রতি বরিশালে স্বগৃহে অন্তরীণে থাকার আদেশ প্রদত্ত হয়।

—মোহম্মদী'

জয়শ্রী[১২] পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি বিখ্যাত পত্রিকার বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনটি হলো এই ঃ

'ঢাকা হইতে প্রকাশিত সচিত্র সাপ্তাহিক সোনার বাংলা। বহু প্রবন্ধ, গল্প, কবিতায় সুসমৃদ্ধ হইয়া প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক—শ্রীনলিনীকিশোর গুহ, প্রতি সংখ্যা এক আনা, বার্ষিক মূল্য—চার টাকা।'

সেকালে 'জয়শ্রী' পত্রিকায় ছাপা হতো গ্রন্থ পরিচয়। এই কলমে বিভিন্ন ধরণের নতুন বইয়ের যেমন সমালোচনা প্রকাশিত হতো, ঠিক তেমনি নিয়মিতভাবে ছাপা হতো নতুন বাংলা পত্র-পত্রিকার সংবাদ। জয়শ্রী[১৩] পত্রিকায় বেরিয়েছিল 'শ্রীহর্ষ' পত্রিকার সমালোচনা ঃ

'শ্রীহর্ষ—ছাত্র ও ছাত্রী সমাজ কর্তৃক পরিচালিত। ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা (গ্রীষ্ম)। একখানি ঋতু-পত্রিকা। যে উদ্দেশ্য লইয়া পত্রিকাখানি প্রকাশিত হইয়াছে, উহা সবিশেষ প্রশংসনীয়। শরৎচন্দ্রের আশীর্ব্বাণী ও প্রমথ চৌধুরীর "প্রশস্তি" নিয়ে আরম্ভ হইয়াছে। প্রবন্ধ, কবিতা, গল্পের সমাবেশ বেশ উপভোগ্য। সম্পাদকীয়, নানা বিভাগের আলোচনা রীতিমত উচ্চ শ্রেণীর। পত্রিকাখানা পড়িয়া আমরা আশাতিরিক্ত সন্তোষ লাভ করিয়াছি। বাংলার ছাত্র-ছাত্রী সমাজের সমবেতভাবে সাহিত্য প্রচেষ্টা এই প্রথম, কিন্তু নগণ্য নহে। ইহাদের সাফল্য কামনা করি।'

জয়শ্রী[১৪] পত্রিকার 'আলোচনী' কলমে লেখা হয়েছিল ঃ

'রাজবন্দী দিবস ও সংবাদপত্র

প্রেস ও বক্তৃতার স্বাধীনতা অন্যতম পৌরাধিকার কিন্তু ভারতবর্ষ সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত। ইতিপূর্ব্বে বহু প্রকারে সংবাদপত্রের ও দেশবাসীর কণ্ঠরোধ করিবার আয়োজন হইয়াছে।

বিগত ১৯মে সোমবার নিখিল ভারত রাজবন্দী দিবস বলিয়া ঘোষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সরকার এক ঘোষণা জারী করিয়াছিলেন যে এতৎ সম্পর্কে কোন সংবাদাদি সংবাদপত্রে বাহির হইতে পারিবে না। এই উপলক্ষে যে সকল সভাসমিতির অধিবেশন হইবে, সংবাদপত্রে তাহাদের

কোনও রূপ উল্লেখও নিষিদ্ধ হইয়াছে। সরকারের উপরোক্ত আদেশের প্রতিবাদ স্বরূপে সংবাদ পত্র সমূহ একদিন বন্ধ ছিল। সরকারের আশংকা ছিল যে ইহাতে বিপ্লববাদের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। কিন্তু দেশের সংবাদপত্র সমূহে ও জনসাধারণ বিপ্লববাদের পোষকতা না করিয়া সর্ব্বদা বিরুদ্ধ মতই প্রকাশ করিতেছেন, এ শুধু মানবতার দিক দিয়া চেষ্টা ; এই রাজবন্দীদের সম্বন্ধে দেশবাসী বিশেষরূপে আলোচনা করিবার ও তাহার প্রকাশের স্বাধীনতা দিলে সরকারের মর্য্যাদা বাড়িত, তাহার ন্যায়পরায়ণতার উপর সকলের শ্রদ্ধা জন্মিত।'

কলিকাতা কর্পোরেশনের কমার্শিয়াল মিউজিয়াম ও প্রচার বিভাগের মুখপত্র ছিল—'কলিকাতা'। 'কলিকাতা' ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা। শিল্প ও বাণিজ্য, স্বাস্থ্য ও পৌরতত্ত্ব নিয়ে লেখা হতো। মূল্য প্রতি সংখ্যা এক আনা। ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল—৪ঠা সেপ্টেম্বর শনিবার, ১৯৩৭ সাল। কলিকাতার মেয়র সনৎকুমার রায়চৌধুরী[১৫] 'কলিকাতা' কাগজে লিখেছিলেন। সেই লেখার কিছু অংশ হলো এই ঃ

'এখনকার দিনে লোক নিজের কাজে এত ব্যস্ত যে কলিকাতায় কোথায় কি পৌরব্যবস্থা হইতেছে, কোথায় কি শিল্প আছে, কি হইতেছে এবং কি পাওয়া যাইতে পারে, তাহার সংবাদ রাখা দুষ্কর। ঐ সকল খবর লোকের ঘরে পৌঁছাইয়া দিতে পারিলে তাহাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়। কলিকাতা-বাসীর জানা উচিত পৌর প্রতিষ্ঠান কি কার্য্য করিতেছে, সহরবাসীদের সুবিধার জন্য কি কি ব্যবস্থা করিয়াছে এবং আরও কি ব্যবস্থা হওয়া উচিত। ..'

কলিকাতা[১৬] পত্রিকায় 'সহরের চিঠি' কলমে ছাপা হয়েছিল—'কলিকাতায় মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরীর অভাব' নিয়ে লেখা। ওই লেখার কিছু অংশ হলো এই ঃ

'আমরা কলিকাতার মত বড় সহরে বাস করি বটে, কিন্তু অতি দুঃখের সহিত বলিতে হয় যে এখনকার এই বিরাট কলিকাতা কর্পোরেশন কর্ত্তৃক পরিচালিত একটি লাইব্রেরীও এখানে নাই। কলিকাতা কর্পোরেশন কলিকাতার বহু সংখ্যক লাইব্রেরীকে বার্ষিক অর্থ সাহায্য দান করেন বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে একটিও প্রকৃত লাইব্রেরী নামের উপযুক্ত নহে।...'

স্বরাজ[১৭] (শারদীয়া সংখ্যা) ১৩৫৩, সম্পাদকীয় লেখা এখানে উল্লেখ করা হলো,ঃ

'শারদ লক্ষ্মীর আবির্ভাব বাঙ্গালীর জীবনে জাগাইয়া তোলে পুলকচঞ্চল আশা-আকাঙ্ক্ষার নূতন স্পন্দন। বর্ষণ-শেষে ধরিত্রীর প্রসন্ন পরিবেশের সংকেত যখন আনন্দময়ীর আগমনী ঘোষণা করে, দৈন্য, দুঃখ ও লাঞ্ছনা ভুলিয়া বাঙ্গালী মাতিয়া উঠে মাতৃপূজার অকাল বোধনে, যথাশক্তি

উপাচার-উপহারে, মহাদেবীর অর্চ্চনা করিয়া ষড়-ঐশ্বর্য্যশালিনী জগন্মাতার অভয় আশীষ শিরে লইয়া লাঞ্ছনা-কণ্টকিত জীবন পথে নবোদ্যমে যাত্রা শুরু করে।

বাঙ্গালীর গৃহ-প্রাঙ্গণে এবারেও দশভূজা আবির্ভূতা হইয়াছেন। আনত-শীর্ষ ধান্য-মঞ্জরীর অভিবাদন জানাইয়াছে বঙ্গলক্ষ্মী। তার বরণ ডালির আয়োজন নিখুঁত। কিন্তু মায়ের বহু প্রতীক্ষিত আগমনে হতভাগ্য কোটি কোটি সন্তান আজ মনে প্রাণে পুলকিত হইতে পারিতেছে না—সংশয় জাগিতেছে মা সত্যই আসিয়াছেন কি না। বন্যা, মারী, অর্দ্ধাশন, অনশন বিঘ্নিত বাঙ্গালী জীবনে অকস্মাৎ দেখা দিয়াছে ভ্রাতৃ-বিরোধের সর্ব্বনাশা প্রমত্ততা। আততায়ীর উদ্যত শাণিত ছুরিকায় কণ্টকিত জীবনের প্রতি পদক্ষেপ। পশ্চাতে দৃষ্টি ফিরাইলে স্মৃতিপটে ভাসিয়া ওঠে হিংস্র বর্ব্বরতার জিঘাংসায় মানবতার ঘৃণ্যতম লাঞ্ছনার নৃশংস দৃশ্য। দৈনন্দিন জীবনের পরিবেশ সমাচ্ছন্ন শঙ্কা, সংশয় ভ্রাতৃ-বিদ্বেষের বিষবাষ্পে।

মরণ জয় সংকল্প, স্মরণীয় আত্মত্যাগ, শোণিতাঞ্জলির মূল্যে জাতি আজ শতাব্দীর শাপমুক্তির সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান—দিগন্তে স্বাধীনতার অরুণচ্ছটা। দাসত্ব মুক্তির প্রাক্কালে এ কী আত্মঘাতী মূঢ়তা! শোণিতাঞ্জলি ত' কম হয় নাই। ষাট বছরের ইতিহাস আজ সাক্ষী। তবে কেন এই ভ্রাতৃ-পীড়নের সর্ব্বনাশা নেশা।

যে তমিস্রা ভ্রাতৃ-বিরোধের কালিমাময় কলঙ্কে মোহান্ধ জাতির জীবন পঙ্গু করিতে উদ্যত হইয়াছে, তোমার আশীষ সমৃদ্ধ সন্তানের কখনই তা বিধিলিপি হইতে পারে না, কল্যাণময়ি! মোহান্ধ সন্তানদের কল্যাণের পথের নিশানা দাও। তোমার সন্তান অমরত্বের দাবী রাখে,—তাদের অমৃতের সন্ধান দাও। জাগাও সৌভ্রাত্র্য, প্রীতি, ভালবাসার শুভবুদ্ধি। তোমার কল্যাণশক্তির অমৃতপরশে দূর করো সর্ব্বশঙ্কা ভয়!

আজ জাতির জীবনে ঐতিহাসিক মুহূর্ত্ত। এই যুগসন্ধিক্ষণে কোন ভুল, কোন ভ্রান্তি, কোন ত্রুটি ঘটিলে সার্দ্ধ শতাব্দীর সাধনার ভরাডুবি হইতে পারে। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া তোমার অভয়বাণী মৃত্যুঞ্জয় হইবার প্রেরণা দান করিয়াছে। আজও তোমার অভয়বাণীর বর্ম্মে সন্তানদের দাসত্ব মুক্তির শেষ সংগ্রামে নিঃশঙ্ক করো।

শোষণমুক্ত মহাভারতে মহাজাতি গঠনের দুর্জ্জয় সংকল্প লইয়া যে মৃত্যুঞ্জয় অভিযাত্রীদল বলদৃপ্ত অন্যায়ের শিরে কঠিন আঘাত হানিয়াছে, তাহাদের জয়যাত্রার অবশিষ্ট পথ ভেদবুদ্ধি মুক্ত করো। তোমার ষড়-ঐশ্বর্য্যশালিনী মাতৃমূর্ত্তি ধ্রুবতারা করিয়া যাহারা দুস্তর পথ অতিক্রম করিবার দুঃসাহস করিয়াছিল, আজ তাহারা মন্দিরের তোরণদ্বার অতিক্রম

করিতে চলিয়াছে—মাতৃমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার পথ নিরঙ্কুশ করিয়া মুক্তি সাধকদের বঞ্চিতের দেশে প্রাচুর্য্যময় গণজীবন প্রতিষ্ঠার শক্তি দাও ! —বন্দেমাতরম্'

'কল্লোল' মাসিক পত্রিকা। কল্লোলের কার্য্যালয়—১০/২, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা। আশ্বিন ১৩৩৩ সালের সংখ্যায় সম্পাদক—দীনেশরঞ্জন দাশ। কাগজের দাম—প্রতি সংখ্যা চার আনা।

কল্লোল[18] পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল একটি সংবাদ। ওই সংবাদের কিছু অংশ হলো এই ঃ

বহুকালাবধি শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় কল্লোলে লিখিতেন। প্রায় প্রতি মাসেই তাঁহাদের রচনায় কল্লোলের শোভা ও সম্পদ বাড়িত। এ বৎসর হইতে "কালিকলম" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিই এই কাগজখানির সম্পাদন ভার গ্রহণ করিয়াছেন।...'

কলিকাতার তালতলা অঞ্চল থেকে প্রকাশিত হতো—'উদয়ন' পত্রিকা। উদয়ন ছিল সচিত্র মাসিক পত্র। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হবার পরে যথেষ্ট সাড়া পড়েছিল। প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল—বৈশাখ—১৩৪০ সালে। পরিচালক ও সম্পাদক ঃ অনিলকুমার দে, বার্ষিক মূল্য—চারি টাকা আট আনা। উদয়ন কার্যালয়—৭৯/৯, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। পত্রিকার জন্য 'আশীর্বাদ' পাঠিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

'যেন প্রসারিয়া উদয় রশ্মিজাল / বৈজয়ন্তী মেলে দিগন্তরাল। / কলির কলুষে কালো মেঘ যত সব / আলোকের যেন না ঘটায় পরাভব, / কুয়াশায় যেন ম্লান নাহি হয় ভাল। —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'

উদয়ন[19] পত্রিকায় 'সাময়িকী' কলমে ছাপা হয়েছিল স্বদেশী প্রদর্শনীর সংবাদ ঃ

'গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর "ওয়েলিংটন পার্কে" স্বদেশী প্রদর্শনীর উদ্বোধন-কার্য্য শেষ হয়ে গেছে। ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার কল্পে এই প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা আছে। স্বদেশজাত দ্রব্যের ভারতীয়গণের মধ্যে যাতে বহুল প্রচার হয় তার চেষ্টা ভারতবাসীমাত্রেরই করা উচিত। প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন কালে কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু মহাশয় বলেন, "আজ বাঙলায় তথা ভারতব্যাপী স্বদেশী ব্রত গ্রহণ করিবার যে সাধনা চলিয়াছে, তাহার মূল-মন্ত্র এই বাঙলা দেশের তপোবন হইতে প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল···সুতরাং এই স্বদেশী প্রদর্শনী বাঙলার সম্পূর্ণ নিজস্ব।" 'পূজার আগমনে যখন পণ্য বীথিকার দ্বারে দ্বারে জনসমাগমের বিপুল স্রোত বয়ে যাচ্ছে, তখন বোধ হয় এরূপ একটা বিরাট বিপণীর আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যাবে না। নীতি শিক্ষার দিক দিয়াও আমরা আবার ইহার

বিরাট প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারি। দেশের শিল্প, বাণিজ্য, ব্যবসা ও শিক্ষা বিষয়ে আমাদের কত অভাব আছে, তা অনায়াসে এখানে বোঝাবার যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতের নারী প্রগতির ইতিহাস জ্বলন্ত অক্ষরে প্রবেশ-পথের অদূরে রক্ষিত হয়েছে। স্বাস্থ্যতত্ত্বের অতি পুরাতন বিষয়গুলিও বিশদভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। অন্যান্য দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় ব্যবসা-বাণিজ্যে ও শিক্ষা ক্ষেত্রে যে আমরা কত হীন হয়ে পড়েছি, তারও আভাষ যথেষ্ট পাওয়া যাবে। এই অতি সত্যতত্ত্ব প্রচার করে চলেছেন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তাঁর এ শক্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়ে আত্মবিস্মৃত জাতিকে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে টেনে নিয়ে আসুক। বাঙলার তথা ভারতের মুমূর্ষু কুটির-শিল্পকে সঞ্জীবিত করবার এই অভিনব উদ্যম সার্থক হয়ে উঠুক।'

'ক্লাইভ স্ট্রীট' পত্রিকা ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল—বৈশাখ ১৩৪০ সালে। যুগ্ম সম্পাদক: মণীন্দ্রমোহন মৌলিক, সুধাংশু বিকাশ রায়চৌধুরী। ১৪নং ক্লাইভ স্ট্রীট হইতে নকুলেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত হতো। ২৫৯ অপার চিৎপুর রোড, শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্ক থেকে কাগজ ছাপা হতো।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর[২০] লিখেছিলেন:

'যে জাতির মধ্যে শিল্প নেই, বাণিজ্যও নেই সে জাতির মতো লক্ষ্মী-ছাড়া জাত আর দুটি নেই।

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" পণ্ডিতের কথা; কিন্তু যে লক্ষ্মীছাড়া জাতি কেবলি বিদেশী শিল্পদ্রব্যের বাণিজ্য ক'রে বড় মানুষ হ'বার দিকে চলেছে সে জাতি লক্ষীমন্ত কিন্তু শ্রীমন্ত বলে তাকে ভুল করা চলে না।

আবার যে জাতি স্বদেশের শিল্প থাকতে বিদেশী শিল্পের বোঝা পিঠে বহে বাজারে ফেরে তার বিশেষণ অভিধানের পাতায় নেই। আবার স্বদেশী শিল্পকে আপসে বর্জ্জন ক'রে বিদেশীর সাজে সেজে যে নেতা সকল বিদেশীর বর্জ্জনের কথা বলে বেড়ান তারা যেমন বিশ্বাসের পাত্র নয়, তেমনি অন্যদিকে স্বদেশী চটের থানুকে পিরহানের কাজ করিয়ে নিয়ে ঘোরতর স্বদেশী হবার উপদেশ দিয়ে চলেন তারা ঘোরতর রকমে শিল্প-বিদ্বেষী—তাদের কাছ থেকে শতহস্ত দূরে থাকাই শ্রেয়ঃ। রাজা যখন শিল্পীর উপর ফরমাস খাটায় তখন জানবে শিল্পের ঘোরতর সঙ্কট উপস্থিত।'

'গুলিস্তাঁ' ছিল সচিত্র মাসিক পত্রিকা। কাগজে লেখা থাকত: 'মুসলিম বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাময়িক পত্র'। ১ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৩৯ সালের সংখ্যায় সম্পাদক: এস, শামশের আলী, এস, আবদুর রউফ, শেখ মোহম্মদ ইদরিস আলী; প্রকাশক: এস, এনসান আলী। গুলিস্তাঁ দপ্তর:

৬৮নং ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা। গুলিস্তাঁ[২১] পত্রিকায় 'আমাদের আরজ' কলমে প্রকাশিত একটি লেখার কিছু অংশ :

'যে অভাব প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালী পাঠক এতদিন ধরে অনুভব করে আসছিলেন এবার তা' পূরণ হতে চললো। মুসলিম কালচারের মালঞ্চরূপে 'গুলিস্তাঁ' পাঠক সমাজের চিত্ত বিনোদনের জন্য আজ বাংলা সাহিত্যে আত্ম-প্রকাশ করলো। প্রত্যেক সহৃদয় হিন্দু এবং প্রত্যেক সমাজ প্রেমিক মুসলিম এই নিয়ে আফসোস্ করেন যে, যে বাংলাদেশে প্রায় তিন কোটী মুসলমানের বাস, সে দেশের সাহিত্যে মুসলিম-সভ্যতার আদর্শ এখন পর্য্যন্ত উপযুক্তভাবে আত্ম-প্রকাশ করেনি। আমরা সেই অভাব মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছি বলেই এই গুলিস্তাঁ নিয়ে পাঠকদের দ্বারে উপস্থিত হলুম। আশা করি, নূতন এই মেহমানকে তাঁরা সাদরে এস্তেকবাল করবেন।

গুলিস্তাঁ কোন সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থ-সাধনের চেষ্টা করবে না। তার সাধনার লক্ষ্য হবে, যে মুসলিম কাল্চার হচ্ছে বিশ্বসভ্যতার অন্যতম গৌরবের জিনিষ, সেই কাল্চারের স্বরূপকে বাংলা সাহিত্যে সুপ্রকট করে তোলা ; আর সেই কাল্চারকে বাঙ্গালী মুসলিমের জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। তবে মুসলিম কাল্চারের মিশন নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেও বিশ্বের বিভিন্ন কাল্চারের উপযুক্ত সম্মান করতে এবং সেই সব কাল্চার থেকে প্রেরণা শিক্ষা ও আনন্দ আহরণ করতে গুলিস্তাঁ কখনও পরাঙ্মুখ হবে না। পক্ষান্তরে সংকীর্ণ এবং একদেশদর্শী সাম্প্রদায়িক মানসিকতাকে গুলিস্তাঁ নিজের পুষ্পক্ষেত্র থেকে দূরে রাখবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিবে না। ..'

গুলিস্তাঁ পত্রিকায় বিভিন্ন সংখ্যায় লিখেছিলেন : এস. ওয়াজেদ আলী, কাজী নজরুল ইসলাম, জসিম উদ্‌দীন, গোলাম মোস্তাফা, মোহাম্মদ মনসুর উদ্দীন, রাসবিহারী মণ্ডল, বন্দে আলী মিয়া, প্রফুল্লকুমার মণ্ডল, সুরবালা বিশ্বাস, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বাণীকুমার, অমিয় রায়চৌধুরী, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, কাদের নওয়াজ এবং আরও অনেকে।

ঢাকা থেকে শ্রাবণ মাসের ১৩৩০ সালে প্রথম খণ্ড ছাপা হয়েছিল—'প্রাচী' মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক : সুশীলচন্দ্র বসু, সহ-সম্পাদক : মনোরঞ্জন চৌধুরী। প্রাচী-অফিস : ৪, কোর্ট হাউস রোড, ঢাকা। কাগজ ছাপা হতো—'ঢাকা ভিক্টোরিয়া প্রেস' থেকে। প্রকাশকের নাম : শ্যামলাল গুহ। প্রতি সংখ্যা 'প্রাচী' আট আনায় বিক্রী হতো।

প্রাচী[২২] পত্রিকার 'সম্পাদকের দপ্তর' কলমে ছাপা হয়েছিল :

'জেলে নিয়ম অমান্য করিলে বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থা আছে। রাজনীতিক বন্দীদের সম্বন্ধে ইহা প্রযুক্ত হয়। অসহযোগী বন্দীদের জেলের নিয়ম ভঙ্গ করা সম্পর্কে আমাদের অভিমত আমরা গত মাসের "প্রাচী"তে ব্যক্ত করিয়াছি।

বেত্রদণ্ড সভ্যতানুমোদিত নহে, ইহা দ্বারা মনুষ্যত্বের হানি হয় বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি সুতরাং কোন অপরাধের জন্যই বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থায় আমরা অনুমোদন করিতে পারি না। বাঙ্গালা কাউন্সিলের বে-সরকারী সভ্যগণের চেষ্টায় জেলে বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থা তুলিয়া দিবার প্রস্তাব সে দিন গৃহীত হইয়াছে। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে একটা দুর্নীতি দূর হইবে। সরকার পক্ষে এই প্রস্তাবের প্রতিকূলতাচরণ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এইরূপ একটা ব্যাপারেও যে বাঙ্গালা সরকারের তরফ হইতে প্রতিবাদ হইল, ইহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টে যে প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট অত্যন্ত কাঠখোট্টা এবং সেকেলে বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছিল তাহা খুবই সত্য।'

সেকালের একটি বিখ্যাত পত্রিকার নাম—'পথ'। এই পত্রিকা ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল—মাঘ ১৩৩৭ সালে। সুনীলকৃষ্ণ রায়চৌধুরী কর্তৃক ২১নং বলরাম ঘোষ স্ট্রীট 'পুরাণ প্রেস' থেকে মুদ্রিত হতো। ২৮এ রাণী হেমন্তকুমারী স্ট্রীট, কলকাতায় ছিল পথ কার্য্যালয়। এই কাগজে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও জনশিক্ষার জন্য বিভিন্ন ধরণের লেখা ছাপা হতো।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা লেখা হতো যে সব পত্র-পত্রিকায় সেই সব অধিকাংশ কাগজের কথা উল্লেখ করা হলো। তা' ছাড়া যে সব কাগজ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লিখতেন, এবং জনশিক্ষার জন্য চেষ্টা করতেন, সেই সব পত্র-পত্রিকার মধ্যে ছিল ঃ 'গুলিস্তাঁ' এবং 'পথ'।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ[২৩] লিখেছেন।

'I need not give a long list of journalists and others connected with the Press who had to suffer sacrifices for that work. And it would not be superfluous to mention that in 1942, not only the Editor of the *Bharat* and of the *Harijan* (Bengalee) were imprisoned but also clerks and compositors in any way connected with the papers.'

'কাশীপুর নিবাসী' প্রকাশিত হতো বরিশাল (বর্তমানে বাংলাদেশ) থেকে। এই কাগজ ছিল সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র। সম্পাদক ঃ অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়। কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় অক্ষরে লেখা হতো ঃ (রায়সাহেব প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১২৮২ সালে প্রবর্ত্তিত)। ১৯৪৬ সালে প্রতি সংখ্যা কাগজের দাম ছিল চার আনা। এই কাগজে ছাপা হতো ঃ বিজ্ঞাপন, নিলাম ইস্তাহার ইত্যাদি থাকতো বেশী। তা' ছাড়া স্থানীয় জমিদারদের কথা, ছোট প্রবন্ধ, কবিতা ছাপা হতো। এই পত্রিকা ছিল ইংরেজ ভক্ত। কাগজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন 'রায়সাহেব' উপাধিধারী। কাশীপুর নিবাসী[২৪] পত্রিকায় প্রকাশিত, 'নববর্ষ' প্রসঙ্গে একটি লেখার কিছু

অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো। এই লেখা থেকে জানা যাবে এই পত্রিকার পরিচালকদের ইংরেজ প্রীতির কথা ঃ

'...সেই পরমারাধ্য পিতৃদেবের আশীর্ব্বাদ এবং দেশবাসীর শুভেচ্ছা একমাত্র সম্বল করিয়া আমি কর্ম্মক্ষেত্রে যাত্রা করিলাম, আমার যাত্রাপথে মহামান্য সম্রাট-সম্রাজ্ঞী, রাজপুরুষ, গ্রাহক, অনুগ্রাহক, সহযোগীবৃন্দ ও দেশবাসীর নিকট আমাদের সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি।......'

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল The Hare School Magazine[২৫] কাগজে। লেখাটি হলো এই ঃ

'*Editorial Notes*

Death of a Veteran Bengali Journalist —

We deeply regret to announce the death of Babu Panchcowrie Banerjee who died at his Calcutta residence on November last, at the age of 57, causing an irreparable loss to the Bengali Literature. He was a Veteran journalist, being editor of many periodicals and dailies in Bengal, among which may be mentioned—the *Nayaka,* the *Hitabadi,* the *Sahitya* and the *Bangabasi.* Bengali was his forte There is no paper in Bengal which did not feel honoured by some contributions from his able pen. Nor was he less versed in English He gave best proof of it as sub-editor not only of the "Telegraph", but of the "Bengalee'

'বঙ্গবাণী' পত্রিকার কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। 'বঙ্গবাণী' ছিল দৈনিক সংবাদ পত্র। ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৩১ সালে সম্পাদক ছিলেন—বিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত। সত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ প্রেস, ১৯নং বৃটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট, কলিকাতা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতো। ওই সময় আট পৃষ্ঠার কাগজের দাম ছিল দু-পয়সা।

বঙ্গবাণী[২৬] কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল 'নবশক্তি'র মামলার সংবাদ। সেই সংবাদটি হলো এই ঃ

'নবশক্তির মামলা

হাইকোর্টে আপীল গ্রাহ্য

"নবশক্তি" পত্রিকার "বন্দুক সরকার" শীর্ষক একটি কবিতা প্রকাশ করার জন্য পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায়চৌধুরী এবং মুদ্রাকর শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার রাজদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে প্রত্যেকে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। ঐ দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে তাঁহাদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু,

মণীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, ভূতনাথ রায়, রামদাস মুখার্জী এবং পরিমল মুখার্জী হাইকোর্টে আপীলের দরখাস্ত করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বসু কবিতাটির অনুবাদ পেশ করিয়া বলেন যে, উহা রাজ-দ্রোহাত্মক আদৌ নয়, কারণ সরকারের ব্যয়-বাহুল্য নীতির সমালোচনা মাত্র উহাতে করা হইয়াছে এবং তাহাও করা হইয়াছে ব্যঙ্গ করিয়া। কবিতাটির মূল কথা হইল এই যে, দুর্ব্বল অনশনক্লিষ্ট আশ্রয়হীনদের শাসনের জন্য সৈন্য সামন্ত কামান-বন্দুকের প্রয়োজন নাই।

বিচারপতি লর্ট উইলিয়ম এবং এস, কে, ঘোষ আপীল গ্রাহ্য করিয়াছেন। জামিনের কথা উঠিলে বিচারপতিদ্বয় বলিয়াছিলেন যে উক্ত দুই ব্যক্তি জমিনে মুক্ত থাকা কালীন রাজদ্রোহকর কিছু প্রকাশ করিবেন না বলিয়া সর্ত্ত দিলে তবে তাঁহারা তাঁহাদিগকে মুক্তি দিতে পারেন। কিন্তু সম্পাদক ও মুদ্রাকর ঐরূপ সর্ত্ত দিতে রাজী না হওয়ায় তাঁহারা মুক্ত হইতে পারেন নাই।

বিচারপতিদ্বয় নির্দ্দেশ দিয়াছেন—আপীলের শুনানী শীঘ্রই শেষ করিতে হইবে, এক মাসের মধ্যে শুনানী আরম্ভ হইবে।

[নবশক্তির সম্পাদক ও মুদ্রাকরের জামীন সম্পর্কে বিভিন্ন সংবাদপত্রে ভুল ছাপা হইয়াছে, বঙ্গবাণীতেও যথার্থ সংবাদ লেখা সত্ত্বেও সংবাদটি ছাপার ভুলে বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। উক্ত সম্পাদক ও মুদ্রাকর বিনাসর্ত্তে জামীন না পাওয়ায় হাজতবাস করিতেছেন—বঃ সঃ]'

বঙ্গবাণী[২৭] পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল আনন্দবাজার পত্রিকার মামলার সংবাদ। সেই সংবাদটি হলো এই ঃ

'আনন্দবাজার পত্রিকার মামলা
সংবাদপত্রের কর্ত্তব্য
শ্রীযুক্ত তালুকদারের বিতর্ক

গত কল্য ডিসেম্বর তারিখে "আনন্দবাজার" পত্রিকায় "মুন্সীগঞ্জ" শীর্ষক যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, তাহাতে রাজদ্রোহ প্রচার করা হইয়াছে বলিয়া উক্ত পত্রিকার সম্পাদক ও মুদ্রাকর শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র সেন অভিযুক্ত হইয়াছেন। গত শনিবার এই মামলার আর একদফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। আসামী পক্ষে ছিলেন শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র তালুকদার এবং জে. এস. সেনগুপ্ত।

শ্রীযুক্ত তালুকদার বলিয়াছেন, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে ভূতপূর্ব্ব সৈন্য আনাইয়া পিটুনী পুলিশ বসানো হইবে—এ সংবাদে "ফ্রী প্রেস" মারফৎ প্রচারিত হইয়াছিল; এ সংবাদে দেশে খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। সংবাদপত্রের কর্ত্তব্য হিসাবে "আনন্দবাজার" ঐ সংবাদের উপর মন্তব্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কেন না তাহাতে সরকারী নীতির পরিবর্ত্তন হইবে, এই আশা উপায় পত্রিকার ছিল। পরদিন এসোসিয়েটেড প্রেস

সংবাদটি ভিত্তিহীন বলিয়া প্রচার করেন ; উহাও আনন্দবাজারে বিশিষ্ট স্থান দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছিল। ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার এই ব্যাপারের তদন্ত করিয়াছিলেন. সে সংবাদও আনন্দবাজারে পরে প্রকাশ করা হইযাছে। সাধারণ জ্ঞানে এখন ইহাই বুঝা যায় যে, পত্রিকা মারফৎ আন্দোলনের ফলেই ব্যাপারটা এতদূর গড়াইয়াছে। দিবারাত্র যখন তখন গবর্ণমেণ্টের নির্জ্জলা প্রশংসা করা সংবাদপত্রের কাজ নয়। দাস মনোবৃত্তি নিযা যে পত্রিকা চলে তাহার দ্বারা জাতির সমূহ সর্ব্বনাশেব সম্ভাবনা। নির্ভযে ত্রুটি দেখাইয়া সরকারের নীতির সমালোচনা করা সংবাদপত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য।

শ্রীযুক্ত তালুকদাব অতঃপর বলেন যে, প্রবন্ধটি আদৌ রাজদ্রোহের ধাবায় পড়ে না।

বঙ্গবাণী[২৮] পত্রিকায় 'বিচিত্রা' কলমে ছাপা হয়েছিল একটি লেখা। সেই লেখাটি এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

গত আশ্বিন মাসে বাড়ীতে বাড়ীতে যখন দুর্গাপূজার ধুম চলিতেছিল সেই সময কটকে মহাত্মাজীর একজন পরম ভক্ত তাঁহার ঘরের নিভৃত কোণে মহাত্মাজীর মাটির মূর্ত্তি পূজা করিযাছিলেন। তাবপব যথারীতি তিনি ঐ মূর্ত্তিটি নিয়া মিছিল করিয়া তবে উহার বিসর্জ্জন করিবেন, এইরূপ আশা কবিয়াছিলেন। কিন্তু লাইসেন্স না পাওয়ায় তাঁহাকে ব্যথা পাইতে হইযাছিল এবং মূর্তিটিকে তিনি বোধকরি অতঃপর ঘরেই এতদিন ধরিয়া ফুলচন্দন দিয়াছিলেন পরে গত ২৭শে জানুয়ারী তারিখে দশ হাজার লোক মিলিয়া এই মূর্ত্তিটিকে ঘরের কোন হইতে তুলিয়া মিছিল করিয়া বাহির হইয়াছিল। মিছিলটি জেলের ফটকের সম্মুখে আসিতেই পুলিশ বাধা দিয়া মহাত্মাজীর মূর্ত্তিটি কাড়িয়া নেয় এবং মিছিলের লোকেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া সরিয়া পড়ে। এতগুলি লোকের মনে এমন করিয়া পুলিশ ব্যথা দিয়াছে, এজন্য আমরা সত্যই দুঃখিত ; কিন্তু এই অবতার পূজারীর দেশে মহাত্মাজীব এ দুর্দ্দশা বৈচিত্র নয়। মহাত্মাজীকে শ্রদ্ধা কে না করে, তবে শ্রদ্ধাব রূপ যখন ঐরূপ হইয়া দাঁড়ায তখন এ জাতির জন্য দুঃখের চেয়ে হতাশা বেশী করিয়া জাগে।'

বঙ্গবাণী[২৯] পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল সুভাষচন্দ্র বসুব একটি বাণী ঃ

'বর্ত্তমান যুগে আত্ম-রক্ষার জন্য এবং জাতির উদ্ধারের জন্য যে শক্তি আমরা চাই তাহা বনে জঙ্গলে বা নিভৃত কন্দরে তপস্যা করিলে পাইব না— পাইব নিষ্কাম কর্ম্মযোগের দ্বারা—পাইব অবিরাম শক্তি চালনার ভিতর দিয়া।'

বঙ্গবাণী[৩০] কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল আর একটি সংবাদ ঃ

'মুলতান জেলে বিজয় সিংহ
আসামীর ভগ্নীর বর্ণনা

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রাপ্ত শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার সিংহের ভগিনী শ্রীমতী এস, ঘোষ জানাইতেছেন ঃ

আমার ভ্রাতা শ্রীমান বিজয়কুমার সিংহকে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আজীবন কারাবাসের দণ্ড প্রদান করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে তাঁকে মুলতান জেলে রাখা হইয়াছে। বিগত ১২ই জানুয়ারী রেজেষ্টারী যোগে মুলতান জেলে তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলাম তাহা অদ্য ফেরত পাইয়াছি। পত্রখানি কি কারণে বিজয়কুমারকে না দিয়া ফেরত দেওয়া হইল তাহা জেলকর্তৃপক্ষ জানান নাই। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জ্ঞাত হইয়াছি যে, তাঁহাকে "সি" ক্লাসে রাখা হইয়াছে।

আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব বাবু মার্কণ্ডদাস সিংহ কানপুরের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। আমার অন্য ভ্রাতা (কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার দশ বৎসর দণ্ড প্রাপ্ত) শ্রীমান রাজকুমার সিংহ বেরিলি জেলে বিগত ১লা এপ্রিল হইতে "বি" ক্লাস পাইয়াছেন। গ্রেপ্তারের সময় রাজকুমার কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এস-সির ছাত্র ছিলেন। বিজয়কুমার তাঁহার গ্রেপ্তার-কালীন বহু সংবাদপত্রের কানপুরস্থ সংবাদদাতা ছিলেন। ইহার মাসিক আয় চারিশত টাকার কম ছিল না।'

রবীন্দ্রনাথ নানা দেশ ঘুরে ১৯৩১ সালে কলকাতায় ফিরলেন। সাংবাদিকরা সেদিন রবীন্দ্রনাথের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে বিদেশীদের মনোভাবের কথা। তা' ছাড়া কবির প্রত্যাবর্তনের সংবাদ বঙ্গবাণী[৩১] পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল সেই সংবাদটি হলো এই ঃ

'কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন
রাত্রি এক ঘটিকার সময় হাওড়া ষ্টেশনে উপনীত
বহুলোক কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধনা
দুই এক দিনের মধ্যে শান্তিনিকেতন যাত্রা

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গতকল্য শনিবার রাত্রি এক ঘটিকার সময় ইম্পিরিয়াল মেলে হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছেন। তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য শীতের গভীর রাত্রি সত্ত্বেও তাঁহার অনুরক্ত বহু লোক উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার মহালানবীশ ও তাঁহার পত্নী, অধ্যাপক অপূর্ব্বচন্দ্র, সুসঙ্গেরকুমার সুহৃৎ সিংহ, শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু ও বিশ্বভারতীর সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন হাজরা অন্যতম।

কবিবর এক বৎসর পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। গত বৎসর এই সময়ে তিনি প্রথমে ফ্রান্সে যান। তথা হইতে ইংলণ্ডে গমন করেন

এবং তথায় হিবর্ট লেকচার দেন। তাহার পর জার্ম্মানী ও রুশিয়া পরিদর্শন করেন। তৎপরে তিনি আমেরিকা যাত্রা করেন। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পুনরায় ইংলণ্ড পরিদর্শন করেন।

হাওড়া ষ্টেশনে কবিবরকে বেশ প্রফুল্ল দেখা গেল। যে সময়ে ট্রেন আসিয়া পৌঁছিয়াছিল তাহার পনের মিনিট পরেই হাওড়া পোল বন্ধ হইয়া যাইবে বলিয়া তাঁহার সহিত সংবাদপত্র প্রতিনিধির কথাবার্তা বেশী হইতে পারে নাই।

কবিবরের পুত্র শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁহার পত্নী এবং কুমারী নন্দিনী কবিবরের সহিত ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে গিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহার সহিত বোম্বাই হইতে একই ট্রেনে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত আসেন এবং শান্তিনিকেতনে যাইবার জন্য বর্দ্ধমানে নামেন। কবিবর তাঁহার কলিকাতা ভবনে গমন করেন। তিনি দুই একদিন কলিকাতায় থাকিয়া সম্ভবতঃ শান্তিনিকেতনে যাইবেন।

৩০শে জানুয়ারী বোম্বাইয়ে পৌঁছিয়া ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে,—ভারতের সংগ্রামের প্রতি সমগ্র জগৎই লক্ষ্য রাখিতেছে এবং প্রত্যেক দেশই ভারতের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন’

স্বদেশী আন্দোলনের সময় বিদেশী দ্রব্য বর্জনের জন্য স্বেচ্ছাসেবকেরা পিকেটিং করতেন। পিকেটিং করার একটি সংবাদ বঙ্গবাণী[৩২] পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ঃ

‘দুইজন মহিলা ও পুরুষ স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার

শুক্রবার কলিকাতা বড়বাজারে বিদেশী দোকানের সম্মুখে কতিপয় মহিলা কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক পূর্ব্ববৎ পিকেটিং করিয়াছিলেন। পুলিশ রাস্তা আটক করিবার অভিযোগে দুইজন মহিলা ও দুইজন পুরুষ স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।’

বঙ্গবাণী[৩৩] পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় করে ছাপা হয়েছিল ঃ ‘দুর্য্যোগ-অবসানে নব ঊষার আলো? কংগ্রেসের সহিত গবর্ণমেণ্টের সন্ধি।’

ওই দিনের কাগজে ছাপা হয়েছিল, মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন ঃ ‘স্বাধীনতার সারবস্তু না পাইলে আর আশ্রমে ফিরিব না।’

বঙ্গবাণী[৩৪] পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল মহাত্মা গান্ধীর একটি বাণী ঃ ‘আধ্যাত্মিকতার প্রথম সোপান নির্ভীকতা, কাপুরুষ কখনও নীতিজ্ঞানসম্পন্ন হইতে পারে না।’

বঙ্গবাণী[৩৫] পত্রিকায় পূর্বে উল্লিখিত মহাত্মা গান্ধীর বাণীর নিচে প্রকাশিত হয়েছিল সম্পাদকীয়। সেই লেখাটি এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

'আশার আলো

বিনিদ্র রজনীর আলোচনা সফল করিয়া দিল্লী হইতে সংবাদ আসিয়াছে মহাত্মা গান্ধী ও লর্ড আরউইনের মধ্যে আপোষের সর্ত্তগুলি প্রায় ঠিক হইয়াছে। ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণের এই শুভ সূচনায় সকলেই আশান্বিত।

কিন্তু গান্ধী-আরউইন স্বাক্ষরিত আপোষের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশে এখনও বিলম্ব আছে।

বিবরণীটি দীর্ঘ হইয়াছে এবং ইহার শেষ অনুমোদনের ভার ভারত-সেক্রেটারী মিঃ ওয়েজউড বেনের হাতে, এই আপাততঃ শান্তির প্রস্তাব যে উভয় পক্ষের সম্মানজনক সর্ত্তেই গৃহীত হইয়াছে. সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ নাই। ভারত সরকারের রাজস্ব সচিব সার জর্জ্জ সুষ্টারের সহিত মহাত্মা গান্ধীর যে আলাপ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে ইহার আভাষ সুস্পষ্ট হইয়াছে।

লবণ সত্যাগ্রহ লইয়া আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল, সুষ্টারের আলাপে শুনা গিয়াছে, সমুদ্র উপকূলের আদিবাসীবৃন্দ লবণ তৈরী ও বিক্রয় করিতে পারিবে—কিন্তু ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকার কর্ত্তৃপক্ষের হস্তেই থাকিবে। পুলিশ অতিশয়তার বিরুদ্ধে জনসাধারণের মনে যে বিক্ষোভ হইয়াছে তাহারও উপযুক্ত তদন্তের কথা উপেক্ষিত হয় নাই। রাজনৈতিক বন্দীগণের মুক্তি-প্রশ্নে বিশেষ কাহারো মতভেদ ছিল না, সুতরাং তৎসম্বন্ধে সমস্যাও সৃষ্টি হয় নাই। তবে হিংসামূলক রাজনৈতিক অপরাধের জন্য যাঁহারা দণ্ডিত হইয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কি স্থির করা হইয়াছে তাহা এখনও জানা যায় নাই।

আপাততঃ ঠিক হইয়াছে অদ্য বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন পাঁচটার সময় কমন্স সভা ও ভারতবর্ষে মহাত্মা-আরউইন স্বাক্ষরিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। উহা হইতে সাময়িক আপোষের সর্ত্তগুলি জানা যাইবে ইহার পরে কংগ্রেস গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিবেন এবং সেখানে আবার ভারতের রাষ্ট্র-রচনার পুনরালোচনা হইবে বিশ্বাস ও সদিচ্ছা লইয়া সত্যের আলোকে...হইলে...মেঘাবরণ দূর হইতে বিলম্ব হয় না। এই বিশ্বাসের বাহু কিছুকাল পূর্ব্বে প্রসারিত হইলে কত শান্তি, কত অনর্থক অর্থক্ষয় নিবারণ করা যাইত।

"অর্দ্ধ উলঙ্গ ফকির" বলিয়া উন্মাদ আখ্যায় অভিহিত করিয়া যাঁহার প্রতি এত বিদ্রূপের বাণ বর্ষণ করা হইল, তাঁহার কথায় পূর্ব্বে কর্ণপাত করিলে আর এত ক্ষমতার অপচয়ের প্রয়োজন হইত না। সত্যের আলোকে যাঁহারা মানবের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হন দুর্যোগ তাঁহাদিগকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারে না, পথের ভ্রূকুটি তাঁহাদিগকে লক্ষ্যহারা করে না।

পীড়ন যে অপঘাতে পরাজিত, প্রেম যে বিশ্বজয়ী—গান্ধী-আরউইনের আলোচনার সাফল্য তাহারই পরিচয়।

কিন্তু চার্চ্চিলের দল আছে, উইন্টারটন আছে, আরউইনের নিন্দুকেরও অভাব হইবে না। বিলাতের যে সকল রাজনৈতিক দল গোলটেবিলের প্রারম্ভ হইতে বৃটিশের আত্মশক্তিতে সন্দেহ ও সরকারের দুর্ব্বলতা দেখিয়া আসিয়াছেন, বর্ত্তমান আপোষের প্রস্তাবেও তাঁহারা হয়তো রুষ্ট হইবেন। হয়তো ভারতবর্ষ হারাইবার আর্ত্তনাদে তাঁহাবা পার্লামেন্টের প্রাচীর বিদীর্ণ না করিয়া ছাড়িবেন না। কিন্তু মৈত্রীর বন্ধনই যে ভারত ও ইংলণ্ডের অখণ্ড যোগসূত্র স্থাপনের প্রধান উপায়, অতীতের অন্ধতায় হয়তো তাঁহারা তাই স্বীকার করিবেন না। বিগত যুগের রাজনীতি বর্ত্তমান যুগে অচল। দেশ ও সমাজের অগ্রগতিতে অতীতের জীর্ণ প্রথা চিরদিন নূতন আকারে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ডের ইতিহাস তাহার জ্বলন্ত সাক্ষী কিন্তু এই সত্যকে উপেক্ষা করিয়া মানবের দাবী ও অধিকার অগ্রাহ্য করিয়া যাহারা পুরাতন নীতিতেই জগৎ শাসনের ইচ্ছা করে, তাহারা ভ্রান্ত। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান সরকার এই প্রাচীনের জরাজীর্ণ মনকে সংস্কার করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু সন্দিগ্ধ সংরক্ষণীদল তাহার সহিত সমতালে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না।

তাই শ্রমিক সরকারের প্রচেষ্টায় যখন ভারত ও ইংলণ্ডের বিরোধ মীমাংসায় একটা প্রয়াস সফল হইতে চলিয়াছে, তখন ইহাদের আর্তনাদ আরও বিকট আকারে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। কিন্তু সত্যের গতি অব্যাহত, বিশ্বাসের বাহু চিরসবল। নিন্দুকের দল যতই চিৎকার করুক, সন্দিগ্ধচিত্ত যতই শঙ্কাকুল হউক, ভারতের অগ্রগতি তাহাতে রুদ্ধ হইবে না। কঙ্কর বিছাইয়া যাঁহারা যাত্রাপথের বিঘ্ন বাড়াইতে চাহেন, তাঁহারা কৃপার পাত্র।'

বঙ্গবাণী[৩৬] পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল সেকালের 'লিবার্টি' পত্রিকার মুদ্রাকরের কারাগার থেকে মুক্তিলাভের সংবাদ। সংবাদটি হলো এই :

'শ্রীযুক্ত পুলিবিহারী ধর

"লিবার্টি" পত্রিকার মুদ্রাকর শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী ধর মহাশয় এক বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। এই দণ্ডভোগ করিয়া গতকল্য বুধবার তিনি দমদম স্পেশাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী প্রমুখ কয়েক ব্যক্তি জেলের দ্বারে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিয়াছেন।'

স্বদেশী আন্দোলনের সময় একদিকে যেমন বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন করার উপদেশ দিতেন সে দিনের দেশকর্মীরা, আর এক দিকে নিজের হাতে চরকা কাটার কথাও তাঁরা বলতেন। যাঁরা চরকায় সুতো কাটতেন, তাঁদের

উৎসাহ দেওয়া হতো। কলকাতায় রামমোহন লাইব্রেরীতে এক সভা হয়েছিল। তার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল বঙ্গবাণী[৩৭] পত্রিকায়। সেই সংবাদের কিছু অংশ হলো এই ঃ

'রামমোহন রায় হলে সভা
আচার্য্য রায়ের সভাপতিত্ব

গত ২রা মার্চ সোমবার বৈকাল ৫৷৷টার সময় রামমোহন লাইব্রেরীতে লুপ্ত শিল্পাশ্রমের উদ্যোগে নিখিলবঙ্গ সুতাকাটা প্রতিযোগিতার পরিতোষিক বিতরণ সভা হইয়া গিয়াছে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। পারিতোষিক বিতরণ সভায় বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা যোগদান করিয়াছিলেন। তম্মধ্যে শ্রীযুক্তা উর্ম্মিলা দেবী, জ্যোৎস্না মিত্র, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার, জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, পঞ্চানন বসু, ক্ষিতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, হেমপ্রভা দাসগুপ্তের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সভায় শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার বসু, শ্রীযুক্তা নিস্তারিণী দেবী, মোহিনী দেবী, সরলাবালা সরকার ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, লুপ্তশিল্পের উদ্ধার মানেই লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার এবং লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধারের দ্বারা লুপ্ত স্বাধীনতা পুনরায় অর্জ্জিত হইবে।

শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার বসু বলেন, খাদিতে বিশ্বাসী লোকেরা এই আন্দোলনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য করিয়াছেন। চরকা মানুষকে একতা ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে শিখায়, চরকায় মনের একাগ্রতা আসে।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মহাশয় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজঃস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দ্বারা উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে মুগ্ধ করিয়া রাখেন তিনি বলেন, জাপান, ইউরোপ থেকে যখন মহাত্মার চরকার কথা শুনতাম তখন বুঝতে পারতাম না তাতে কি হবে ? কিন্তু এখন বুঝতে পারি এই চরকার সুতার মধ্যেই ভারতের ইতিহাস লেখা আছে। মহাত্মা গান্ধীই কোটী কোটী লোকের অবিসম্বাদিত নেতা—তিনিই একমাত্র দেশকে নির্দ্দেশ দিতে পারেন এবং দেশকে পরিচালিত করিতে পারেন ; সুতরাং তাঁর নির্দ্দেশানুযায়ী আজ প্রতি ঘরে চরকা চালাইতে হইবে।

সভাপতি আচার্য্য রায় বলেন, আমি একাধারে শিক্ষক এবং ব্যবসায়ী বটে। ৫ জন লইয়া একটি পরিবারের আয় যদি দুই পয়সা হয় তাহা হইলেও বৎসরে ভারতের ৭২ কোটী টাকার আয় বৃদ্ধি হয়। চিরকাল মানুষের আয় না কমিয়া বৃদ্ধিই হয়। খদ্দর যদি সদর দরজা দিয়া প্রবেশ করে তবে বিলাসিতা চোরের মত খিড়কি দিয়া পালাইয়া যাইতে বাধ্য হয়।...'

'নবশক্তি' নিয়ে আগে আলোচনা করা হয়েছে। নবশক্তি ছিল সাপ্তাহিক কাগজ। প্রতি শুক্রবার প্রাতে কলকাতায় প্রকাশিত হতো। প্রতি সংখ্যার দাম ছিল এক আনা। সম্পাদক ঃ সুবোধ রায়। হেমন্তকুমার সরকার কর্তৃক কলকাতার দি ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ প্রেস, ১৯ নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া স্ট্রীট থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতো। নবশক্তি[৩৮] সম্পাদকীয় কলমে ছাপা হয়েছিল ঃ

'রাজনৈতিক বন্দীদের শ্রেণীবিভাগ

বর্ত্তমান বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভাব প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করিবার শক্তির পবীক্ষা একাধিকবার হইয়া গেল। গত মঙ্গলবাব মৌলভী জালালুদ্দিন হাসেমী রাজনৈতিক বন্দীদের সম্বন্ধে যে প্রস্তাব আনিয়াছিলেন, জনমতের পক্ষ হইতে তাহাবও পরাজয় ঘটিয়াছে। সেই প্রস্তাবের পক্ষে ছিল মাত্র ৩৭ জন, বিপক্ষে ৬১ জন। মৌলভী জালালুদ্দীন হাসেমী প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, জেলেব তৃতীয় শ্রেণীর ("সি" শ্রেণী) সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিগণকে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত ("বি" শ্রেণী) করা হউক। সরকার পক্ষ যাহাই বলুন, সাধারণ জনমতের প্রতিনিধি বলিয়া যাঁহারা গর্ব্ব করেন সেই বে-সরকারী পক্ষও যে এই প্রস্তাবের ও একান্ত প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা বুঝিতে পারিলেন না, ইহাই বিচিত্র !

রাজনৈতিক বন্দীদের শ্রেণী-বিভাগ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আমরা যখনই লিখিয়াছি তখনই বলিয়াছি যে একটা অদ্ভুত খেয়াল-খুসীমত এই শ্রেণী-বিভাগের ব্যবস্থা করা হয়—সে সম্বন্ধে কোনও নির্দ্দিষ্ট নীতি অনুসৃত হয় না। এই প্রস্তাব সম্পর্কে কাউন্সিলগৃহে যে আলোচনা হইয়াছে তাহাতেও একথার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। যথা ঃ—রাজসাহীর জমিদার ও ভূতপূর্ব্ব কাউন্সিল সদস্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ও শ্রীযুক্ত গোপাললাল সান্যালের মত লোককে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করা হইল, আবার এদিকে তদপেক্ষা বহু সামান্য পদ ও পদমর্য্যাদার লোক প্রথম শ্রেণীর সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল।

জেল বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার প্রভাস মিত্র বলিয়াছেন যে প্রস্তাবটি ভুল স্থানে করা হইয়াছে। এই বিষয়ে শেষ কর্ত্তৃত্ব ভারত সরকারের হস্তে ন্যস্ত থাকায় এইরূপ প্রস্তাব উপস্থিত করিবার যথার্থ স্থান দিল্লী, কলিকাতায় নহে। তিনি শুধু স্থানের ভুলই বলিলেন। কাল ও পাত্র সম্বন্ধে কিছু বলিলেন না তো !

গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে মিঃ হচিংস্ যাহা বলিয়াছেন তাহা আরও সুন্দর। "রাজনৈতিক বন্দী" বলিতে কি বুঝায় মিঃ হচিংস্ তাহা ঠিক ধরিতে পারেন নাই। সাহেবের মুখে একথা মানায় ভাল। আমাদের মনে হয় ভারত না হইয়া এ স্থান ইংলণ্ড হইলে মিঃ হচিংস "রাজনৈতিক বন্দীর"

অর্থ বোধ হয় অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেন। তাহার পর তিনি নানারূপ অঙ্কের উল্লেখ করিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে রাজনৈতিক কয়েদীদের জন্য গভর্ণমেণ্ট যে খরচা করেন তাহা মাথা পিছু কলিকাতার নাগরিকদের খরচের তিন গুণ। এই Statistics তিনি কোথায় পাইলেন এবং ইহা কতদূর নির্ভুল তাহা আমরা জানি না, তবে তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী-দের আহার ও ব্যবহারের প্রতিবাদে একাধিকবার নানা জেলে যে প্রয়োপবেশন হইয়া গিয়াছে তাহা কি গভর্ণমেণ্ট অস্বীকার করিতে পারেন? সেইজন্য আমরা আবার বলিতেছি রাজনৈতিক বন্দীদিগের সহিত সাধারণ কয়েদীর একটি পার্থক্য অবশ্য থাকা উচিত এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যেও শ্রেণী-বিভাগগত বৈষম্য অচিরেই তুলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।'

দৈনিক বসুমতী[২৯] সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবৃতি:

'শ্রীযুক্ত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবৃতি

দেশরক্ষা বিভাগের সেক্রেটারীর বিলের বিরুদ্ধে মত পোষণ

ভারতবাসীকে জোর আন্দোলন চালাইতে অনুরোধ

য়ুনাইটেড প্রেস মারফৎ শ্রীযুত সৌম্যেন্দ্রনাথ ফ্যাসিজিম ও সংগ্রামের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক বিবৃতি দিয়াছেন।

বিবৃতি প্রসঙ্গে শ্রীযুত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন ভারত সরকারের দেশরক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ অগিলিভি কেন্দ্রীয় পরিষদে একটি বিল পেশ করিয়াছেন। মিঃ ঠাকুর বলেন যে বিল যদি পাশ হয় তবে ভারতের পক্ষে সমূহ বিপদ। এ বিলে বলা হইয়াছে, যদি কোন ভারতীয় এই সাম্রাজ্যবাদে যোগদান করিতে ভারতবাসীকে নিষেধ করে কিংবা সৈন্যদলে যোগদান করিতে ভারতবাসীকে নিরুৎসাহ করে তবে তাহাকে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে।

মিঃ ঠাকুর বলেন, য়ুরোপের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে য়ুরোপের অন্যান্য শক্তি ঘৃণার চক্ষুতে দেখিতেছেন, কি মুশোলিনী কি হিটলার সকলেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ঘৃণার চক্ষুতে দেখিতেছেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে শক্তিহীন করার যথেষ্ট চেষ্টা চলিতেছে বলিয়াই বৃটেন তাহার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করায় ব্যস্ত আছে। কিন্তু কেবল যুদ্ধের সরঞ্জামে ব্যস্ত থাকিলেই ত' যুদ্ধ জয় করা যায় না। ইংলণ্ডের জনসাধারণ যুদ্ধের বিপক্ষে। ছাত্রদলও তাহাদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। ভারতও ঐ সাম্রাজ্যবাদমূলক যুদ্ধের বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন চালাইয়া আসিয়াছে—এবং এই আন্দোলন ফলপ্রসূও হইয়াছে, তাই আজ ভারত উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে ভারত যদি ভবিষ্যতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্য করে তবে ভারত আর একটি...ভুল করিয়া বসিবে।

ভারত সব বিষয়ে কি রাজনীতিক ক্ষেত্রে, কি অর্থনীতিক ক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই শোষিত হইয়া আসিতেছে। এইরূপ অবস্থায় ভারত যদি ঐ সাম্রাজ্যবাদের ইন্ধন জোগান দিবার বিপক্ষে কোন মতামত পোষণ করে তাহাকে আবার শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। সুতরাং ভারত যে ঐ দেশরক্ষা বিভাগের সেক্রেটারীর বিলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবেন তাহাতে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। এখন ভারতবাসীর কর্ত্তব্য ঐ বিলের বিরুদ্ধে ভারতব্যাপী জোর আন্দোলন আরম্ভ করা। সময় আমাদের খুব অল্প এই অবস্থায় ভারতের ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক সকলে মিলিয়া অবিলম্বে এই বিলের বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন আরম্ভ করুন—ইহাই আমার অনুরোধ।'

আমাদের আলোচনার বিষয় হলো: স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পত্র-পত্রিকা। বিভিন্ন জেলায় ঘুরে যেখানে যা' সংগ্রহ করতে পেরেছি তা' উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার চিন্মোহন সেহানবীশ[৪০] লিখিত গ্রন্থে—'সোনার বাঙ্গলা' ইস্তাহারের কথা উল্লেখ আছে। 'সোনার বাঙ্গলা'—১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে টাউন হলের প্রতিবাদ সভায় বিতরিত বিপ্লবীদের বেআইনী ইস্তাহার।

সেকালে এক শ্রেণীর সাংবাদিক এবং বাংলা পত্র-পত্রিকার লেখকেরা গতানুগতিক ভাবে সাহিত্যচর্চ্চা না করে তাঁরা সেদিন স্বাধীন ভাবে দেশের অনেক সমস্যা বুঝতে এবং নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে সাহসী হয়েছিলেন। তাঁদের স্বাধীন চিন্তার ফল পড়েছিল দেশবাসীর মধ্যে। দেশের সাধারণ মানুষ তাঁদের লেখা পড়ে বিভিন্ন সময়ের জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সেকালে ভারতের বিপ্লবীরা কোন রকম সংকীর্ণ স্বার্থ রক্ষার কথা চিন্তা করতেন না। তাঁরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্রতী হয়েছিলেন—সমগ্র দেশের ও দেশবাসীর মুক্তির জন্য। পত্র-পত্রিকার সাংবাদিকরাও প্রচার অভিযান চালিয়েছিলেন। যদিও আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল, যে সব পত্র-পত্রিকা স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিল সেই সব কাগজ নিয়ে। কিন্তু আলোচনা কালে দু-একটি অন্যান্য পত্র-পত্রিকা প্রসঙ্গ এসে গেছে। 'মৎস্যজীবি' ছিল দ্বৈমাসিক পত্রিকা। একমাস অন্তর প্রতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হতো। প্রতি সংখ্যার দাম ছিল তিন আনা। সম্পাদক ছিলেন: জ্যোতিশচন্দ্র বিশ্বাস এবং অবিনাশচন্দ্র দাশবর্মা। প্রফুল্লকুমার দাশবর্মা কর্তৃক রঘুনাথ প্রেস, ১১৮ আমহার্ষ্ট স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও ১৪ নরেন্দ্র সেন স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হতো। কাগজের মলাটে থাকতো রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ:

'আপনাদের নূতন পত্রিকা "মৎস্যজীবি" সমাজে সাম্য ও কল্যাণময় ঐক্য বুদ্ধি সঞ্চারিত করুক, দেশের নানা দৈন্য এবং বিরুদ্ধভাব দূর করিয়া

দেশে মানব সভ্যতার চিরন্তন সত্যে দেশবাসীকে প্রতিষ্ঠিত করুক ইহাই রবীন্দ্রনাথের অন্তরের আশীর্ব্বাদ।'

তা' ছাড়া ছাপা হতো রবীন্দ্রনাথের কবিতার কিছু অংশ ঃ

এই সব ম্লান মূঢ় মূক মুখে / দিতে হবে ভাষা।
এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া / তুলিতে হবে আশা॥

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার কিছু অংশ ঃ

শূদ্র মহান্ গুরু গরীয়ান্ / শূদ্র অতুল এ তিন লোকে।
শূদ্রে রেখেছে সংসার ওগো, / শূদ্রে দেখো না বক্র চোখে॥

মৎসজীবি, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল—ভাদ্র ১৩৪০ সালে। এই সংখ্যাটি শারদীয়া সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হয়। দুর্গাপ্রতিমার রঙিন চিত্র এই সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। লিখেছিলেন ঃ অবিনাশচন্দ্র দাশবর্মা (মৎস্যজীবীর বেদনা), মহেন্দ্রনাথ বর্মণ (কবিতা), ইন্দুপতি (কবিতা), শান্তিরাম হাইত (একলব্য), প্রফুল্লকুমার দাশবর্মা (পরামর্শ দরকার), জ্যোতিশচন্দ্র বিশ্বাস (মৎস্য সংরক্ষণে ঔদাসীন্য), সুরেন্দ্রনাথ দাস (আনন্দের সন্ধান), প্রেমচরণ সরকার (শিক্ষা), প্রভৃতি লেখা ছাপা হয়েছিল।

মৎস্যজীবী[৪১] পত্রিকা থেকে সম্পাদকীয় কলমের একটি লেখা এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

'অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন না আর কিছু ঃ

বাঙ্গলা দেশে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের প্রবর্ত্তক ও প্রধান পুরোহিত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ। তিনি সংসারের সমস্ত সুখ সাধ বিসর্জ্জন দিয়া চিরকুমার থাকিয়া প্রায় পঁচিশ বৎসর হইল বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে অনুন্নত সম্প্রদায়ের দ্বারে দ্বারে প্রচার করিয়া আসিতেছেন। মহাত্মা গান্ধী তাঁহাকে লিখিয়াছেন "আপনি ত আমারও অনেক আগে থেকে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন।" কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, বাঙ্গলা দেশে নূতন অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন বোর্ড গঠিত হইল, তাহাতে তাঁহার মত যোগ্য ব্যক্তির স্থান হইল না। যিনি সেই সমিতির কর্ণধার হইলেন, ৬৪ টাকা ভিন্ন তাঁহার পদধূলি পাওয়া কঠিন। তিনি তাঁহার পছন্দ মত দলবল লইয়া আন্দোলন চালাইতেছেন। দরিদ্র অনুন্নত সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁহাদের কোনও যোগাযোগই দেখা যায় না। হিন্দুসভা ও আর্য্য সমাজের কর্ম্মিগণ অনুন্নত সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশিয়া বক্তৃতাদি দ্বারা হিন্দু সমাজে নব জাগরণের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাদেরও কাহারও সহিত ঐ নূতন সমিতির কোন সংস্রব নাই। কাজেই ঐ নূতন সমিতির পাণ্ডাদের প্রতি সন্দেহের সৃষ্টি হইতেছে। মোটার চাপিয়া দু' একবার টাউন হলে কিংবা পার্কে যাইলে, অথবা খবরের কাগজে দু' একটা বিবৃতি দিলে

অনুন্নত সম্প্রদায় মুগ্ধ হইবে না। ধাপ্পা দিয়ে অনুন্নত সম্পদায়ের চিত্ত জয় করার দিন চলিয়া গিয়াছে।'

এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা যেতে পারে, 'মৎসজীবী' পত্রিকার কর্মকর্তারা বোধ হয় কোন রকম রাজনৈতিক বিষয়ে সেদিন যেতে চান নি। দু-টি সংখ্যা শুধু আমার চোখে পড়েছে, ওই দেখে মনে হয় যে, তাঁরা গ্রাম বাংলার চাষ ও মাছ নিয়ে শুধু চিন্তা-ভাবনা করতেন। মাঝে মাঝে হয়তো সমাজের কথা তাঁদের সামনে এসে পড়তো, তাই ওই নিয়ে তাঁরা কিছু লিখেছিলেন।

'মন্দিরা' পত্রিকা প্রসঙ্গে আগে আলোচনা করা হয়েছে। এই পত্রিকা ৯ম বর্ষ, সন ১৩৫৩ সাল, সম্পাদিকা ঃ কমলা দাশগুপ্ত। কাগজ প্রকাশিত হতো ৩২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা থেকে। ৯ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫৩, এই সংখ্যায় লিখেছিলেন ঃ ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় (পথের চিহ্ন), অভিশপ্ত (কবিতা), কালীচরণ ঘোষ (ভারতের স্বাধীনতা কি ইংরেজের দান ?), রামেন্দ্র দেশমুখ্য (কবিতা). শিল্পী নন্দলাল বসুর আঁকা ছবি (শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ), তারাপদ রাহা (উপন্যাস ঃ যাত্রা হ'ল শুরু), শান্তিরাম বিরচিত (কাব্যে ইতিহাস). জগদীশচন্দ্র ঘোষ (এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন), কালীপদ চক্রবর্তী (কবিতা ঃ ঘুমভাঙ্গার রাত), কমল রায় (জলন্ত রাশিয়ার অগ্নিময় যৌবন), শ্রী অঃ (গণতন্ত্র), শ্রীমতী বাণী রায়, (কবিতা), রাণী চন্দ (জনানা ফাটক), শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (কবিতা), যোগেশচন্দ্র বাগল (জাতি-সংঘাত ও ভারতের গণ-অভ্যুত্থান), রূপঙ্কর দত্ত (আমরা আবার বাঁচব), সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (কবিতা), বীরেশ্বর ঘোষ (সরকার ও আসন্ন খাদ্য সঙ্কট), এবং আরও অনেকের লেখা ছাপা হয়েছিল।

মন্দিরা[৪২] পত্রিকায় 'কালের যাত্রা' পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছিল একটি লেখা ঃ

'জাতীয় সপ্তাহ

অমৃতসরের হত্যাকাণ্ডের এবং নৃশংস জাতীয় লাঞ্ছনার সপ্তবিংশ স্মরণ দিবসে আমরা অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করি।

প্রথম বিশ্বসংগ্রামে বিশ্বস্বাধীনতা ও মৈত্রীর প্রলোভনে বিভ্রান্ত ভারতবর্ষ যে প্রশংসনীয় অংশ গ্রহণ করেছিল তার স্বীকৃতিতে ইংরাজ রাজনীতিকরা মুখর হইয়া উঠেছিল। সমরকালীন প্রধানমন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ উচ্ছ্বসিত আবেগে ঘোষণা করে গেলেন—ভারতীয় প্রজাপুঞ্জকে দাসত্বের নিগড় থেকে মুক্তি দেবো। কিন্তু সংগ্রামের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ রাজনীতিকরা তাঁদের স্বকীয় মূর্তি পরিগ্রহ করলো। ভারতবর্ষের মুক্তি প্রচেষ্টার ধ্বংস সাধনের উদ্দেশে আরম্ভ হোল দমননীতির অদ্ভুত আমলাতন্ত্রের স্বৈরাচারী শাসনকে নিরঙ্কুশ করার প্রয়োজনে রচিত হোল

নূতন আইন রাউলাট কমিশনের সুপারিশে। গান্ধীজীর নেতৃত্বে সমগ্র দেশ প্রতিবাদ জানালো এ আইনের বিরুদ্ধে। আশাহত জনসাধারণের বিক্ষোভ দমন করতে গিয়ে পাঞ্জাব সরকার জঙ্গী শাসনের স্মরণ নিলো। তারি ফলে অনুষ্ঠিত হলো জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাযজ্ঞ। মিস: সেবউডের প্রতি অসম্মানের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে ইংরাজ কর্মচারীরা বর্বরোচিত নৃশংস অত্যাচার করলো নারীদের উপরে। পাঞ্জাবের বীর সন্তানদের নিবীর্য করার জন্য যে অত্যাচার ও নিপীড়নের আশ্রয় নিলো জেনারেল ডায়ার ও তার অনুচররা তার বিবরণ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নগ্নরূপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। যে শাসনের ফলে পাঞ্জাবের অত্যাচার সম্ভব হয় সেই শাসনের অবসান কল্পে সমগ্র ভারত এই দীর্ঘকাল সংগ্রাম করে এসেছে। যতদিন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত না হবে ততদিন পাঞ্জাবের শহীদের আত্মা তৃপ্তি পাবে না। আজ জাতীয় সপ্তাহে আমরা আমাদের জাতীয় লাঞ্ছনায় অপমোচনের সংকল্প নূতনভাবে গ্রহণ করি।'

'মন্দিরা' পত্রিকা শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ নং আপার সার্কুলার রোড হইতে অমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং 'মন্দিরা' কার্য্যালয় ৩২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হতো।

'মন্দিরা' পত্রিকায় অন্যান্য সংখ্যায় লিখেছিলেন: অরুণচন্দ্র গুহ, ব্রজরঞ্জন গুহ, সাধন চট্টোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামনাথ বিশ্বাস, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, মনোরঞ্জন গুপ্ত, নরেন্দ্র দেব, আশুতোষ সান্যাল, উমা দেবী, মনোজ বসু, নির্মলকুমার বসু, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, নিশাপতি মাঝি, সুচেতা কৃপালিনী, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, আশরাফ সিদ্দিকী এবং আরও অনেকে।

মন্দিরা[৪৩] পত্রিকায় 'কালের যাত্রা' পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছিল একটি লেখা। ওই লেখা এখানে উল্লেখ করা হলো:

'স্বাগতম—সুদীর্ঘ পাঁচ বছর কারাভোগের পর শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুপ্ত, অরুণচন্দ্র গুহ, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত ও সুরেশচন্দ্র দাস কয়েকদিন হ'ল মুক্তিলাভ করেছেন। এঁরা সকলেই অধুনা লুপ্ত বিপ্লবী "যুগান্তর" দলের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। বর্তমানে এঁরা সকলেই কংগ্রেসকর্মী ও নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য। ৩০ বছর আগে বাংলার যে তরুণদলকে পরাধীনতার দুঃসহ জ্বালা ঘরছাড়া করেছিল, পরলোকগত বিপ্লবী বীর যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে যে যুবকবৃন্দ মৃত্যুমাত্র সম্বল করে স্বাধীনতার বেদী মূলে নিজেদের বলি দেবার জন্য এগিয়ে গিয়েছিল মনোরঞ্জন, অরুণচন্দ্র, ভূপেন্দ্রকুমার, সুরেশচন্দ্র প্রভৃতি সেই গোষ্ঠীর। এঁরা সেই ধরণের কর্মী যাঁরা দেশের কাজে সব কিছু বিসর্জন দিয়েও আজও পরিপূর্ণ। দেশের

জন্য এঁদের ত্যাগ এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠার কথা হয়ত জনসাধারণ জানে না। কারণ এঁরা সেই ধরণের লোক যাঁরা খবরের কাগজ মারফত নিজেদের জাহির করিতে একেবারেই নারাজ। কিন্তু আমাদের বিদেশী শাসক শ্রেণী এঁদের জ্বলন্ত দেশপ্রেমের খবর রাখে এবং এঁদের বিপ্লবী রূপকে ভয়ের চোক্ষে দেখে। তাই বিদেশী শাসিত স্বদেশের সেবার সনাতন পুরস্কার স্বরূপ এঁদের জীবনের প্রায় ২৪ বছরই কেটেছে—কারাগৃহের অন্তরালে। দেশের এই একনিষ্ঠ সেবকদের এবং বাংলার এই বিপ্লবী-বীরদের আমরা আমাদের সাদর অভিনন্দন ও গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

শ্রীযুক্ত শ্যামানন্দ সেন, রসিকলাল দাস, পৃথিবেশ বোস, নয়নারঞ্জন দাসগুপ্ত, সুধীর ঘোষ প্রভৃতি কংগ্রেস কর্মী দীর্ঘদীন করাবাসের পর বিভিন্ন জেল থেকে সম্প্রতি মুক্তিলাভ করেছেন। বাংলার এই নীরব ও একনিষ্ঠ কর্মীবৃন্দকে আমরা সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি।

কিরণদার মুক্তিলাভ—অগ্নিযুগের বিপ্লবীবীর শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি মুক্তিলাভ করে আবার তাঁর 'ভাইডি'দের মধ্যে ফিরে এসেছেন। এই বৃদ্ধ বিপ্লবীকে ভালবাসে না ও শ্রদ্ধা করে না এমন লোক বোধ হয় নেই। একদা কৈশোরে যিনি স্বাধীনতার বন্ধুর পথে পা বাড়িয়েছিলেন আজ ৬৪ বছরের বার্দ্ধক্যেও তাঁর পথ চলা সাঙ্গ হয় নি। তাঁর বোনেদের পক্ষ থেকে আমরা তাঁকে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।'

মন্দিরা[৪৪] পত্রিকায় দেশের খাদ্য পরিস্থিতি প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল ঃ

'খাদ্য পরিস্থিতি—সমগ্র ভারতবর্ষে খাদ্য সঙ্কট দেখা দিয়েছে। এই সঙ্কটের গুরুত্ব এবং সম্ভাব্য পরিণতি সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। এই বিশ্বাস আমাদের ছিল যে বিগত মন্বন্তরের প্রাক্কালে সরকারী কর্মচারীগণ যে ভ্রান্ত নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছিল এবং সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক দুর্নীতির ফলে ক্রমবর্দ্ধমান চোরাবাজারের যে বীভৎসতা প্রকাশ পেয়েছিল এবার জনগণের প্রতিনিধিদের সমবেত চেষ্টার ফলে তার পুনরাবর্ত্তন ব্যাহত হবে। কিন্তু বিগত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের পরাস্পর বিরোধী বিবৃতি আমাদের মনকে সংশয়াকুল করে তুলেছে। একদিকে খাদ্য ভিক্ষার জন্য ইউরোপে ও আমেরিকায় প্রতিনিধি প্রেরণের ভিতর দিয়ে যেমন ভারত সরকার স্বীকার করে নিয়েছেন ভারতবর্ষের আসন্ন দুর্ভিক্ষের অবশ্যম্ভাবিতা তেমনি অন্যদিকে বাংলা সরকারের বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের মিঃ রাজন্ তাঁর বিবৃতিতে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কাকে অমূলক প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পেয়েছে। এমন কি খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে দেশবাসীকে সজাগ রাখবার জন্য জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহ এবং জননায়কগণের প্রচেষ্টাকে মুসলিম লীগ বিরোধী

প্রচার কার্য্য হিসাবেই চিত্রিত করার অবিমৃষ্যকারিতাও প্রকাশ পেয়েছে। কেন্দ্রীয় পরিষদের খাদ্য সমস্যা সম্পর্কিত বিতর্কে মুসলিম লীগের অন্যতম দলপতি মিঃ সিদ্দিকি যে উক্তি করেছেন তা আমাদের নৈরাশ্যের সঞ্চার করেছে। যেটা একটা সত্যিকারের জাতীয় সমস্যা এবং যে সমস্যার সঙ্গে দলগত রাজনীতির কোন সংশ্রব থাকা সমিচীন নয় সেই সমস্যা সমাধানের পথেও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি যদি অন্তরায় সৃষ্টি করে তবে সেটা গভীর পরিতাপের বিষয় হবে। দুর্ভিক্ষ ও দুর্ভিক্ষজনিত মহামারী যখন দেশকে শ্মশানে পরিণত করতে আরম্ভ করে তখন তাদের প্রকোপ থেকে কোন সম্প্রদায়ই নিস্তার পায় না। আমরা আশা করি বিগত দুর্ভিক্ষের শোচনীয় স্মৃতি আমাদের কর্তব্য-বুদ্ধিকে সজাগ রাখবে যাতে আমরা সাম্প্রদায়িক অথবা ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে দেশের খাদ্য সমস্যার সমাধান করতে পারি এবং দেশের বহু সংখ্যক নরনারীকে অনশন মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করতে পারি। দেশবাসীর সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং সরকারী নীতির দূরদর্শিতা এই সংকটের অবসান ঘটাতে পারে।'

'প্রদীপ' সাপ্তাহিক পত্রিকা। কাগজে লেখা থাকতো : 'The leading newspaper of Tamluk, Midnapur'. সম্পাদক : শৈলেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, কার্য্যালয় : পার্বতীপুর, তমলুক। প্রতি সংখ্যা কাগজের দাম ছিল এক আনা।

প্রদীপ[৪৫] পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল একটি সংবাদ :

'কলিকাতার মেয়র সৈয়দ বদরুদ্দোজ্জা কুইবেকে মিঃ চার্চ্চিল ও প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক তার করিয়াছেন "কলিকাতা সহরে ও বাঙ্গলা প্রদেশে খাদ্যাভাবে চরম দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। জনসাধারণে জীবনী শক্তিহীন, অনশনে অনেকের মৃত্যু হইয়াছে। ক্ষুৎপীড়িত মানবতার নামে আপনাদিগকে অবিলম্বে আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়া ও অন্যান্য দেশ হইতে জাহাজে দ্রব্য প্রেরণের অনুরোধ করিতেছি।'

প্রদীপ[৪৬] পত্রিকায় প্রকাশিত আর একটি সংবাদ এখানে উল্লেখ করা হলো :

'অজয়বাবুর বিচার

তমলুকের কংগ্রেস অধিনায়ক শ্রীযুক্ত অজয়চন্দ্র মুখার্জ্জি বৎসরাধিক কাল আত্মগোপন করিয়া থাকার পর গত সেপ্টেম্বর মাসে ধরা পড়িয়াছিলেন, প্রদীপের পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন। বেআইনী সভা করা এবং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদেশ অমান্য করা এই দুই অপরাধে তাঁহাকে অভিযুক্ত করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করা হয়। গত ১৮ই নভেম্বর স্থানীয় অতিরিক্ত এস. ডি. ও. মিঃ বি. এন. সেন ও সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ. সি. বোস মহাশয়দ্বয়ের কোর্টে এক একটি করিয়া অজয়বাবুর এই দুই

অভিযোগের বিচার হইয়া গিয়াছে। বিচারপতিদ্বয় তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া প্রত্যেকটির জন্য দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। এই দুই দণ্ড পর পর লাগিয়া চারি বৎসর পর্য্যন্ত চলিবে। অজয়বাবু মোকদ্দমায় কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই।'

বর্ধমানের পত্র-পত্রিকার ওপর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সতর্ক করে দেবার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল তমলুকের 'প্রদীপ' পত্রিকায়।

প্রদীপ[৪৭] পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল :

'বর্ধমানের "শ্রী" সম্পাদক শ্রীযুক্ত বলাই দেবশর্ম্মা ও "বর্দ্ধমানের কথা" সম্পাদক আব্দুস সাত্তারকে তাঁহাদের পত্রিকার অবাঞ্ছিত প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সতর্ক করিয়া দিয়াছেন এবং গত ১০ই এপ্রিল হইতে কাগজ নিয়ন্ত্রণ আদেশ অনুসারে "বর্দ্ধমানের কথা" প্রকাশ নিষিদ্ধ হইয়াছে।'

প্রদীপ[৪৮] পত্রিকায় প্রকাশিত সেকালের স্বদেশী আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা হলো :

'শাস্তির উপর শাস্তি

সুতাহাটার বিখ্যাত কংগ্রেস কর্মী শ্রীযুক্ত বিল্বপদ জানা ইতিপূর্ব্বে বেআইনী সভা ও অনিষ্টকর কার্য্যাদি করার জন্য ধৃত হইয়া কারাদণ্ড ভোগ করিতেছিলেন। সম্প্রতি পুলিশ কর্ত্তৃক তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্যুৎবাহিনী নামে একদল স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনে সহায়তা ও তাহাতে নেতৃত্ব করিবার অভিযোগ আনীত হইয়াছিল। তমলুকের সিনিয়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এ সি. বসুর কোর্টে ইহার বিচার হয়। বিচারে সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭(১) ১৭(২) বিধানানুযায়ী গত ২রা মে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় বিল্বপদবাবুর ৬ মাস + ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। এই দুই শাস্তিই এক সঙ্গে চলিয়া ৬ মাসেই তাঁহাদের ভোগ শেষ করিবে। এই উপলক্ষে মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে আসামীকে আনান হইয়াছিল। কিন্তু আসামী আত্মপক্ষ সমর্থনে কোন চেষ্টাই করে নাই। বিল্বপদবাবুর বিরুদ্ধে এখনও ২/৩টি অভিযোগ আছে বলিয়া শুনা যায়।'

প্রদীপ[৪৯] পত্রিকায় প্রকাশিত একটি লেখা এখানে উল্লেখ করা হলো :

'শান্তি প্রয়াস

গত ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করায় দেশব্যাপী যে আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল পরবর্ত্তীকালে তাহা তমলুক মহকুমায় এক ভয়াবহ মূর্ত্তিতে দেখা দেয়। কংগ্রেসের অহিংস অসহযোগ নীতি পরিত্যক্ত হইয়া ডাকাতি, নরহত্যা, গৃহদাহ, মানুষকে উধাও করিয়া টাকা আদায় প্রভৃতি নানা হিংস্র কার্য্যে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ চলিতে থাকে। এ যাবৎ যে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে

ইহা যে কংগ্রেসেরই কার্য্য এমন সঠিক কিছু বলা যায় না, তবে একদল প্রতিক্রিয়াশীল বিপ্লবপন্থী যে এইসব কার্য্যের মূল সেইরূপ ধারণা জন্মিবার যথেষ্ট কারণ আছে এবং এমনও শুনা যায় তাহারা নাকি কংগ্রেসের নামে এই দুষ্কার্য্যগুলি করিয়া থাকে।

ইহাতে দেশের কল্যাণকামী চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই উদ্বিগ্ন হইবার কথা। এতদিন গভর্ণমেণ্টের দমননীতির ফলে কেহ মুখ ফুটিয়া বিশেষ কিছু বলিতে পারে নাই। সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধীকে বিনা সর্ত্তে মুক্তি দেওয়ায় এবং স্বরাজ লাভের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করার আবশ্যকতা বিধায় কারাপ্রাচীরের বাহিরে অবস্থিত জেলার সুপ্রসিদ্ধ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ আজ নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা এই অন্তর্বিপ্লব প্রশমনে চেষ্টা করিবার জন্য দেশবাসীগণকে উদ্বুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন।

গত শনিবার এই উপলক্ষে সুবিখ্যাত কংগ্রেস প্রিয় উকীল ও ৺কিশোরীপতি রায় মহাশয়ের স্থলে নবনির্বাচিত এম. এল. এ. শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাস, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য শ্রীযুক্ত রামসুন্দর সিংহ, ১৯৪২ সালের জেলা কংগ্রেস সভাপতি কুয়াই-এর শ্রীযুক্ত কালীপদ রায়, সেক্রেটারী দাঁতনের শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মাহান্তি এখানে আসিয়া স্থানীয় কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন দাস, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদচন্দ্র প্রামাণিক, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ দত্ত প্রভৃতির সহায়তায় উপর্য্যুপরি মহিষাদল ও তমলুকে দুইটি জনসভার আয়োজন করেন।

সেখানে তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বলেন যে ডাকাতি, রাহাজানি, জরিমানা আদায়, গুম, হত্যার সহিত কংগ্রেসের কোন সংস্রব নাই। কংগ্রেসের নীতি চিরদিনই অহিংস। যাঁহারা এই সব দুর্নীতিপূর্ণ হিংসামূলক কার্য্য করিতেছেন, তাঁহারা ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেস কর্ম্মী হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের ব্যক্তিগত অপকর্মের জন্য কংগ্রেসকে দায়ী করা চলে না। মন্মথনাথ দাস মহাশয় আরও বলেন যে, কংগ্রেসের নাম লইলে এইসব বিপ্লবীগণ কেবল যে কংগ্রেসের দুর্ণাম ঘটাইতেছেন এমন নহে তাঁহারা সন্ত্রাসবাদের দ্বারা দেশের ঘোরতর অনিষ্টসাধন করিতেছেন। এখন ইহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া কংগ্রেসের কলঙ্ক মোচন করা, একান্ত আবশ্যক। শ্রীযুক্ত রামসুন্দর সিং বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন আমরা জাপানীদের চাহিনা, জার্ম্মানদের চাহিনা, ইংরেজদিগকেও চাহিনা, আমরা স্বরাজ চাহি। ঘরের এই অশান্তি আমাদিকেই থামাইতে হইবে। কংগ্রেসভক্ত জনসাধারণ কিছুতেই উচ্ছৃঙ্খলতা সমর্থন করিতে পারে না। তবে পুলিশ জোর জুলুম করিয়া দেশবাসীকে উত্যক্ত করায় তাহারা উভয় সঙ্কটে পড়িয়া নীরব নিশ্চেষ্ট রহিয়াছে। এখন পুলিশ যদি সহৃদয়তায় দেশবাসীগণের সহানুভূতি ও বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে পারে এবং বন্দীদের প্রতি আইনানুগ সদয় ব্যবহার করে তবে অচিরে

এই অশান্তি প্রশমিত হইবে। এই সময় আটক বন্দীদিগকে মুক্তি দিলে কাজ আরও সহজ হইত।

আমরা এইরূপ সভাসমিতি ও ভাব প্রচারের সার্থকতা খুবই উপলব্ধি করি। আজ জাপানীরা ভারত আক্রমণ করিয়াছে, এখন সঙ্ঘবদ্ধভাবে যেমন শত্রুর প্রতিরোধ ব্যবস্থা করিতে হইবে, তেমনই স্বরাজলাভের জন্যও প্রস্তুত হইতে হইবে। সুতরাং এইসব অন্তর্বিপ্লবের আশু অবসান কামনায় এক দিকে যেমন দেশবাসীকে সক্রিয় অনুরোধ উপরোধ দ্বারা বিপথগামী ভাইদিগকে সংযত করিতে বলি তেমনই সরকারী কর্ম্মচারীদিগকেও রামসুন্দর সিং মহাশয়ের কথাগুলি বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি।'

প্রদীপ[৮০] পত্রিকায় 'সাময়িকী' কলমে আর একটি লেখা ছাপা হয়েছিল। ওই লেখাটি এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

'১৯৪৫ সালের ২৫শে আগষ্ট পর্য্যন্ত মোট ৯৬৮ জন নিরাপত্তা বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। উহার মধ্যে ৬৫ জন মুক্তি পান গত ১২ই জুলাই হইতে ২৫শে জুলাই-এর মধ্যে। সম্প্রতি আবার গত ১২ই সেপ্টেম্বর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর মুক্তি ঘোষণা করা হইয়াছে। সুভাষচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ হিসাবে না হইলেও শরৎবাবু বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় নেতা, তাঁহার মুক্তিতে দেশবাসীগণ সকলেই আনন্দিত।'

প্রদীপ[৮১] পত্রিকায় সম্পাদকীয় কলমে ছাপা হয়েছিল 'বিপ্লব জিন্দাবাদ' শীর্ষক একটি লেখা। ওই লেখাটি হলো এই ঃ

'বিপ্লব জিন্দাবাদ

পরাধীনতার কলঙ্ক হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য যে দিনগুলি এতোদিন পরম বিত্তের মত জাতির অন্তরের নিভৃত কন্দরে নিহিত ছিল সেগুলি আজ স্বাধীনতার আলোকে বাতাসে আর গোপন থাকিতে পারিতেছে না। আপনিই প্রকাশিত হইয়া পাড়িতেছে। ৯ই আগষ্ট সেইরূপ একটী দিন। ঐদিন ১৯৪২ সালের আগষ্ট বিপ্লবের সূচনা হয়। "ইংরাজ ভারত ছাড়" ইহাই ছিল আগষ্ট বিপ্লবের প্রাক্কালে কংগ্রেসের দাবী। বলদৃপ্ত বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের এই দাবীকে দমাইয়া রাখিবার জন্য নেতৃবৃন্দকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। ফলে যে গণ অভ্যুত্থান হইল তাহাতে ভারত-বাসীর রক্তে ভারতের রাজপথ, পল্লী অঙ্গন পঙ্কিল হইয়া উঠিল। জনগণও প্রাণ দিল, প্রাণ নিল, সম্পত্তি নাশ করিল, বিত্ত বিসর্জ্জন দিল, স্থানে স্থানে ইংরাজ রাজের অবসান ঘটাইল। জাতির সেই আত্মত্যাগ আজ সাফল্যে রূপায়িত হইয়াছে। সেদিনকার সংগ্রামে যাঁহারা বক্ষরক্ত দানে জাতির স্বাধীনতা তরুকে সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন এই পুণ্য ৯ই আগষ্ট দিবসে দেশবাসীগণ তাঁহাদের স্মরণ না করিয়া পারে না। তাই তমলুক ও সুতাহাটায় যে বিপুল উৎসাহ ও বিরাট জনসমাবেশের মধ্যে শহীদ

স্মৃতিতর্পণ ও শহীদ পাঠাগার স্থাপিত করিল তাহা চিরস্মরণীয় হউক ইহাই কামনা করি।

তারপর ১১ই আগষ্ট আর একটী স্মরণীয় দিন। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে এমনই একদিনে বাংলার প্রথম বৈপ্লবিক যজ্ঞের অন্যতম অগ্নিহোত্রী, স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম শহীদ কিশোর ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। সেদিন পরাধীনতার বেদনায় যে কিশোর বালক উন্মাদের মত ব্যাকুল হইয়া অত্যাচারী নিধানে আগাইয়া গিয়াছিল সেই ক্ষুদিরাম এই মেদিনীপুরেরই সন্তান—এই তমলুক হ্যামিল্টন স্কুলেরই ছাত্র। মেদিনীপুর সে গৌরব এতদিন প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেও মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করিতে পারে নাই। আজ সে মুক্তির আস্বাদে তাহার প্রথম উৎসর্গকে গর্ব্বভরে স্মরণ করিতেছে। বিশেষ করিয়া তমলুকের ছাত্র কংগ্রেস, আজাদহিন্দ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সহযোগিতায় সকালে শঙ্খধ্বনি প্রভাতফেরী, ৮টায় পতাকা উত্তোলন, সামরিক কায়দায় সহর প্রদক্ষিণ, ১০টায় পতাকা অর্দ্ধনমিত করিয়া শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, এবং অপরাহ্নে শোভাযাত্রা ও বিরাট সভা করিয়া যেভাবে প্রথম শহীদের স্মৃতিতর্পণ করিয়াছে তাহা খুবই প্রশংসনীয়। এই সভায় শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত প্রামাণিক সভাপতি, শ্রীযুক্ত অজয়কুমার মুখার্জী প্রধান অতিথিরূপে ছাত্রদের ক্ষুদিরামের মত বীর দেশপ্রাণ ও সমাজসেবক হইতে উপদেশ দেন। দেশবাসী ও ছাত্রদের সঙ্গে আমরাও বলি "জয় ক্ষুদিরাম"।'

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সময় প্রকাশিত হয়েছিল, মেদিনীপুরের দেশকর্মীদের কাগজ 'বিপ্লবী'। একদিন এই কাগজ ইংরেজ পুলিশের গোয়েন্দাবাহিনী বোমা-পিস্তলের মতো ভয়ের চোখে দেখতো। যাঁর কাছে সেদিন এক কপি 'বিপ্লবী কাগজ পুলিশ উদ্ধার করতো, তাঁর ওপর চালাতো নির্মম অত্যাচার। আজও সেইসব কথা মেদিনীপুর জেলায় অসংখ্য মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে ঘুরছে। কিছুদিন আগেও মেদিনীপুরের পটুয়ারা পট দেখিয়ে সেই সব কথা গান গেয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রকাশ করতেন। ১৯৪৩ সালের 'বিপ্লবী' পত্রিকার একটি কপি আমাকে সংগ্রহ করে দেন—মেদিনীপুরের সর্বাধিক জনপ্রিয় সংবাদপত্র 'প্রদীপ' পত্রিকার (তমলুক) সম্পাদক ঃ চিত্তরঞ্জন কুণ্ডু।

'বিপ্লবী' ছিল তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের মুখপত্র। তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হতো। কাগজে লেখা থাকতো—'অপরকে পড়তে দিন'। সেদিন এই কাগজ হাতে হাতে ঘুরতো। অসংখ্য পাঠক পড়তেন 'বিপ্লবী' পত্রিকা। বিপ্লবী[২] পত্রিকায় লেখা হয়েছিল ঃ

'তমলুকে নবযুগ

স্বাধীন তাম্রলিপ্তে জাতীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্ত্তন

পৌণে দুইশত বছরের ইংরাজ শাসন ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক,

কৃষ্টিগত ও আধ্যাত্মিক ধ্বংস সাধন করেছে। শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, মনুষ্যত্বে সব দিক দিয়ে ভারতের····· সাধন করেছে। তাই এই অত্যাচার, উৎপীড়ন ও শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত বিদেশী দুঃশাসনকেও ধ্বংস করাই প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম। গত·· বৎসর ধরে ভারতীয় জাতীয় মহাসভা (কংগ্রেস) এই চেষ্টা করে আসছে। এই বারে স্বাধীনতার এই শেষ যুদ্ধ চলেছে। এই যুদ্ধে হয় বিজয় নয় মরণ। হাজার হাজার বৎসরের কৃষ্টি ও সভ্যতার লীলাভূমি ভারত কখনও মরতে পারে না। তাই বিজয় এবারে সুনিশ্চিত, এখনও ভারত পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করতে পারে নি বটে, কিন্তু স্থানে স্থানে স্বাধীন রাষ্ট্র দানা বেঁধে উঠেছে। এইগুলির বিস্তার ও মিলনেই স্বাধীন ভারতের গণতন্ত্র গড়ে উঠবে। মেদিনীপুর জেলায় তমলুক মহকুমায় বীর অধিবাসীদের ২৯শে সেপ্টেম্বরের (১৯৪২) একটিমাত্র প্রচণ্ড আঘাতে এই মহকুমায় বৃটিশ রাজের পরম আরামের সুখ-শাসন তাসের ঘরের মত মুহূর্ত্তে ভেঙ্গে পড়েছে। তখন থেকে চলেছে অস্ত্রেশস্ত্রে ও সৈন্য-সামন্তে সুরক্ষিত কয়েকটিমাত্র ছোট ছোট ঘাঁটি থেকে পল্লী অঞ্চলে বৃটিশ পশুর অবাঞ্ছনীয় অত্যাচার। এইভাবে তমলুক মহকুমা সম্প্রতি এমন এক অবস্থার মধ্যে এসে পড়েছিল যে ঐ রকম চরম অরাজক মগের মুল্লুক অবস্থা আর চলতে দেওয়া যায় না। তাই মহাকুমা কংগ্রেস শুভ ১লা পৌষ (১৭।১২।৪২) থেকে 'মহাভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত "তাম্রলিপ্ত মহাকুমা জাতীয় শাসনব্যবস্থা" সংক্ষেপে "তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার" প্রবর্ত্তন করেছে। ভাবী মহাভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক শাসনের সংকল্পে নিয়ে বর্ত্তমান অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য পুনর্ব্যবস্থা না করা পর্য্যন্ত একজন "সর্ব্বাধিনায়কের" ওপর জাতীয় শাসনের সকল দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। তিনি তাঁর মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করে নিয়ে শাসন চালাচ্ছেন। ঠিক এইভাবে ২৬শে জানুয়ারী (১৯৪৩) "স্বাধীনতা দিবসে" (১২ই মাঘ ১৩৪৯) নন্দীগ্রাম, মহিষাদল, সুতাহাটা ও তমলুক থানায় এক একজন অধিনায়কের উপর মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করে নিয়ে "থানা জাতীয় সরকার" চালাবার ভার দেওয়া হয়েছে। আশা ও বিশ্বাস করি তমলুক মহকুমাবাসী তাহাদেরই "জাতীয় সরকারকে" শক্তি, সমর্থন, অর্থ ও আনুগত্য দিয়ে এই মহকুমা থেকে বৃটিশ শাসনের সকল চিহ্ন একেবারে ধুয়ে মুছে ফেলে পূর্ণ নবযুগের প্রবর্ত্তন করবে। হয় জয় নয় মৃত্যু, বন্দেমাতরম।

মহকুমার সর্ব্বাধিনায়ক

শ্রীসতীশচন্দ্র সামন্ত। থানার অধিনায়কগণ : মহিষাদল থানা : শ্রীনীলমণি হাজরা। নন্দীগ্রাম থানা : শ্রীকুঞ্জবিহারী ভক্তদাস। তমলুক থানা : গুনধর ভৌমিক। সুতাহাটা থানা : শ্রীজনার্দ্দন হাজরা।

মহাভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র, জেলা মেদিনীপুর, বঙ্গদেশ। তমলুক মহকুমা-তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার।'

বিপ্লবী[৩] কাগজে লেখা হয়েছিল ঃ

তমলুকে জাতীয় সৈন্যবাহিনী

বিদেশী শত্রুর ইংরাজ শাসন সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য এবং দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া স্বাধীন তমলুকে গণতান্ত্রিক সুশাসন চালাইবার জন্য (১লা পৌষ ১৩৪৯, ১৭।১২।৪২) হইতে যে 'তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহারই অঙ্গস্বরূপে থানায় থানায় যে "থানা জাতীয় সরকার" প্রতিষ্ঠিত হইয়া......ভারতীয় "স্বাধীনতা দিবসের" শুভ দিনে (২৬শে জানুয়ারী ১৯৪৩, ১২ই মাঘ, ১৩৪৯) শুরু করা হইয়াছে—তাহাদের সফলতার মূলে ছিল, তমলুক মহকুমাবাসীদের সাহস, বীরত্ব ও আত্মত্যাগ। এই বীরবৃন্দকে সংঘবদ্ধ করিয়া শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিয়োজিত করিয়াছিল......মহকুমার সুশিক্ষিত কর্মীগণ। এই দেশ সেবকদলের অগ্রণী ছিল "বিদ্যুৎবাহিনী"। আজ এই স্বাধীনতা দিবসে (২৬শে জানুয়ারী—১৯৪৩) সেই বিদ্যুৎবাহিনীকে সমগ্র মহকুমায় "তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের দলে......করা হইল। সর্ব্বাধিনায়ক।'

বিপ্লবী[৪] কাগজে আরও লেখা হয়েছিল ঃ

জরিমানা—স্বাধীন তাম্রলিপ্তে শত্রু পক্ষকে সাহায্য করিয়া দেশদ্রোহিতা করার অপরাধে জানুয়ারী মাসের প্রথম তিন সপ্তাহে "জাতীয় সরকারের" বিচারালয়ে মহিষাদল থানার ৭জন অধিবাসীর উপর ১৬০০৲ টাকা জরিমানা করা হইয়াছে। প্রাথমিক অপরাধ হিসাবে বিচারকগণ এই লঘু দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অপরাধীরা এই ন্যায়বিচারে সন্তুষ্ট হইয়া অবিলম্বে জরিমানার টাকা জাতীয় আদালতে দাখিল করিয়াছে।

মাল ক্রোক ঃ—মহিষাদল থানার শান্তি রক্ষাবাহিনী জাতীয় সরকারের গ্রেপ্তারী-পরোয়ানা (দেশদ্রোহিতার অভিযোগ যুক্ত) লইয়া মহিষাদল থানার ৩নং ইউনিয়নের শত্রু পক্ষীয় আদায়কারী পঞ্চায়েৎ (চৌকীদারী ট্যাক্সের) নামে···কামারদা গ্রামের শ্রীরত্নেশ্বর সাহকে গ্রেপ্তার করিতে যাইলে সে পলায়ন করে। এই পলাতক আসামীর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করা হয়। তাহাকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে ৭ দিনের মধ্যে আত্মসমর্থন না করিলে ঐসব মাল প্রকাশ্য নিলাম করা হইবে।'

সেদিন 'বিপ্লবী' কাগজে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন সংবাদ প্রকাশিত হতো। মেদিনীপুরের বিভিন্ন গ্রামে কোথায় কোন দেশকর্মীকে পুলিশ-বাহিনী গিয়ে অত্যাচার চালালো তার সংবাদ থাকতো 'বিপ্লবী' কাগজে।

'আনন্দবাজার পত্রিকার' কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন জেলায় ঘুরে পুরাতন পত্র-পত্রিকার খোঁজ করার সময় জনৈক সহৃদয় ব্যক্তির

কাছে একটি পুরাতন আনন্দবাজার পত্রিকা চোখে পড়ে। এই কাগজটির রঙ লাল। ইহা দোল পূর্ণিমা সংখ্যা, এই কারণে হয়তো আবীর রাঙা রঙ নিয়ে সেদিন আনন্দবাজার পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। নব পর্য্যায় ৩য় বর্ষ, ২৯৯ সংখ্যা। মঙ্গলবার ২৬শে ফাল্গুন ১৩৩১, (10th March 1925) সম্পাদকঃ সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। ৭১/১ নং মির্জাপুর স্ট্রীট, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। আট পৃষ্ঠা কাগজের দাম ছিলঃ দুই পয়সা।

আনন্দবাজার পত্রিকায়[৫৫] প্রকাশিত হয়েছিল মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতা। ওই সময় মহাত্মাজী মাদ্রাজে যান। মাদ্রাজ কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল। মহাত্মাজী মাদ্রাজে যা বলেছিলেন তার কিছু অংশ হলো এইঃ

'আমি মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্য ভালবাসি, কিন্তু ভাগ্য আমাকে অন্যপথে পরিচালিত করিয়াছে। আমার জীবনের এক সময়ে মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্য করিবার জন্য বিশেষভাবে চিন্তা করিয়াছি। এই জন্য খুব কঠোর পরিশ্রমের সহিত ধীর গতিতে কার্য্য করা আবশ্যক। আমি আমাকে একজন ধাঙ্গড়রূপে অভিহিত করি, কারণ আমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় বিশ্বাস করি—আমি আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক উভয়রূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় বিশ্বাস করি।

আমি মাদ্রাজে একজন অভ্যাগত নই, আমি অনেক সময় মাদ্রাজে অবস্থান করিয়াছি এবং মাদ্রাজ শহরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি, কিন্তু কোন সময়ই আমি সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই, কারণ খুব প্রাতে আমি মাদ্রাজের রাস্তায় ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়া রাস্তা অত্যন্ত কদর্য্য দেখিয়াছি।......'

আনন্দবাজার পত্রিকায়[৫৬] ছাপা হয়েছিল মহাত্মা গান্ধী মিউনিসিপ্যাল কার্য্যের মূল্য প্রসঙ্গে যা বলেছিলেনঃ

'ধাঙ্গড়ের কাজ যে একটা মহৎ কাজ, আমি আশা করি আপনারা সকলেই ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। অবশ্য এই কার্য্যে অন্যান্য কার্য্যের মত আমরা যশোলাভ করিতে পারি না। আমাকে কেহ যেন ভুল বুঝেন না। এই সূত্রে আমি এই বলিতে চাই না যে, আমাদের জীবনের অন্যান্য কাজ মিউনিসিপ্যাল কার্য্যের অপেক্ষা হেয়। আমি কেবল এই কথাই বলিতেছি, আমরা মিউনিসিপ্যাল কার্য্যের প্রতি অন্যান্য কাজের তুলনায় অত্যন্ত হেলা প্রদর্শন করিয়া থাকি।'

একদিন দেশপ্রেমিকেরা নানাভাবে দেশবাসীকে স্বাধীনতার জন্য উদ্বুদ্ধ ও উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছিলেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করে স্বাধীনতার বাণী দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতেন। অজস্র লেখা তাঁরা

লিখেছিলেন। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পরে ওই সব পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ করার চেষ্টা ভালভাবে হয়নি। চেষ্টা করলে বহু লুপ্তরত্নের পুনরুদ্ধার করা যেত। সেদিনের দেশপ্রেমিকদের লেখাগুলি বর্তমানেও দেশবাসীকে চলার পথ দেখাতো।

দেশের মানুষকে জাগিয়ে তোলার কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন প্রধানতঃ সেদিনের স্বাধীনতার সমর্থক পত্র-পত্রিকার সাংবাদিকরা। ইংরেজ সরকার মানুষের মৌলিক অধিকারও স্বীকার না করে, স্বাধীনতার সমর্থক পত্র-পত্রিকাগুলি দমনের জন্য নানাভাবে কুৎসিতরূপে সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল। কিন্তু সেদিন দেশ ও জাতির জন্য একদল উৎসর্গীকৃত প্রাণ ও নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক এই ব্রতে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য স্বাধীনতার বাণী দেশের দিকে দিকে প্রচারিত হয়েছিল। সেইসব সাংবাদিক ও পত্র-পত্রিকার গৌরবোজ্জ্বল এবং কৃতিত্বপূর্ণ কার্য আজও দেশবাসীর মনে নতুন ভাবে উৎসাহ জাগায়। সেদিন তাঁরা জাতীয় জীবনের এক অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্বের মধ্যে দেশবাসীকে আলো ও পথ দেখিয়েছিলেন। দেশবাসীর হৃদয় তাঁদের কাজে উল্লসিত হয়েছিল। সেইসব মহান দেশকর্মীদের কথা সংক্ষিপ্ত ভাবে এখানে উল্লেখ করা হলো। সেকালে ছোট বড় সব কাগজের সাংবাদিকরা পরাধীনতার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াই করেছিলেন। ওই লড়াই ছিল তাঁদের সাংবাদিক জীবনের সব চেয়ে বড় ব্রত। একদিন যে সব পত্র-পত্রিকা ইংরেজ সরকারের কাছে স্বরাজ বা স্বাধীনতার সমর্থক ছিল এবং বিপ্লবীদের জয়গানকারীরূপে পরিচিত ছিল, সেইসব পত্রিকার মধ্যে মাত্র কয়েকটির নাম এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

কোন কোন পত্র-পত্রিকায় স্বাধীনতার কথা প্রকাশের জন্য তৎকালীন সরকারী আমলাদের রক্তচক্ষু, ইংরেজ বিচারপতিদের অপমানজনক মন্তব্য, এবং অনেক কাগজের পরিচয় সরকারী নথিপত্রে লেখা হয়েছিল ঃ 'Deals in Politics. Extremist in tone', অথবা 'An Extremist (Swarajist) Paper' রূপে চিহ্নিত হয়েছিল। এই সব কাগজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন সেকালের দেশকর্মীরা। ওই সব পত্র-পত্রিকা ছাড়া আরও বহু কাগজ স্বদেশী আন্দোলনের সময় প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু অধিকাংশ কাগজ আজ আর দেখা যায় না।

এই গ্রন্থে আলোচনার বিষয় ১৯০৫ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন বাংলা পত্র-পত্রিকা নিয়ে। এই প্রসঙ্গে সেকালের নামকরা কাগজ 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার কথাও উল্লেখ করা দরকার। ১৯০৬ সালে ৫ই মে, ১৩১৩ বাংলা সনের ২২শে বৈশাখ, শনিবার, ২৫শ ভাগ, ২৬ সংখ্যা 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় উল্লেখ আছে, উক্ত কাগজ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। অফিস ছিল ৩৮/২ নং ভবানীচরণ দত্ত স্ট্রীট, কলকাতা। কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ বরদা প্রসাদ

বসু। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সাইজ ছিল লম্বা সাড়ে আটত্রিশ ইঞ্চি এবং প্রস্থে তেইশ ইঞ্চি। বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছিল। বঙ্গবাসী ছিল সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র। একটি সরকারী রিপোর্টে বলা হয়েছিল, সম্পাদক: হরিমোহন মুখোপাধ্যায়। প্রকাশকের নাম: নটবর চক্রবর্তী, প্রচার সংখ্যা প্রায় ১৬,০০০ ছিল। কাগজের ডিক্লারেশনের তারিখ ২৯ আগষ্ট ১৯০৫ সাল। উক্ত রিপোর্টে General remarks as to tone, influence, etc. and particulars ইত্যাদি কলমে উল্লেখ করা হয়েছিল: Extremist in tone. An influential organ of the orthodox Hindu Community. সরকারী রিপোর্টে উল্লেখ ছিল: বরদাপ্রসাদ বসু বর্ধমানের লোক ছিলেন। ছাপাখানার নাম: বঙ্গবাসী ইলেক্‌ট্রো মেশিন প্রেস।

এবার একটি দৈনিক সান্ধ্য পত্রিকা প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা উল্লেখ করে বক্তব্য শেষ করবো। যে সংবাদ পত্রের কথা উল্লেখ করছি, সেই সংবাদ-পত্রের নাম: 'বৈকালী'। বেশিদিনের কথা নয়। কিন্তু বর্তমানে 'বৈকালী' একটি দুষ্প্রাপ্য সংবাদপত্র বলা যেতে পারে। এই সংবাদ-পত্রের সম্পাদক ছিলেন সেকালের অবিভক্ত বাংলার খ্যাতনামা নেতা এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের দক্ষিণ হস্ত রূপে পরিচিত, অর্থাৎ নির্মলচন্দ্র চন্দ্র। 'বৈকালী' সংবাদপত্রের অফিস ছিল: ২৩ নং ওয়েলিংটন স্ট্রীট। বর্তমানে কলকাতায় ওই রাস্তার নামকরণ নির্মলচন্দ্র চন্দ্র স্ট্রীট হয়েছে। ইনি বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। মৃত্যুকালে কলকাতা মহানগরীর মেয়র পদে আসীন ছিলেন। একবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ও দুবার কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ইনি ডককর্মী, ট্রাম শ্রমিক ও চা-বাগানের শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নানাভাবে বিপ্লবীদের সহায়তা করেছিলেন। সেই সব বহু ঘটনা বর্তমানে কাহিনীর মতো মনে হবে। সেকালে 'লিগ অফ নেশন'-এর পঞ্চ বৃহৎ শক্তির মতো, কলকাতার খ্যাতনামা সাংবাদিকরা একটি কথা চালু করেছিলেন। তাঁরা লিখতেন, 'বাংলার পঞ্চ প্রধান'। পঞ্চ প্রধান বলতে বাংলার পাঁচজন খ্যাতনামা রাজনৈতিক নেতাকে বোঝাত। যেমন: ১. বিধানচন্দ্র রায়, ২. শরৎচন্দ্র বসু, ৩. নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, ৪. নলিনীরঞ্জন সরকার, ৫. তুলসী গোস্বামী। 'বৈকালী' সম্পাদক ওই পঞ্চ প্রধানের একজন ছিলেন। তা' ছাড়া সেকালে বাংলার রাজনৈতিক মহলে তাঁর আর একটি নাম ছিল। তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে অনেকে 'বড়বাবু' বলতেন। শিক্ষা পাণ্ডিত্যের কথা ছাড়াও তাঁর হৃদয় বিরাট ছিল। মনের দিক দিয়ে সত্যি তিনি বড় ছিলেন। তিনি রাজনৈতিক কর্মীদের স্বাধীনতা আন্দোলনে সাহায্য করেছিলেন নানাভাবে। অকৃপণভাবে স্বরাজের জন্য অর্থদান করতেন। প্রধানতঃ এই কারণে তাঁকে 'বড়বাবু'

বলা হতো। এই প্রসঙ্গে দৈনিক বসুমতী (২৮ কার্ত্তিক ১৩৩০, ১৪ নভেম্বর। ১৯২৩, কলকাতা সংস্করণ) সংবাদপত্রে প্রকাশিত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের একটি পত্র এখানে উল্লেখ করা হলোঃ

'আমার অনুরোধ মতো শ্রীযুত নির্মলচন্দ্র চন্দ্র কলকাতা উত্তর মধ্য অমুসলমান নির্বাচন কেন্দ্র হইতে কাউন্সিলের সদস্যপদ প্রার্থী হইয়াছেন। স্বরাজ্য দলের কাউন্সিল তাঁহাকে উক্ত দলের একজন প্রতিনিধি বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। আমার বিশ্বাস, আমার কারাগমনের পূর্বে যেরূপভাবে তিনি আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, এখনও সেইরূপ শ্রদ্ধার সহিত তিনি আমাকে সাহায্য করিবেন। শুনিলাম, কয়েকজন স্বার্থান্ধ ব্যক্তি বাজারে রটাইতেছে যে, নির্মলবাবু তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিবার প্রতিশ্রুতি করিয়া টাকা দেন নাই। এই গুজব সম্পূর্ণ মিথ্যা আমি ভালরূপেই জানি, তিনি ঐ প্রতিশ্রুতি অর্থ প্রদান করিয়াছেন। আমি এই নির্বাচন কেন্দ্রের সকল দেশপ্রেমিক ভোটদাতাকে নির্মলবাবুর পক্ষে ভোট দিতে অনুরোধ করিতেছি। তাহার অপেক্ষা অধিকতর উপযুক্ত লোক নাই। (স্বাঃ) সি· আর· দাশ।'

আবার ফিরে আসা যাক আমাদের 'বৈকালী' সংবাদপত্র প্রসঙ্গে। আগে উল্লেখ করা হয়েছে, বৈকালী ছিল সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকা। সাইজ ছিল লম্বা বাইশ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ষোল ইঞ্চি। কাগজ চার পৃষ্ঠার। মূল্য দুই পয়সা। কাগজ ছাপা হতোঃ ১৬৬ নং বহুবাজার স্ট্রীট, বসুমতী বৈদ্যুতিক রোটারী মেশিনে। পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতো।

বৈকালী পত্রিকা ৭ই মাঘ, সন ১৩৩০ সাল, ২১ জানুয়ারি ১৯২৪, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় কিছু অংশ হলো এইঃ

'বৈকালীর আত্মপ্রকাশের পূর্বেই বাঙলা দেশের নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক প্রকারের আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে। অনেকে প্রশ্ন করিতেছেন যে, এতগুলি বাঙলা দৈনিক থাকা সত্ত্বেও আবার নূতন দৈনিকের প্রয়োজন কি? এই পত্রিকা কি মতামত প্রচার করিবে, ইহা জন-সাধারণের মতামত গঠন করিবে, না সাধারণের মতকেই প্রচার করিবে, তাহাই চারিদিকে অনেক প্রকারের জল্পনা চলিতেছে।

"বৈকালী" সবন্ধে নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা প্রকারের প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে তাহা আমরা জানি, কিন্তু আমরা কি করিব, অথবা কি না করিব, তাহা লইয়া আগে হইতেই বাক্যের জাল বিস্তার করিয়া সাধারণের চক্ষুর সম্মুখে কোনও চমৎকার চিত্র ধরিব না। আমাদের পরিচয় ক্রমশঃ আমাদের লেখার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইবে। তবে আমাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মোটামুটি কয়েকটি কথা "আমাদের কথা"য় প্রকাশ করা হইয়াছে।

"বৈকালী" সান্ধ্য-পত্রিকা। ইহা প্রত্যহ বিকালে প্রকাশ পাইবে। কলিকাতায় বাঙলা সান্ধ্য-দৈনিক আরও অনেক আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে সে দিনের সংবাদ খুবই কম থাকে, অধিকাংশ সংবাদই পূর্বদিনের। আমরা বাঙলা সংবাদপত্র পাঠকদিগের এই অসুবিধা দূর করিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। "বৈকালী"তে যতদূর সম্ভব, সেই দিনেরই সংবাদ প্রকাশ করা হইবে।

পাঠকদিগকে "বৈকালী" সম্বন্ধে আর একটি কথা জানাইয়া রাখি। "বৈকালী" কেবলমাত্র রাজনীতির আলোচনা করিবে না। কেবলমাত্র রাজনীতির আলোচনায় আমাদের জাতীয় জীবন চারিদিক দিয়াই অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে। যাঁহারা রাজনীতিক গগনে মুক্ত পক্ষে বিচরণ করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ সামাজিক পিঞ্জরে নিজেদের বাঁধিযা রাখিবার চেষ্টা করেন—এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

শুধু সামাজিক ব্যাপার বলিযা নহে, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাহিত্য, শিল্প ইহাদের প্রত্যেকেরই প্রত্যেকের সহিত অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে। একটিকে ছাড়িয়া অন্য অগ্রসর হইতে পারিবে না, ইতিহাসের কোনও যুগে হয়ত ইহা সম্ভব ছিল, কিন্তু এ যুগে তাহা সম্ভবপর নহে। সেজন্য আমরা রাজনীতিক ছাড়াও অন্য সকল বিষয়েরও আলোচনা করিব, হয়ত ইহার জন্য অনেকের সহিত অমাদের বিচ্ছেদ ঘটিবে, কিন্তু আমাদের আশা ও বিশ্বাস যে, সে বিচ্ছেদ ক্ষণস্থায়ী এবং এই জন্য আমাদের যে নূতন বন্ধুলাভ হইবে সে বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী হইবে।......'

প্রসঙ্গপঞ্জী

১ অমলেন্দু দে, কাফেলা (সৈয়দা মোতাহেরা বানু), ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ১৩
২ অমলেন্দু দে, পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২৩
৩ অমলেন্দু দে, পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২৩
৪ শারদীয়া দৈনিক কৃষক, (১৩৫৩)
৫ ভারত (শারদীয়া সংখ্যা) ১৩৪৭
৬। Nadig Krishna Murthy, Indian Journalism (Origin, growth and development of Indian Journalism) 1966, Page 227,
৭ নবযুগ (সচিত্র সাপ্তাহিক), ৯ই মাঘ ১৩৩২, ইং ২৩শে জানুয়ারী ১৯২৬
৮ নবযুগ (সচিত্র সাপ্তাহিক), ১৬ই শ্রাবণ, ১৩৩২
৯ নবযুগ (সচিত্র সাপ্তাহিক), ৩০শে শ্রাবণ ১৩৩২

১০ নবযুগ (সচিত্র সাপ্তাহিক), ২৭শে ভাদ্র ১৩৩২
১১ জয়শ্রী (সচিত্র মাসিক পত্র), আষাঢ়, ১৩৪১
১২ জয়শ্রী (সচিত্র মাসিক পত্র). আষাঢ় ১৩৪১
১৩ জয়শ্রী (সচিত্র মাসিক পত্র), শ্রাবণ ১৩৪১
১৪ জয়শ্রী (সচিত্র মাসিক পত্র). আষাঢ় ১৩৪২
১৫ কলিকাতা, ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৩৭
১৬ কলিকাতা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৭
১৭ স্বরাজ (শারদীয়া সংখ্যা—১৩৫৩)
১৮ কল্লোল, চতুর্থ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা (১৩৩৩ সাল) পৃষ্ঠা ৩৬৩
১৯ উদয়ন, আশ্বিন ১৩৪০, প্রথম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৭৬৬
২০ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্লাইভ স্ট্রীট. ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪০
২১ গল্পলহরী, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৩৯
২২ প্রাচী, ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা শ্রাবণ ১৩৩০, পৃষ্ঠা ১৯৮
২৩ Hemendra Prasad Ghosh, The Newspaper in India, (University of Calcutta, 1952), Page 73.
২৪ কাশীপুর নিবাসী (বরিশাল), ৭১ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৪ঠা বৈশাখ ১৩৫৩, ১৭ই এপ্রিল ১৯৪৬
২৫ The Hare School Magazine, Vol VIII, No. 4, December 1923, and Vol IX, No. 1. February 1924.
২৬ বঙ্গবাণী, ২য় খণ্ড, ১৪২শ সংখ্যা, কলিকাতা, রবিবার, ১৮ই মাঘ ১৩৩৭, ইং ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৩১, পৃষ্ঠা ৩
২৭ বঙ্গবাণী, পূর্বে উল্লিখিত তারিখের কাগজ, পৃষ্ঠা ৫
২৮ বঙ্গবাণী, পূর্বে উল্লিখিত তারিখের কাগজ, পৃষ্ঠা ৪
২৯ বঙ্গবাণী, পূর্বে উল্লিখিত তারিখের কাগজ, পৃষ্ঠা ৪
৩০ বঙ্গবাণী, পূর্বে উল্লিখিত তারিখের কাগজ, প্রথম পৃষ্ঠা
৩১ বঙ্গবাণী, পূর্বে উল্লিখিত তারিখের কাগজ, প্রথম পৃষ্ঠা
৩২ বঙ্গবাণী, পূর্বে উল্লিখিত তারিখের কাগজ, পৃষ্ঠা ৫
৩৩ বঙ্গবাণী, ২য় খণ্ড, ১৬৯শ সংখ্যা, কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ২১শে ফাল্গুন ১৩৩৭, ইং ৫ই মার্চ্চ ১৯৩১
৩৪ বঙ্গবাণী, পূর্বে উল্লিখিত তারিখের কাগজ, পৃষ্ঠা ৪
৩৫ বঙ্গবাণী, পূর্বে উল্লিখিত তারিখের কাগজ, পৃষ্ঠা ৪
৩৬ বঙ্গবাণী, পূর্বে উল্লিখিত তারিখের কাগজ, পৃষ্ঠা ৫
৩৭ বঙ্গবাণী, পূর্বে উল্লিখিত তারিখের কাগজ, পৃষ্ঠা ৫

৩৮ নবশক্তি, ২য় বর্ষ, ২৬শ সংখ্যা. শুক্রবার, ৮ই ফাল্গুন ১৩৩৭, ইং ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩১

৩৯ দৈনিক বসুমতী, ২৪ বর্ষ, ৩০৪ সংখ্যা, কলিকাতা, শনিবার ৩রা ভাদ্র. ১৩৪৫, ২০শে আগষ্ট ১৯৩৮। পৃষ্ঠা ৫, সম্পাদকঃ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, ১৬ পৃষ্ঠা কাগজের দাম ছিল—দুই পয়সা

৪০ চিন্মোহন সেহানবীশ, রুশ বিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী (১৯৭৩)

৪১ মৎস্যজীবী, ভাদ্র ১৩৪০

৪২ মন্দিরা, বৈশাখ ১৩৫৩, পৃষ্ঠা ৯৩

৪৩ মন্দিরা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩, পৃষ্ঠা ১৭৯

৪৪ মন্দিরা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩, পৃষ্ঠা ১৮৪

৪৫ প্রদীপ, ২য় বর্ষ ৬৭ সংখ্যা, ৬ই ভাদ্র ১৩৫০ ; ২৩শে আগষ্ট ১৯৪৩

৪৬ প্রদীপ, ২য় বর্ষ ৭৮ সংখ্যা. ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৫০ ; ২৯শে নভেম্বর ১৯৪৩

৪৭ প্রদীপ, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৪ঠা বৈশাখ ১৩৫১, 17th April 1944

৪৮ প্রদীপ, ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ২৫শে বৈশাখ ১৩৫১ ; ৮ই মে ১৯৪৪

৪৯ প্রদীপ, ৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১লা জৈষ্ঠ ১৩৫১, 15th May 1944.

৫০ প্রদীপ, ৩১শে ভাদ্র ১৩৫২, 17th September 1945.

৫১ প্রদীপ, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৬শ সংখ্যা. ২২শে শ্রাবণ ১৩৫৪ ; ১১ই আগষ্ট ১৯৪৭

৫২ বিপ্লবী, ২৬শ সংখ্যা, জাতীয় সরকার সংখ্যা, ২৬শে জানুয়ারী ১৯৪৩

৫৩ বিপ্লবী, পূর্বে উল্লিখিত সংখ্যা

৫৪ বিপ্লবী, পূর্বে উল্লিখিত সংখ্যা

৫৫ আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬শে ফাল্গুন ১৩৩১ ; ১০ই মার্চ ১৯২৫

৫৬ আনন্দবাজার পত্রিকা, পূর্বে উল্লিখিত সংখ্যা

পরিশিষ্ট

তৎকালীন সরকারের চোখে কয়েকটি নিষিদ্ধ পত্র এবং রাজনৈতিক ইস্তাহারের কয়েকটি সংক্ষিপ্ত তালিকা উল্লেখ করা হলো। সরকারের হোম (প্রেস) ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক নিষিদ্ধ করার সাল দেওয়া হলো।

১ স্বাধীনতা দিবস, বিনয়কৃষ্ণ বসু. বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, (১৯৩২)
২ রুদ্রের আহ্বান. বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সংঘ (B·P·S·A·) কর্তৃক প্রকাশিত, (১৯৩২)
৩ পেশোয়ার স্মৃতি দিবস, (১৯৩২)
৪ নিখিল বঙ্গ ছাত্র স্মৃতি প্রচার পত্র. (১৯৩২)
৫ দেশবাসীর প্রতি নিবেদন, লাবণ্যপ্রভা দত্ত. ২৪-পরগণা জেলা কংগ্রেস কমিটি (১৯৩২)
৬ কংগ্রেস নির্দেশ, উত্তর কলিকাতা কংগ্রেস কমিটি. (১৯৩২)
৭ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বুলেটিন—'স্বাধীনতা', তারিখ ৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৩২, (১৯৩২)
৮ বিপ্লবের ডাক, (১৯৩২)
৯ আবেদন, দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস সংগ্রাম সমিতি. (১৯৩২)
১০ সাবাস বিমল, সাবাস (১৯৩১)
১১ সাবাস মেদিনীপুর, (১৯৩১)
১২ রক্ত চাই, শুদ্ধ রক্ত চাই, (১৯৩১)
১৩ অত্যাচারীর ধ্বংস চাই. (১৯৩১)
১৪ নিবেদন, কমিউনিষ্ট পার্টি অফ ইণ্ডিয়া, কলিকাতা কমিটি, (১৯৩০)
১৫ রক্ত আমার লেগেছে আজ সর্বনাশের নেশা, কলিকাতা, (১৯২৯)
১৬ বাংলার তরুণের প্রতি, (১৯২৯)
১৭ দেশবাসীর প্রতি নিবেদন, শচীন সান্যাল, শান্তিপুর, (১৯২৫)
১৮ হিন্দু-মুসলমান কি জয়. কংগ্রেস খিলাফত কমিটি (১৯২১)
১৯ সংগ্রাম (চট্টগ্রাম), (১৯৪০)
২০ চটকলের মজুর ভাই-বোন, প্রকাশকঃ কমিউনিষ্ট পার্টি অফ ইণ্ডিয়া, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি. (১৯৪০)
২১ লাল নিশান, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, প্রকাশকঃ কমিউনিষ্ট পার্টি অফ ইণ্ডিয়া, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি. (১৯৪০)

২২ চটকল মজদুর বুলেটিন, প্রকাশকঃ কমিউনিষ্ট পার্টি অফ ইণ্ডিয়া, (১৯৪০)

২৩ বাংলা দেশের কংগ্রেস কর্মীর প্রতি বিপ্লবী সমাজবাদী পার্টির নিবেদন, প্রকাশকঃ অজিত কুমার বসু, ৮২, হ্যারসন রোড কলিকাতা, (১৯৪০)

২৪ জাতীয় ইস্তাহার, নং ১, তারিখ ১৪ জুলাই ১৯৪০, প্রকাশকঃ ফরওয়ার্ড ব্লক, (১৯৪০)

২৫ অভিযান, (দ্বিতীয় সংখ্যা), প্রকাশকঃ কমিউনিষ্ট পার্টি অফ ইণ্ডিয়া, (১৯৪০)

২৬ বলশেভিক পার্টির ইস্তাহাব, প্রকাশকঃ বলশেভিক পার্টি অফ ইণ্ডিয়া, কলিকাতা, (১৯৪০)

২৭ সিভিক গার্ড না বিভীষণ বাহিনী. প্রকাশকঃ কমিউনিষ্ট পার্টি অফ ইণ্ডিয়া, (১৯৪০)

২৮ কর্পোরেশন শ্রমিকদের প্রতি কমিউনিষ্ট পার্টির আবেদন. প্রকাশকঃ কমিউনিষ্ট পার্টি অফ ইণ্ডিয়া. (১৯৪০)

২৯ তবুও চাঁদা দিবেন ?, (১৯৪০)

৩০ জুলুমবাজকে হটাও, প্রকাশকঃ বলশেভিক পার্টি অফ ইণ্ডিয়া, (১৯৪০)

৩১ তোমার দেশ পরাধীন. (১৯৪০)

৩২ বর্তমান যুদ্ধে ইংরেজের সর্বনাশ হইল (১৯৪০)

৩৩ ভাঙনের পালা সুরু হলো আজ. ভাঙো শৃঙ্খল, issued by the Indian Red Army Head Quarter, (১৯৪০)

৩৪ পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর বিবৃতি, প্রকাশকঃ অতুলচন্দ্র ঘোষ, সভাপতি, মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটি, (১৯৪০)

৩৫ দমন নীতির প্রতিবাদ কর কৃষক হত্যা বন্ধ কর. প্রকাশকঃ গণশক্তি প্রেস, কলিকাতা. (১৯৪৭)

৩৬ কৃষক হত্যার জবাব চাই, ভবানী সেন, (১৯৪৭)

৩৭ সংগ্রাম চালু করে দাও, (১৯৪০)

৩৮ লাল নিশান, প্রথম বর্ষ. ৩য় সংখ্যা, ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি, (১৯৪০)

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	আছে	হবে
৯	স্বস্তিকা পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংগীত ছাপা হয়েছিল। এই গান বৈপ্লবিক আদর্শবাদের মুখপত্র তৎকালীন ‘যুগান্তরে’ প্রকাশিত হয়ে সারা দেশে যথেষ্ট উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল।	এই গান সর্বপ্রথম...........সর্বপ্রথম প্রকাশিত..........করেছিল। গানটি ১৯৫৭ সালে স্বস্তিকা পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়।
১৫	যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়	যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়
২১	The Sedition Committee Report (1919)	The Sedition Committee Report (1918)
২৭	পংক্তি ২৮ তালে	ঝালে
৩২	১৯৩৪	১৩৩৪
৩৪	মতয়ালা	মতওয়ালা
৩৬	১৯১৩	১৯২৩
৩৭	Syivia Pankhurst	Sylvia Pankhurst
৫৯	Afzulal Huque	Afzalul Huque
৬৯	পঞ্চজন্য	পাঞ্চজন্য
৭০	পংক্তি ১৩ গড়িয়াছিল	গড়াইয়াছিল
৭৫	পংক্তি ৩৩ ঝাঁপিয়া	ঝাঁপাইয়া
৮৯	পংক্তি ১৩ স্বপক্ষে	সপক্ষে
৯৯	১৩৮২	১২৮২
১০২	পংক্তি ৩ ছয় আনা	ছয় পয়সা
১০৮	রোজা লুক্রেমবুর্গ	রোজা লুক্‌সেমবুর্গ
১১০	পংক্তি ৫ লিটভিনভের	লিটভিনফের
১১৫	I will not rest Rolaind	I Will Not Rest—Romain Rolland
১৩১	ম্যালকম হোলি	ম্যালকম হেলি
১৩১	জবহরলাল	জওয়াহরলাল
১৫৩	মেহনদাস করমচাঁদ গান্ধী	মোহনদাস করমচন্দ গাঁধী
১৭১	প্রশান্তকুমার মহালানবীশ	প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ
১৭১	কিশোরীমোহন হাজরা	কিশোরীমোহন সাঁতরা
১৭৩	দুর্য্যোগ	দুর্যোগ
১৮০	পংক্তি ৩৪.........দমননীতির অভূত	দমননীতির অভূতপূর্ব তাণ্ডব।
১৮১	পংক্তি ৩ স্মরণ নিলো কৃপালিনী	শরণ নিলো কৃপালনী
১৮২	পংক্তি ২৮ কর্মচারীদের পরাস্পর বিরেধী	কর্মচারীদের পরস্পর বিরোধী